শতদল।

[ঢাকা-হল বার্ষিকী]

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

তৃতীয় বর্ষ।

ফাল্গুন,—১৩৩২ সন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহ বি, এস্ সি।

সূচীপত্র।

শতদল।

[ঢাকা-হল বার্ষিকী]

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

তৃতীয় বর্ষ।

ফাল্গুন,—১৩৩২ সন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহ বি, এস্ সি।

সূচীপত্র।

SIR P. J. HARTOG'S MESSAGE.

The Vice-President of the Dacca Hall Students' Union has asked me to write a short article on my experiences of Dacca University and to send a parting message to the students. I made so many parting speeches at the farewell meetings which were kindly arranged before my departure that I have really nothing to add to them. It is my hope and belief that the students of Dacca Hall will feel a pride in the Hall and the University to which they belong, which will be of real service to them in life. There is a French proverb—*noblesse oblige.* It means that when we belong to a great institution, we feel in all our actions that we must be worthy of it. It is for Dacca Hall students to maintain and to add to the fine traditions which the Hall has already established. I shall always think in affectionate remembrance of the students of the University which I served during the first five years of its existence.

London
Feb. 18th. 1926.

(Sd.) P. J. HARTOG.

সম্পাদকীয় 'ক'

শতদল।

৩য় বর্ষ।	ঢাকাহল, ফাল্গুন—১৩৩২।	৩য় বর্ষ।

সাহিত্য জগতের একটা মামুলি প্রথা আছে, কোন একটা পূজোপকরণ লইয়া বাণীর মন্দিরে প্রথম প্রবেশ লাভ করিতে হইলে, পূজারীর একটা কৈফিয়ৎ দিতে হয় পাছে সেটা কোন রকমের অনধিকার প্রবেশ হইয়া না পড়ে। প্রথমটায়ই যত সব মুস্কিল। ঐ সময়েই তাহাকে মনে মনে নানারূপ্ ভয় ভীতি এবং সন্দেহ লইয়া 'পা ফেলি কি না ফেলি' করিয়া মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। তারপর একবার স্বীয় আদর্শ ও উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দিয়া অন্যান্য পূজারীদের মধ্যে না হউক অন্ততঃ বাণীর মন্দিরের এক কোণেও পূজার অর্ঘ্য প্রদান করিবার মত একটু জায়গা করিয়া লইতে পারিলে, শেষে মায়ের সেবার অধিকার লাভ করিতে আর নূতন করিয়া কোন কৈফিয়ৎ দিবার তেমন কোন দরকার হয় না। সে যাহা হউক, সেই সমস্ত প্রাথমিক ঝঞ্ঝাট ও কৈফিয়তের দায় আমাদের পূর্ব্বে যে সব যোগ্যতর পূজারীদের উপর মাতৃপূজার অর্ঘ্য সাজাইবার ভার ছিল, তাহাদের উপর দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। অধিকার সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা, সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা ও তাহার সম্প্রসারণের ভার এখন আমাদের ও ভবিষ্যতে আমাদের পরবর্ত্তী পূজারীগণের। আজ এই তৃতীয় বার্ষিক মাতৃপূজার আয়োজন করিতে গিয়া, অর্ঘ্য ও রচনাসম্ভার সাজাইবার দিনে আমাদের এইটুকুমাত্র সাহস করিবার আছে যে, মায়ের মন্দিরের সকল ভাগ্যবান্ পূজারীর সঙ্গে একত্র বসিয়া দীন পূজারী আমরা মাতৃচরণে অঞ্জলি পূরিয়া আমাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিতে না পারিলেও, আমরা এখনও তাঁহাদের সকলের কাছেই নেহাৎ অপরিচিত রহিয়া যাই নাই। ইহাই আমাদের বড় ভরসা। আমরা আশা করি, গত দুই বৎসর আমরা যাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও অনুকম্পা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্য পাইয়া আসিয়াছি, এ বৎসরের মাতৃপূজায়ও তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ, অনুকম্পা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্য হইতে বঞ্চিত হইব না।

* * * * * * * *

এ বৎসরের পত্রিকায় আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন কিছু বলিবার না থাকিলেও, গত দুই বৎসরের ভিতর আমাদের সাহিত্য সেবা কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে অন্ততঃ দুই একটা কথা না বলিলে আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে একটা বিশেষ ত্রুটি রহিয়া যাইবে। কাজেই সে বিষয়ে আমাদের কিছু বলা দরকার। বাস্তবিক সমস্ত বৎসরের চেষ্টায় এমন একটা শিক্ষিত ছাত্র-সমাজ হইতে

একখানা মাত্র বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত করার মধ্য দিয়াই যদি আমরা প্রচার করিতে চাই যে একমাত্র ইহাই আমাদের সাহিত্য সেবার নিদর্শন এবং আমাদের যাহা কিছু সাহিত্য সৃষ্টি তাহা শুধু এক 'শতদলের' মধ্য দিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে এবং করিতেছে, তবে বুঝিতে হইবে সাহিত্য সেবায় আমাদের সফলতা নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর। মাসিক বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে না পারার আমাদের অন্য যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, আমরা এইটা মানিয়া লইতে বাধ্য না যে আমাদের মধ্যে সাহিত্যানুশীলন বা অনুশীলনের উৎসাহ খুবই কম। বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকা নগরীতে "প্রাচী" পত্রিকার সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাহার অকাল মৃত্যু যদিও প্রমাণ করিতে চায় যে ঢাকার সাহিত্যের আবহাওয়া তেমন সুবিধাজনক নয়, তথাপি আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে "শতদলের" মধ্য দিয়া ঢাকা হলের মৃতপ্রায় সাহিত্যিক জীবন যে এক নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকাহলে Literary Association বলিয়া কোন Associationই ছিল না, কিন্তু এই বৎসর আমরা তাহার প্রতিষ্ঠা, অস্তিত্ব ও জীবনীশক্তি দেখিয়া যথার্থই মুগ্ধ হইয়াছি। আমাদের মনে হয় এই সাহিত্য সম্মেলন গড়িয়া উঠিবার মূলে "শতদল" অনেকটা কাজ করিয়াছে। এবং ইহাও আমাদের একটা বড় গৌরবের বিষয় যে "শতদলের" কোন কোন কবির 'সাধা' বীণা ইহার মধ্যেই অনেক কবিতা কুঞ্জে বাজিয়া উঠিয়াছে। আমরা আশা করি, আজ "শতদল" মাতৃস্তন্যের জন্য লালায়িত শিশুর মত অর্দ্ধস্ফুটবাক্যে ঢাকাহলের ভিতরের অভাব অভিযোগ ও আবেগের কতটুকু মাত্র প্রকাশ করিলেও, অথবা আজ ঢাকাহলের মনের কথাটির মোটামোটি সাদামাঠা ভাষায় একটা রূপ দিলেও, এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যে দিন সাহিত্যিকের দরবারে "শতদল" বিশেষ অনাদর পাইবে না।

* * * * * * * *

সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্যানুশীলনের মূলে যেমন থাকা চাই ভিতরে ভিতরে একটা বিশেষ প্রেরণা, তেমনই আবার জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্যালোচনা ও সাহিত্যপ্রিয়তা বাড়াইয়া তুলিবার পক্ষে সহায়তা করিবার জন্য থাকা চাই একটা অনুকূল Literary atmosphere. আমাদের মনে হয় সাধারণের দিক হইতে দেখিতে গেলে এই atmosphereএরই দরকার সব চেয়ে বেশী এবং সাহিত্যের উন্নতিও বোধ হয় নির্ভর করে অনেকটা উহারই উপর। ঢাকায় বসিয়া সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে কিন্তু বড় দুঃখের সহিতই বলিতে হয় যে এই স্থানে সম্প্রতি ঐ জিনিষটার বড়ই অভাব হইয়া পড়িয়াছে। এবং এইস্থানের বর্ত্তমান সাহিত্য প্রচারের ক্ষীণ ধারাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা জানি ঢাকায় অনেক সাধারণ অনুষ্ঠান, অনেক স্কুল কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তদন্তর্গত তিনটা ছাত্রাবাসের প্রত্যেকেরই মুখপত্র স্বরূপ স্ব স্ব এক একখানা পত্রিকা আছে। তবে কোন কোন খানা হয়ত ছাপার অক্ষরে বাহির হয় আর বেশীর ভাগই হয়ত হাতের লেখা। কিন্তু সাহিত্যপ্রিয়তা ও সাহিত্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা যে এখনও ঢাকায় একেবারে মরিয়া যায় নাই, ইহা কি তাহাই প্রমাণিত করে না? আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমানে ঢাকায় যে কয়জন খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক আছেন, তাঁহারা যদি ঢাকার সমস্ত স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যামোদী ছাত্রগণের সহযোগে একটা সাহিত্য সম্মেলন গড়িয়া উঠাইবার চেষ্টা করেন, তবে সকলের আন্তরিক যত্নে ও সহযোগিতায় ঢাকার সাহিত্যের আবহাওয়া নিশ্চয়ই বদলাইয়া যাইবে। এবং সেই সম্মেলনের মধ্য দিয়াই আবার নূতন সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ অনেকটা বাড়িয়া যাইবে, ঢাকারও বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

শতদল।

৩য় বর্ষ।	ঢাকাহল, ফাল্গুন—১৩৩২।	৩য় বর্ষ।

জাগরণ।

[শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র নাগ বি, এ]

শরৎ-প্রসন্ন হাসি আসি দেখা দিয়াছে দুয়ারে
ওরে মন জাগ আজি ;
আন অর্ঘ্য ভার
যতন সঞ্চিত যত রতন সম্ভার।
আজি এই নব জাগরণে
প্রাণের সকল পথ সকল দুয়ার
দাও খুলি ;
যাও ভুলি দৈন্য আপনার।
কত যুগ যুগান্তর বঞ্চিতের রিক্তশূন্য প্রাণে
কাটিয়াছে কাল ;
অনন্ত-বাসনা স্রোত ব্যর্থতার হীনভার বহি
কত কাল তোমা
সহস্র বাঁধনে বাঁধি করিছে নাকাল।
হের আজি নবীন প্রভাত
চিরস্নিগ্ধ হাসিরাশি আলিঙ্গন দিয়া
কহিছে ডাকিয়া সবে "শুভ-সুপ্রভাত"।

ওরে মন জাগ জাগ—
শুন নব আশার বারতা ;
দেখ কিবা সুন্দর তপন
বরষি অমৃত রাশি দশদিশি করিয়া উজ্জল
ঘোষিছে আশ্বাস বাণী প্রতি ঘর ঘর—
"ভুলে যাও ভুলে যাও ভুলে যাও নর
খুলে দাও অতীতের স্মৃতির পিঞ্জর ;
শুভ্র শান্ত হাস্যময় নব উষা লোকে
শতাব্দীর—পুঞ্জীভূত দাসোচিত জড়া গ্লানি ছেড়ে
এস ছুটে ম্রিয়মান মুক্তির পুলকে।"

হের কিবা সজ্জিতা ধরণী ;
অভিনব ফুল সাজে যেন ফুল-রাণী—
সুধাভাণ্ড নিয়ে হাতে দুয়ারে তোমার
খুলে দাও দ্বার
বসাও যতনে তারে ;
আজি তব সব দৈন্য সব ব্যর্থতার
হবে অবসান,
হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রে শিহরণ তুলি
উঠিবে সুতান।

ওরে মন জাগ জাগ
আর কত র'বে অচেতন
হের ঐ পশ্চিমের ক্ষুধিত রাক্ষস
লেলিহান জিহ্বা মেলি গ্রাসিতে জগত—
শক্তির গর্জ্জনে ছলে মোহ-প্রলোভনে
শোষনে শোধন-ভানে চাতুরী মায়ায়
নিরন্তর অনলস করিয়া যতন
বহুকাল পরে আজি ব্যর্থ মনোরথ।

আজি তার ছদ্ম আবরণ
প্রভাতের সূর্য্যালোকে পড়িয়াছে ধরা ;
তাই তার শক্তি ছন্নছাড়া
নিষ্ফল আক্রোশে রোষে করিয়া গর্জ্জন
ঘোষিছে জগতে তার আগত পতন।

হে নবীন !
আজি শুভ দিন
কান্তারে প্রান্তরে বনে প্রতি গৃহ কোনে
অসংখ্য করমক্ষেত্র ডাকিছে তোমায় ;
ধরণীর প্রতি ধূলিকণা
সহস্র বন্ধনে তোমা করিছে আহ্বান।
ঐ শুন নবছন্দে নবীন সঙ্গীতে
বিশ্বের বরেণ্য কবি কহিছেন ডাকি—
"এই সব মূঢ় ম্লান মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত—সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।"
উদার নির্ভীক প্রাণ শান্ত সমাহিত
হে নব জাগ্রত !
শতধা বিচ্ছিন্ন তব লাঞ্ছিত জীবন
অলস বিশ্রান্ত ;
ধন্য হোক ধন্য হোক করিয়া বরণ
মানব কল্যাণময়
জীব-হিত-ব্রত।

"রক্তকরবী"র কথা।

[শ্রীহীরেন্দ্রনাথ রায় বি, এ।]

বিগত বৎসরের পূজার সওগাদ্ 'রক্তকরবী' বাহির হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত যুগ সাহিত্যে ইহার স্থান নির্দ্দেশ নিয়া অনেক কথা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক মণ্ডলী ল্যাবরেটরিতে ক্রুসিব্‌লের সাহায্যে তাহার মানে বাহির করিতে গিয়া হতাশ হইয়াছেন। তাহারা সন্দেহ করিয়াছেন, রক্তকরবী রূপক কথা, না হয় কোনো প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার দিকে বিদ্রূপের ইঙ্গিত। তাহাদের সম্বন্ধে কবি নিবেদন করিয়াছেন—"যেটা গূঢ়, তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চ'লে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে বের ক'রে তার কার্য্যপ্রণালী তদারক করতে গেলেই তার কাজ বন্ধ হ'য়ে যাবে"। বাস্তবিক, মানুষের যা সৌন্দর্য্য আছে, তা ডিসেক্‌সন্ ঘরে বিশ্লেষণ দ্বারা খুব কমই মিলে, ফুলের যা সৌন্দর্য্য আছে, তা তার পাপড়িগুলি একটা একটা করিয়া ছিড়িয়া নিলে খুব কমই বোঝা যায়। রূপ ও রসকে বুদ্ধি দ্বারা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা শুধুই শক্তির অপব্যয় নয়, মানুষের পক্ষে অগৌরবের কথাও বটে। রসকে জানা যায় না, যেমন করিয়া বিজ্ঞান, জ্যামিতিকে আমরা জানি; সমগ্র অনুভূতি দিয়া তাহার স্বাদ গ্রহণ করিতে পারা যায়। তাহার একটা অর্থ থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহাকে পৃথক করিয়া নিলে অর্থ অনর্থ হইয়া উঠে, যার খোঁড়া মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ভয় পাই, আর বেশী ঘাটনের ফলে রসও তিক্ত হইয়া যায়। এই রক্তকরবীরও পাপড়ির আড়ালে একটা অর্থ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাকে অন্তঃসলিলা রসের ফল্গুধারা হইতে পৃথক করিয়া দেখিতে গেলে শুষ্ক বালি উঠিবার সম্ভাবনাই বেশী।

কবি তাহার কাব্যে, শিল্পী তাহার শিল্পে, কাজে লাগান এই জগতেরই মাল মসলা, যাহা আমরা নিত্য চোখে দেখি, ব্যবহার করি বা অবহেলা করি। কিন্তু তাহার 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' যে প্রাণটুকু প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা তাহার নিজের। তাহা জীবন্ত, মূর্ত্ত, গতিশীল হইয়া উঠে তখনই, কারণ উহা বিশ্ববীণার ছন্দের তানে মিলিয়া যায়, সৃষ্টির যাবতীয় অনুপরমাণুতে ঝঙ্কার তোলে, প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে। তাহাকেই আমরা আর্ট বলিয়া সম্মান করি, সত্য বলিয়া নমস্কার করি। আবার বিভিন্ন যুগের জাগতিক সমস্যাগুলিও সর্ব্বসাধারণকে যেমন বিব্রত করে, কবিকেও তেমনি চঞ্চল করিয়া তোলে। সাধারণ মানুষ মূক হইয়া থাকে,—ভালোমন্দের বিরোধে পড়িয়া ক্ষতবিক্ষত হয়; কবি আদর্শের সহিত বাস্তবের অমিলটুকু দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পান, ব্যবধানের লজ্জাটুকু তুলিতে আঁকিয়া লন। তখন আর তাহারা কেবল সাময়িক সমস্যাই থাকে না,—চিরকালের বেদনা হইয়া জাগিয়া উঠে। এই ব্যবধানের বেদনায় মানুষ না-পাওয়ার পেছনে ছুটিতে থাকে—পায় না তবু হয়রাণ হয় না; পথে পথে মাধুর্য্যের আর আনন্দের খনি দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তাই বিরাম নিতে চায় না। এই ছুটা চিরন্তন।

এই রক্তকরবীও এমন একটা বিশিষ্ট যুগকে অবলম্বন করিয়া আবার তাহাকে ছাপাইয়া চিরকালের কথাটাকেই জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা শক্তির বাহুল্যের কাছে অবমানিত লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বের চিত্র ; বিশেষত্ব এই যে প্রলয়ঙ্কর শক্তিপ্রতীকের শির নোয়াইয়া তাহারই মাথায় পরাজয়ের গৌরব মুকুট পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পরাজয়ে গ্লানি নাই, কারণ, উহা উদ্ধততর শক্তির ধর্ষণ ও অবলুণ্ঠন নহে,—আনন্দের হাটে সৌন্দর্য্যের ও সত্যের সাথে চোখাচোখিতে নিদ্রিত প্রাণের নব জাগরণ। শুধু "মানবের মহিমা উজ্জ্বল ক'রে ধরবার জন্যই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা"।

এ যুগের একটা সমস্যা কবির প্রাণে খুব বাজিয়াছে, যাহা তিনি বহু জায়গায় বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন,—সে 'বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী' যন্ত্রতান্ত্রিক সভ্যতা এবং কর্ষণ ও আকর্ষণ জীবিদের পরস্পর দ্বন্দ্ব। শোষণজীবির পরগ্রাসী ক্ষুধার এত বড় হা দেখিয়া সমস্ত জগৎ আৎকাইয়া উঠিয়াছে। উহা সারা পৃথিবীটার শক্তি সংহরণ করিয়া আপন লোভের পিপাসা মিটাইতে চায়।

"স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষমুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার!"
"দয়াহীন সভ্যতা নাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরা তীব্র বিষে।
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত,—লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম ; প্রলয়-মন্থন লোভে
ভদ্রবেশী বর্ব্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে।"

তাই প্রত্যেকের লোভের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য 'লিগ্ অব নেশানস্'এর প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের তলে তলে একের সন্দেহ অপরের ঘাড়ের পেছনে উঁকি মারিতেছে। "এই অনতিপ্রয়োজনকে প্রয়োজনীয় করে তোলা যখন দেশশুদ্ধ সকল লোকেরই নিত্য সাধনা হয়, তখন বিশ্বব্যাপী দস্যুবৃত্তি অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে"। "বস্তুগত আয়োজনের অসঙ্গত বাহুল্যকেই যে সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলে মানা হয় সে সভ্যতা অগত্যাই নরভুক"। তিনি তাই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন—"নররক্ত শোষণের বিশ্বব্যাপী চর্চ্চা একদিন আত্মহত্যায় ঠেক্‌বেই, এতে সন্দেহ করা চলে না।"

এই সম্বন্ধে সম্প্রতি তিনি মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে যাহা লিখিয়াছেন তাহা খুবই প্রণিধানযোগ্য। এই পরগ্রাসী সভ্যতার অগ্রদূত হিসাবে তিনি ইউরোপকে সর্ব্বাগ্রে দায়ী করিয়াছেন। সমাজ, রাষ্ট্র, ব্যক্তি, সকলে organisationএর বাধা নিয়মে উঠিতেছে, বসিতেছে। "Christian Europe no longer

depends upon Christ for her peace but upon the League of Nations, because her peace is not disturbed by forceful individuals so much as by organised powers. .... But the personal man is not dead, only dominated by the organised man. The world has become the world of Jack and Giant—the Giant who is not a gigantic man, but a multitude of men turned into a gigantic system............ It is an organised passion of greed stalking in the name of European civilisation." তার ফলে দেশ বিদেশের মধ্যে প্রীতির বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে, বখ্‌রা নিয়া কাড়াকাড়ির গণ্ডগোলে আকাশ বিকট প্রতিধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ প্রেমের নয়,—নিছক্ স্বার্থের। তাই তাহারা কোনো দিন এদেশকে ভালবাসিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে নাই; যাহা করিয়াছে, তাহা শুধু লাভালাভ খুঁজিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে যাইয়া হৃদয়হীন বিশ্লেষণ। তাহারা পথে পথে বস্তুর চাক্‌চিক্য দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছে, কিন্তু এদেশের আকাশে বাতাসে যে সঙ্গীত ভাসিয়া বেড়ায় তাহার দিকে কান দিতে অবসর পাইল না। ঠিক এই জন্যই বিশেষ করিয়া পাইতে গিয়া ইংরাজরা বিশেষ করিয়াই এদেশকে হারাইয়াছে।

এই প্রকার পাইবার জন্য হাত্‌রাইয়া খোঁজাটা অত্যন্ত বিকট দেখায়—তাই, বিজ্ঞানকে বাহন করিয়া সভ্যতার এই নগ্নতাকে লুকাইবার প্রচেষ্টা। "Such an objectified passion lacks the true majesty of human nature ; it only assumes a terrifying bigness,—its physiognomy blurred through its cover of an intricate network—the scientific system." ইহাই রক্তকরবীর সেই জালের আবরণ। এককালে এদেশে আকবর ছিল, ঔরংজীব ছিল, অত্যাচারের লীলা যে খেয়াল হইতে বাহির হইয়া আসিত, তাহা লোকে দেখিতে পাইত, বুঝিতে পারিত। কিন্তু এখন দিকে দিকে সংঘবদ্ধ লোভ (organised avarice) নিজের ভয়ঙ্কর রূপকে আড়াল করিয়া সহজের আবরণে বিশ্বকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ব্যক্তিগত কার্য্য অনেক সময় আভ্যন্তরীণ চরিত্রের উপর নির্ভর করে, সেই চরিত্রগত দুর্ব্বলতার জন্য দুঃখ করা চলে। কিন্তু চারিদিকে ভদ্রবেশী লোভের যে সকল দূত আমরা দেখিতে পাই, তাহারা রক্তমাংসের মানুষরূপে আসে না। সংঘের উপদেবতা তাদের প্রাণপুরুষের অন্দরমহলের খিলটি বন্ধ করিয়া দেয়। "Its messengers who came to us.........are never for us our fellow-beings in flesh and blood as were Julius Cæsar or Antony who could find their immortal places in Shakespeare's drama. They are abstractions as far and near and therefore awful ; they are obscure to us in their dark secrecy of their political laboratory and yet grimly concrete in their grasp upon our vitals."

এই গাঢ়তম অন্ধকারের মধ্যে কবির গভীর অনুভূতি রক্তকরবী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই উপ্‌ছেপড়া শক্তির চাপে পড়িয়া মনুষ্যত্ব মরিয়া যাইতে বসিয়াছে, সুন্দরের লীলাক্ষেত্রে রাক্ষসের হাত

পড়িয়াছে, সেই রাক্ষসের রূপ দেখিয়া সত্য শিব মূর্চ্ছিত হইয়াছে। "আজ মুনাফার আড়ালে মানুষের জ্যোতির্ম্ময় সত্য রাহুগ্রস্ত।" "সর্ব্বভুক পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দিন এমন বিস্তৃত আকারে দেখা দেয়নি।" তাই কবির বীণায় নূতন করিয়া তার সংযোগ করিবার ডাক পড়িয়াছে।

বর্ত্তমান জগৎ যন্ত্রকে সারথি করিয়া তার 'প্রোগ্রেস্' ও 'সাক্সেস্' এর ধ্বজা উড়াইয়া চলিয়াছে। আবার সেই যন্ত্রের দ্রুত তালের সহিত চলিতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়িতেছে, ছুটিতেছে, ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। বাহিরে তাহার 'সাক্সেস্' জমিয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু অন্তরের মানুষটি না খাইয়া শুকাইয়া মরিতেছে। এই ভোগের আকর্ষণ বড় ভয়ানক, তার শেষ নাই, তৃপ্তি নাই। একটু একটু করিয়া সমস্ত জগৎকে সে মুঠোর মধ্যে আনিতে চায়; প্রয়োজনের হিসাবে সমস্ত জিনিষকে সে জানিতে চায়।

"স্বার্থ যত পূর্ণ হয়, লোভ-ক্ষুধানল
তত তার বেড়ে ওঠে,—বিশ্বধরাতল
আপনার খাদ্য বলি না করি' বিচার
জঠরে পুরিতে চায়।"

তার উপকরণ—যন্ত্র; "মুক্তধারায়" তার বিশেষ পরিণতি আমরা দেখিয়াছি। যন্ত্ররাজ বিভূতি দৃপ্তকণ্ঠে বলিতেছেন—"যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর।" তাই উত্তরকূটে যন্ত্রের পূজার ব্যবস্থা আছে, তার বন্দনা আছে—

"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র
তুমি চক্রমুখর মন্দ্রিত
তুমি বজ্রবহ্নি বন্দিত
তব বস্তু বিশ্ববক্ষদংশ
ধ্বংস-বিকট-দন্ত।"

"বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্য দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন," সেই মুক্তধারাকে যন্ত্রের সাহায্যে বন্ধ ক'রে তাদের শক্তির বিকট মহোৎসব। রাষ্ট্রনীতি তাদের কাছে অস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে, প্রাণকে নিঃশেষ করাই তাহার বিশেষ কাজ। এই রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্বন্ধ বুঝাইতে গিয়া ধনঞ্জয় ঘোষণা করিয়াছে—"আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়" "রাজা ভুল করচ এই, যে, ভাবচ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই তোমার হ'ল। ছেড়ে রাখ্‌লেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপ্‌তে গেলেই দেখ্‌বে সে ফস্‌কে গেছে।"

এই যন্ত্ররথ আজ মানুষকে ত্রাসিত করিয়াছে। প্রাণকে দলিত মথিত করিয়াছে। আজ এই "ঘর্ঘরিত রথবেগ গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস।"

তার গতি উদ্দাম, তাই—

রথী কহে, "ঐ মোর পথ
ঘুরে গেলে দেরী হবে, বাধা ভেঙ্গে সিধা যাবে রথ।"
গৃহী কহে, "নিদারুণ ত্বরা দে'খে মোর ডর লাগে,
কোথা যেতে হ'বে বল।"
রথী কহে, "যেতে হবে আগে।"
"কোন্‌খানে," শুধাইল।
রথী বলে, "কোনোখানে নহে,
শুধু আগে।"

এই ভোগলক্ষ্মী তার যন্ত্রের কুঠার দিয়া প্রয়োজনের কাজে বিশ্বভাণ্ডারের দেয়াল ফুটা করিয়া সমস্ত সৃষ্টিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তাহাদের প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। যেখানে এই ভোগের অতি প্রয়োজনের রাজত্ব তাহারই নাম যক্ষপুরী। মানব-বৃত্তিকে পিষিয়া ফেলিয়া রাক্ষসবৃত্তিরই চরিতার্থতা সেখানে—তাই তাহার নাম এমন ভয়ঙ্কর। মানুষগুলি সেখানে মানুষ নয়—প্রয়োজনের দাস। পাতালপুরী হইতে সোণার তাল খুঁড়িয়া বাহির করাই তাহাদের কাজ; এই সোণার ঝলমলানিতে তাহাদের প্রাণের প্রদীপ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। মানুষ হিসাবে করিবার তাহাদের কিছুই নাই, সেই জ্ঞানটুকুও তাহাদের লোপ পাইয়াছে,—স্নেহ, ভালবাসা, ভক্তির প্রস্রবণ শুকাইয়া গিয়াছে। তাহাদের পরিচয় নির্ণয় করিবে প্রয়োজন, কতটুকু পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে তাহা ওজন করিয়া দিবে প্রয়োজন;— তাহাদের নাম নাই, রূপ নাই, এক একজন এক একটি কল, নিয়মের চাবিতে ঘুরে, চিনিতে হইবে শুধু পিঠের কাপড়ে দাগা সংখ্যাটুকু দিয়া, যেন, 'দশ পঁচিশের ছক।' লোভ তাহাদের শিরায় শিরায় ঢুকিয়াছে, তাই মাঠ ছেড়ে, বাড়ী ছেড়ে, স্ত্রীপুত্র পরিজন সব ছেড়ে, বড় বড় চুঙ্গিওয়ালা কলের চারিদিকে জড় হইয়াছে।

এই যক্ষপুরী "গ্রহণ-লাগা পুরী।" সোণার গর্ত্তের রাহুতে ওকে খাব্‌লে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখ্‌তে চায় না। এখানে একটা জালের আড়ালে রাজাকে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে, সে যে মানুষ পাছে সে কথা ধরা পড়ে। আর এই "খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুকাচরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মত সুরঙ্গের ভিতর থেকে উপরে আসছে।" পৃথিবীর উপরে যেখানে রসের লীলা, তার দিকে পেছন ফিরিয়া কাজের মাতাল সাজ্‌তে তারা মদের পেয়ালায় ডুব দিয়া রহিয়াছে। ইহা এই শক্তিবাহুল্যের রাজ্যের রাষ্ট্রনীতি। এখানে ধর্ম্মের 'প্রপাগাণ্ডার' জন্য ধর্ম্মসচিবের পদ আছে, কারণ তেজীয়ানকে নরম করিতে রাষ্ট্রের পক্ষে ইহাকে অবহেলা করিলে চলে না; তাই প্রাণের স্পন্দনের অভাবে মন্ত্রসব মিথ্যা বকুনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আচার সব বুজরুগিতে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মনীতির মেরুদণ্ডটা এই তথা-কথিত রাষ্ট্রনীতি,—ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া আছে মাত্র। তার দায়িত্ব—অসন্তুষ্টির দাহনে এই মজুরের দল যেন অসংযত হইয়া না উঠে, তাদের আকাঙ্ক্ষা যেন যক্ষপুরীর প্রয়োজনের দেয়াল ডিঙ্গাইয়া

বহির্ম্মুখী না হইতে পারে। এই লোকগুলির চিত্তবৃত্তির সঙ্গে যক্ষপুরীর প্রয়োজন সাধনের মাত্রার সামারক্ষার জন্যই তিনি নিযুক্ত আছেন,—তিনি একপিঠে গোঁসাই, আরেক পিঠে সর্দ্দার,—নিত্য নূতন বিধান ও ব্যাখ্যা বাহির করিয়া তাহাদের আকাঙ্ক্ষাকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনের হালে যুঁতিয়া দেওয়াই তাহার কর্ম্ম। সর্দ্দার একজায়গায় বলিতেছেন—"আমাদের এই কারিগরদের দুর্ব্বল মন, মাঝে মাঝে অশান্ত হ'য়ে উঠে। এদের কাণে একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন—ভারি দরকার!" এই দরকার উদ্ধারের জন্যই, ফৌজের চাপে অহঙ্কারটা দূর করিয়া এদের কাণে নিজ্জীবতার শান্তিমন্ত্র জপ করা হয়। এই ভাবে যে শুধু এদের ভিতরটা ফাঁপা করিয়া দেয়, তাই নয়, একেবারে ভরসা পর্য্যন্ত শুষিয়া নেয়।

এই নাটিকায় একটি অধ্যাপকের স্থান আছে। তাহার মধ্যে "মানুষের অনেকখানি বাদ গিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে।" তিনি তাঁহার বস্তু-তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে দিবারাত্র গর্ত্ত খুড়িয়া চলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান সম্মুখকে প্রকাশ করিয়া চলে না, সন্দেহের অন্ধকারকে বাড়াইয়া তোলে মাত্র। বিষয়ের ভগ্নাংশ বাহির করিয়া তিনি জানিতে চাহেন, কিন্তু যে পূর্ণকে জানিলে সব জানা যায়, তাহা চিরকাল অজানাতেই গুপ্ত থাকে। তাহার জ্ঞান সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য নয়, 'ইউটিলিটির'ইন্ধন যোগাইবার উপচার মাত্র।

রক্ত-করবীর পালায় 'সর্দ্দারের' সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাদের বারে বারেই হয়। তাহার সর্দ্দারির নিয়মেই যক্ষপুরীর কলকাঠিটি ঘুরে ফিরে। সুন্দরের নেশা যাতে কাজের নেশাকে কখনই ছাপাইয়া না উঠে, ঐটাই সর্দ্দারের সব চেয়ে বড় কাজ। ঠিক এই কারণেই রাজা স্বয়ং কারাগারে। সুন্দরকে ঘৃণা করিতে শিখানই এখানকার সকল ব্যবস্থার চরম ব্যবস্থা। "যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের 'পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয় এইটেই সর্ব্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সবচেয়ে সাজা তাই।" এখানে গোটা মানুষটাকে বেঁহুস করিয়া দরকারের তৃষ্ণাটিকে শুধু সজাগ রাখা হইয়াছে। এই উপায়ে সর্দ্দার যে কেবল এই লোকগুলির ফিরিবার পথ বন্ধ করিয়াছে, তা নয়, ওদের "ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে।" তারা যদি দেশেও ফিরিয়া যায়, তবে থাকিতে পারিবে না, ফিরিয়া আসিবে,—"আফিমখোর পাখী যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফিরে আসে।"

এই বীভৎস সমৃদ্ধির পুরীতে কবি একটি মানব কন্যাকে দাঁড় করাইয়াছেন, তাহার কাছে শক্তি-প্রতীকের শির নোয়াইয়াছেন, পুঞ্জীভূত বস্তুতন্ত্রের উপচার ঠেলিয়া প্রাণের বিজয় বৈজয়ন্তী ঘোষণা করিয়াছেন। নন্দিনী নারী,—কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে নারী প্রেমের বাহন—যাহার প্রেরণা সমস্ত সৃষ্টিকে আপন অভীপ্সিতের দিকে উন্মুখ করিয়া তোলে। কবির বিশ্বাস, এই নারী হইতেই জগৎ একদিন প্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করিবে, তাহারই প্রেমের ভিতর দিয়া চিরবাঞ্ছিতের রাজ্যে প্রবেশলাভ করিবে। সেদিন জগতের স্বভাব বদ্‌লাইয়া যাইবে,—শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাই বলিয়াছেন—

"The joy of this faith has inspired me to pour all my heart into painting against the back-ground of black shadows—the nightmare of a devil's temptation—the

portrait of Nandini, as the bearer of the message of reality, the saviour through death." তাহার একবিন্দু প্রেমের স্পর্শে শক্তির অবতার মাতাল হইয়াছে, শক্তিকে উপড়াইয়া মনের সিংহাসনে প্রেমের অভিষেক করিয়াছে;—বুঝিয়াছে, তাহার স্বরূপ প্রয়োজনান্বেষী শক্তি নহে, তাহার রাজা প্রাণ, তাহার সুর প্রেম।

এই তথ্যটি ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন, শ্রেণীগত মানুষের পক্ষে ঠিক তেমনি সত্য। কেহই এই প্রাণের ডাকে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিবে না। পাশ্চাত্যের সম্বন্ধে প্রাচ্যের এই প্রকার কর্ত্তব্যের কথা কবি অনেকবার বলিয়াছেন। তাহার ধারণা, যে প্রভুত্ব-রাক্ষসী পাশ্চাত্যের টুটি চাপিয়া ধরিয়াছে, তাহার হাত হইতে মুক্ত করার অস্ত্র একমাত্র ভারতেই আছে;—সে অস্ত্র বজ্রের নহে, প্রেমের।

আবার ব্যক্তিগত মানুষের মধ্যেও তাই,—"একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে।" সে "এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।" সুন্দর ও মঙ্গলের খোঁজে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া মানুষের চিরন্তন প্রকৃতি। যে জড়বুদ্ধি উহা উপেক্ষা করিতে শিখায়, তাহা আপনি আনন্দের সাগরে নিমজ্জিত হইয়া প্রেমের শতদল হইয়া ফুটিয়া উঠে।

মানুষের ভিতর সত্য, শিব ও সুন্দরের যে মন্দির আছে, তাহারই অর্গল খুলিয়া দিবার জন্য নন্দিনীর অবতারণা। যক্ষপুরীর 'মরাধনের' সাধকদের সেই প্রাণের পুরীতে বহুদিন আরতি হয় নাই, তাই সে "পৃথিবীর প্রাণভরা খুসিখানা নিজের সর্ব্বাঙ্গে" টানিয়া লইয়া "আচম্‌কা আলোর" মতনই এই প্রেত পুরীতে প্রবেশ করিয়াছে। এই জড়শক্তির রাজ্যে, যেখানে মনুষ্যত্বের কবরের উপর অসুরশক্তির কেতন উড়িয়াছে, সেইখানে নন্দিনী তাহার প্রাণের বিরাট ঐশ্বর্য্য নিয়া আসিয়াছে "মাটীর উপরিতলে যেখানে প্রাণের, যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্য্যের।" এই যক্ষপুরীর অভিশপ্তের দল মাঠ ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে, লোভের নেশায় পৃথিবীর সুখ, সৌন্দর্য্যের আলয় হইতে নিজেদের নির্ব্বাসিত করিয়াছে। সোণার রূপে মজিয়া ঘরের সুখকে ভুলিয়াছে। মাঠের ডাক তারা শোনে না;—নন্দিনী গান গাহিয়া এই আত্মবিস্মৃত মানুষ-গুলিকে ঘরে ফিরাইয়া লইবে।—

পৌষ যে তোদের ডাক দিয়াছে আয়রে চলে
আয় আয় আয়—
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হায় হায় হায়।
....
মাঠের বাঁশী শুনে শুনে আকাশ খুসি হ'ল
ঘরেতে আজ কে রবে গো? খোলো দুয়ার খোলো।

এই দুর্ভাগ্যেরা লোভের ছলে প্রেমের সমাধি দিতে বসিয়াছে। প্রেমের ঐশ্বর্য্যকে ঠেলিয়া সোণার তালের মরীচিকার পেছনে ছুটিয়াছে। কিন্তু মানুষ—সে যে আনন্দের রাজ্যের শাপভ্রষ্ট জীব।

সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব বলি দিয়া প্রাণকে যে তার জানিতেই হইবে। সে প্রাণ সীমাবদ্ধ নহে—অনন্ত অসীম। তাহার "ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হাল্‌কা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহ নক্ষত্রের দল ভিখারী নট-বালকের মত আকাশে আকাশে" নাচিয়া বেড়ায়। ভুবনে ভুবনে তাহারই বিরহের কান্না গুমরিয়া উঠিতেছে। তবে সীমার বাধনে বদ্ধ যে, সে অসীমের পূজা কি দিয়া করিবে? বস্তুর উপচারে যদি তার সাধনা না হয়, তবে কি আছে তাহার? প্রেম আছে। নন্দিনী সেই প্রেমের বরণ ডালা সাজাইয়া আনিয়াছে। মানুষ যে, সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যকে পাইয়া সব পাইয়াছি বলিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। অসীমের জন্য ক্রন্দন তাহাকে আকুল করিয়া তোলে। বাস্তবকে দেখিয়া, মূর্ত্তকে দেখিয়া অমূর্ত্তের জন্য বেদনা তার উছলিয়া উঠে। অসীমের সুর থাকিয়া থাকিয়া তাকে চঞ্চল করিয়া দেয়। তাহারই জন্য সে চিরবিরহী, মিলনের লগ্ন অতীত হইয়া যাইবে আশঙ্কায় চিররাত্রি জাগা রহিয়াছে। তাহারই অভিসারের জন্য জন্ম জন্ম উৎকণ্ঠায় কাটিয়া গিয়াছে—তাহারে চিনে নাই, জানে নাই, তাই এ ব্যাকুলতা—

যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবন সর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি! কে সে? জানিনা কে! চিনি নাই তারে—
শুধু এই টুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানব যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তর পানে
ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপ খানি!

সৃষ্টির প্রতি পাদক্ষেপে সে তাহারই চরণধ্বনি শুনিতে পায়—প্রতিছন্দে তাহারই আগমনী বাজিয়া উঠে।

তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে আসে আসে
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে আসে আসে।

যাবতীয় পদার্থে সে তার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়, মনে হয় যেন অনাদি কালের পরিচয়—

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর্ নাম যেন জানে সে।

—তার অন্তর পুলকে নাচিয়া উঠে। জানে সে সীমার বাধনে তাহাকে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু বিরহের মদিরা তাহাকে উতলা করিয়া তোলে। এই অনন্ত না-পাওয়ার পেছনে সে ধাবিত হয়,

আকাঙ্ক্ষিতকে পাইয়াও পায় না, যে টুকু পায়, তার চেয়ে না-পাওয়ার অনাস্বাদিত রসের আকর্ষণ বেশী ;—তাই সারা জীবন প্রেমেরই তপস্যা করে—বলে,—“লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।”

এই যক্ষপুরীর মায়ার রাজ্যে নন্দিনী সেই অনন্ত সমুদ্রের “অগম পারের দূতী,” সে “স্বপন-তরীর নেয়ে।” তাহাতে আছে “বিশ্বের বাঁশীতে নাচের যে ছন্দ বাজে, সেই ছন্দ।” বিশ্বের সকল মাধুরী তাহার প্রেমে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। জগতে যে দুঃখকে ভোলার মত আর দুঃখ নাই, নন্দিনী সেই দুঃখের কাহিনী জাগাইয়া দিতে আসিয়াছে, তাই সে “দুঃখ জাগানিয়া।” তার “চোখে মুখে প্রাণের লীলা” ; তার গানে মানুষের অব্যক্ত চিরবেদনার স্মৃতি ভাসিয়া আসে ;—

ভালোবাসি ভালোবাসি
এই সুরে কাছে দূরে জলে স্থলে বাজায় বাঁশী।
....
সেই সুরে সাগর কূলে
বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে,
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী ভোলা দিনের কাঁদন হাসি।

নন্দিনী এই আঁধার পুরীতে সুরের আগুন জ্বালাইয়াছে। তাহাতে প্রত্যেকেই আপনাপন বিস্মৃত চেতনা ফিরিয়া পাইতেছে, লোভের পিশাচ মূর্ত্তি দেখিয়া সংক্ষুব্ধ হইতেছে। স্বয়ং রাজার গায়ে নন্দিনীর ছোঁয়া লাগিয়াছে। তাহার ফলে এই বিশাল শক্তিমান্ পুরুষ নিজেই নিজের কাছে পরাভূত হইয়াছেন। জড়শক্তির আশ্রয়ে প্রাণপুরুষের দুর্ব্বিসহ যাতনা রাজার ভিতরে বিচিত্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহিরের প্রচণ্ডজোর তাহার ভিতরটাকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছে। নন্দিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—“নিজকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের মালখানার মোটামোটা জিনিষ চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা ; সেখানে তোমার চাপার কলির মত অঙ্গুলিটি যতটুকু পৌঁছায়, আমার সমস্ত গায়ের জোর তাহার কাছ দিয়ে যায় না।” যে কাজ যত সহজ, যত কোমল, তাহাই তাহার পক্ষে তত কঠিন। “পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোণা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্ত্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠ্‌ছে, ফুল ফুট্‌ছে। সেই খানে রয়েছে যাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মাণিক আনি, সহজের থেকে ঐ প্রাণের যাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি না।” তাহার সমস্ত শক্তি তাহার উপর বোঝার মত চাপিয়া আছে, তাহার ভার তাহার ভিতরের মানুষটিকে নিষ্পেষিত করিতেছে। বস্তুর অন্বেষণে তাহার রক্তমাংসের

শরীর পাথর হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নন্দিনী যে প্রাণপুরুষকে জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহার অস্ফুট ক্রন্দনে বুকের জ্বালা পাথর ছেদিয়া বাহির হইতে চায়—তাই পাথরের পাঁজর ভিতরে ভিতরে ব্যথিত হইয়া উঠে। নন্দিনীর অঞ্চলের স্পর্শ এক একবার তাহাকে কাঁপাইয়া যায়—তাই এক এক সময় শক্তির বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিতে গিয়া, বুকের উপর বন্ধনের শৃঙ্খল নিষ্ঠুরভাবে বাজিয়া উঠে। বারে বারে এই "নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়া-বীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে" দেখিতে পান, কিন্তু ধরিতে না পারিয়া নিজেরই উপর রাগিয়া উঠেন। তাহার ইচ্ছা হয় নন্দিনীকে বুকে টানিয়া নেন, কিন্তু শক্তির আবরণ তাকে বিশ্বজগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে চায়;—তাই বলিতেছেন—"আমি একটি প্রকাণ্ড মরুভূমি;—তোমার মত একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌ছি—আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্ব্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তা'তে মরুর পরিসরই বাড়্‌ছে, এই একটুখানি দুর্ব্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।" ঠিক এই কারণেই নিজেরই বিরুদ্ধে এতটা লড়াই। সেই লড়াইয়ে প্রাণের দুয়ারে শক্তির পরাজয়। এইবার সত্যসত্যই রাজা নন্দিনীকে সাথী করিয়া লইয়াছেন—মরণের মধ্য দিয়া মিলন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নন্দিনীকে বলিতেছেন—"আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি।" এইখানেই শক্তি অবতারের ট্রাজেডি! আবার মৃত্যুর জড়িমা ভেদ করিয়া সুপ্ত প্রাণপুরুষের নব জাগরণ!

পাশাপাশি ঠিক এই রকম একটা ভাব বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই, যেখানে ব্রাহ্মণ আর্ত্তভাগ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট মৃত্যুর মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন। রূপ-রসাদিঘটিত অবিদ্যায় মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকে; ইহাই মৃত্যুর নামান্তর। আবার বিষয়লিপ্ততার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেলেই অদ্বৈত জ্ঞানের উন্মেষ হয়, পরিদৃশ্যমান জগতের সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতির সঞ্চার হয়। এইখানেই অবিদ্যার জড়শক্তির অবসান, ব্রহ্মদর্শনের আরম্ভ। এই ব্রহ্মাত্মদর্শনই মৃত্যুর মৃত্যু,—সেই মৃত্যুতেই মুক্তির আনন্দ।

যক্ষপুরীর রাজা এই মরণের মধ্যদিয়া মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছেন। আর এই মৃত্যুর রাজ্যে অজানা তীরের সন্ধান বহিয়া মহামিলনের ডোর যে বাঁধিয়া দিয়াছে, সে আমাদের নন্দিনী। সে ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান বলিয়া কোনো সময়ের খাঁচায় আবদ্ধ নহে—সে ~~[illegible]~~ আকাশের মুক্ত বিহঙ্গম,—মানুষের অন্তরের অন্তঃপুরে অতি গোপনে নির্জ্জনে তার কুলায়, দূরান্তের বার্ত্তা বহিয়া অসীমের সঙ্গে তার সম্বন্ধটুকু জীঁয়াইয়া রাখে, অব্যক্ত কাকলিতে চির-বিরহের বেদনাটুকু জাগাইয়া তোলে—

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি যেন,
সে-কথা রয় মনে।

যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

* * *

যতই উঠে হাসি
ঘরে যতই বাজে বাঁশী
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা
সে-কথা রয় মনে
যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।

সেই বেদনায় যাতনা নাই, পুলক আছে, সেই অনন্ত না-পাওয়ায় নৈরাশ্য নাই, মাধুর্য্য আছে, বিষাদ নাই, আনন্দ আছে; তাই—

প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে;
দেখা নাহি পাই
পথ চাই
সে-ও মনে ভালো লাগে।

স্বভাব।

[শ্রীশিবদাস]

ভ্রমর খুঁজিয়া ফিরে ফুলের অমিয় কোষ,
মাছি শুধু খুঁজে মরে কোথা কার ক্ষত দোষ।

প্রেমযোগী।

[শ্রীসুখেন্দ্র চন্দ্র পাল]

ওগো মোর অন্তর দেবতা,
আজি একী ব্যগ্র আকুলতা,—
একী তৃষ্ণা, একী আকিঞ্চন—
জেগেছে অন্তরে মোর! আজি চাহে মন—
—যেন শুধু দেবতা বলিয়া নহ,
—ওগো মোর পূজ্যতম প্রিয়!
—প্রিয়তম বন্ধু বলি আজি তোমা আমি—
হে হৃদয়-স্বামি,—
বরণ করিয়া লই প্রেম-বাহু-ডোরে—
আমার এ অন্তরে!
শুধু ভক্তি নহে আজ পূজার অঞ্জলি মম!
শিষ্যসম—
গুরুর বন্দনা নহে অর্চ্চনা আমার!
নাহি চাহি আর—
ভীত সঙ্কুচিত চিতে দূরে দূরে হ'তে—
তোমারে পূজিতে!
—আজি যেগো তুমি মোর শুধু গুরু নহ,
—তুমি বন্ধু, তুমি মোর অন্তরের প্রিয়।
—তাই আজি প্রণাম করিয়া নহে,আলিঙ্গনে বরিব তোমারে—
আমার মন্দিরে।

... ...

—অন্তর প্লাবিয়া মোর আজি একী আনন্দের বান—
বহে দিকে দিকে!—একী সুধাময় গান—
আকাশে বাতাসে উঠে রণিয়া রণিয়া,
চিত্ত মোর পুলকে ভরিয়া!
চোখে মোর একী দৃষ্টি দিলে আঁকি তুমি!—
বিশ্বময় আমি
হেরি শুধু হে আনন্দ, স্বরূপ তোমার
অনন্ত অপার!

—বিশ্বময় বিকাশিছে হে সুন্দর, আজি তব আনন্দ মুরতি,
বিশ্বময় তব প্রেম-জ্যোতিঃ।
—তোমার আনন্দ-ভরা রূপের অমিয়
আজি বিশ্বময়!
একী পূর্ণ আনন্দের মহাযজ্ঞ চলিয়াছে অন্তরে আমার!
আজি আর—
স্থির থাকা ভার মোর,—তাই ক্ষ্যাপা সম—
আজি বক্ষ মম—
নাচিয়া নাচিয়া উঠে!—যেন কোন ভুলে যাওয়া আনন্দের গানে—
সৃষ্টির রহস্য আজি টানে মোরে টানে!

... ...

খুলে গেছে আজি মোর হৃদয় দুয়ার,—
স্তরে স্তরে তার—
সাজাইয়া পত্রে পুষ্পে মঙ্গল কলসে,
তোমার আসার আশে—
বসে আছি প্রতীক্ষায়!—হে অন্তর-তম;
আজি মম—
বক্ষের নিভৃত কক্ষে এসো তুমি এসো,
সকল ভুলিয়া আমি তোমা ভালবাসি,—তুমিও আমারে ভালবাসো!
বিশ্বের জঞ্জাল ভরা আমার জীবন-ভার, আমার সকলই—
তোমার মঙ্গল হাতে দিই আজি তুলি'!
—ওগো প্রিয়, আজি তুমি এসো, এসো, এসো,
বারেক আমারে ভালবাসো,—
একান্ত তোমারি হ'ব আজি যেগো আমি,—
তুমি হ'বে শুধুই আমার,—ওগো মোর প্রিয়তম স্বামি!

ব্রহ্মা ও শিবের ঝগড়া

[অজিতকুমার সেন এম, এ]

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জন্মমৃত্যুহারের সঙ্গে আমাদের দেশের জন্মমৃত্যুর তুলনা করিলে অনেক কথা জানা যায়, এবং আমাদের গলদ কোথায় তাহারও খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। বিশেষ কোনও ভূমিকার অবতারণা না করিয়া আমরা ১৯০২—১৯১১ এই দশকের কতকগুলি দেশের হাজারকরা জন্মহার ও মৃত্যুহার দিতেছি। [১৯১২—১৯২১ দশকটির জন্ম-মৃত্যুহার ঠিক স্বাভাবিক নয়; কারণ ঐ দশকে যুদ্ধে ও ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে বহুলোক মারা গিয়াছে এবং সেই জন্য জন্মহারও কমিয়া গিয়াছে। রুষিয়ার হিসাবটি ১৮৯৬—১৯০৫ দশকের এবং জাপানের হিসাবটি ১৯০০—১৯০৯ দশকের।]

দেশ	জন্মহার	মৃত্যুহার
রুষিয়া	৪৮·৪৭	৩১·৪১
ভারতবর্ষ	৩৮·৫৮	৩৪·২
সিংহল	৩৮·১২	২৯·৫
চিলি	৩৮·০৭	৩০·৪৬
হাঙ্গেরী	৩৬·৮	২৫·৬৮
জার্ম্মেনী	৩২·৯১	১৮·৩৯
জাপান	৩২·৮৫	২০·৮৬
স্কটলণ্ড	২৭·৯৯	১৬·৩৩
ইংলণ্ড	২৬·৮	১৫·১৫
সুইডেন	২৬·১৭	১৪·৬৮
ফ্রান্স	২০·২৫	১৭·৫২

এই তালিকাটি সাজান হইয়াছে একটি উদ্দেশ্য লইয়া। যে দেশের হাজারকরা জন্মহার সবচেয়ে বেশী, তাহার স্থান সর্ব্বপ্রথমে এবং যে দেশের হাজারকরা জন্মহার সবচেয়ে কম, তার স্থান সবচেয়ে শেষে। মাঝের দেশগুলির জন্মহার তাহাদের উপরের দেশগুলিরও জন্মহার হইতে কম, কিন্তু নীচের দেশগুলির জন্মহার হইতে বেশী।

এই তালিকাটি দু'তিনবার পড়িলেই একটা বড় সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। সে সিদ্ধান্তটি এইঃ—যে সব দেশে জন্মহার বেশী, সে সব দেশে মৃত্যুহারও বেশী; আবার যে সব দেশে জন্মহার কম, সে সব দেশে মৃত্যুহারও কম। অনেকের একটা হয়ত ধারণা থাকিতে পারে যে ভারতবর্ষে

জন্মহার যখন এত বেশী, তখন দেশের লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। কথাটা যে মোটেই সত্য নয়, তা উপরের তালিকাটি দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে। জন্মহার হইতে মৃত্যুহার বাদ দিলে যা বাকী থাকে, সেই থেকেই লোকসংখ্যা বাড়ে। এরূপভাবে দেখিলে দেখা যায় যে উপরের তালিকায় সন্নিবিষ্ট দেশগুলির মধ্যে এক ফরাসী দেশ বাদে আর সকল দেশের লোকসংখ্যাই ভারতের লোকসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী বাড়িয়া যাইতেছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে হাজারকরা প্রায় ৪৷৷০ জন লোক বাড়িয়াছে; সেইখানে রুষিয়ায় বাড়িয়াছে ১৭জন, সিংহলে ৯৸০ জন, জার্ম্মেনীতে প্রায় ১৪৷৷০ জন, জাপানে প্রায় ১২ জন, ইংলণ্ডে ১১৸০ জন ও সুইডেনে ১১৷৷০ জন। এক ফরাসীদেশেই লোকসংখ্যা কেবল নামমাত্র বাড়িয়াছে—হাজারকরা ৩ জনের চেয়েও কম। ভারতবর্ষে ও ফরাসীদেশে "হরে দরে হাঁটু জল" হইতে পারে, কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করা দরকার: ভারতবর্ষে জন্মহার ফ্রান্সের জন্মহারের প্রায় দ্বিগুণ এবং মৃত্যুহারও দ্বিগুণ।

ইয়ুরোপে রুষিয়ার মত জন্মহার আর কোন দেশে নাই; কিন্তু মৃত্যুহার বিষয়েও ইয়ুরোপে রুষিয়া অদ্বিতীয়। জন্মহার বিষয়ে ইয়ুরোপে রুষিয়ার পরেই হাঙ্গেরী, মৃত্যুহার বিষয়েও তাই। এশিয়ার তিনটি দেশের মধ্যে (ভারতবর্ষ, সিংহল ও জাপান) ভারতের জন্মহার সবচেয়ে বেশী, আবার ভারতের মৃত্যুহারও বেশী। জন্মমৃত্যু বিষয়ে ভারতের পরেই সিংহল; জাপানে এই তিনটি দেশের মধ্যে জন্মহার সবচেয়ে কম, সেই অনুসারে ইহার মৃত্যুহারও সবচেয়ে কম।

ফরাসী দেশটা এই তালিকার মধ্যে যেন সৃষ্টিছাড়া। ফরাসী দেশে জন্মসংখ্যা স্বেচ্ছায় নানান উপায়ে কমান হয়; কিন্তু মৃত্যুহার ইংলণ্ড, সুইডেনের চেয়েও বেশী। জন্মসংখ্যা কমান বাড়ান মানুষের হাতের মধ্যে—ভগবানের ইচ্ছা নহে—এমন কি একেবারেও বন্ধ করা যাইতে পারে; কিন্তু মৃত্যু বিষয়ে মানুষ যমরাজার প্রজা। যতদিন অমর-সুধা বা ঐরূপ কিছু আবিষ্কৃত না হয়; ততদিন মানুষ মরিবে—কমহারেই হউক বা বেশী হারেই হউক।

আমাদের দেশে জন্মহার বেশী বলিয়া আমাদের কিছু তাতে গরব করিবার নাই; কারণ লোকসংখ্যা ত তাতে আমাদের দেশে বেশীহারে বাড়িতেছে না। সুতরাং মিছামিছি এত লোকের জন্ম হওয়া কি বাঞ্ছনীয়। যতলোক জন্মায় সেই হারেই যদি লোক মরে (ফরাসী দেশের কথা আলাদা) তবে ~~লাভ~~ কি? মানুষ-জন্ম লাভ করিয়া শৈশবেই যদি ইহলীলা শেষ করিতে হয়, তবে মানুষে ও ইতর জন্তুজানোয়ারে তফাৎ কি? অগণিত মাছের ডিম হইতে মাত্র মুষ্টিমেয় মাছ হয়; এ হল প্রকৃতির লীলাখেলা; কিন্তু সমস্ত মানবসভ্যতা ত পাষাণ প্রকৃতির ক্রূর লীলাখেলার বিরুদ্ধে একটা বিরাট যুদ্ধের অভিযান। সংজ্ঞবদ্ধ সমাজের গোড়ার কথাটাই হচ্ছে প্রকৃতিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত করা। আমরা জন্মহার বিষয়ে যেমন অনেকটা অদ্বিতীয়, শিশুমৃত্যুহার বিষয়েও অনেকটা তাই! হাজারকরা জন্মের মধ্য হইতে ১ বছরের কম বয়স্ক শিশুমৃত্যুর একটা তালিকা দিতেছি; তা থেকেই আমাদের পাপের পরিমাণ যে কত বেশী তা সহজেই অনুমান করা যাবে।

দেশ	শিশুমৃত্যু (হাজারকরা জন্মপিছু)
সুইডেন	৮৪
ইংলণ্ড	১২৭
ফ্রান্স	১৩২
জাপান	১৬০
বাংলা	২৭০
পঞ্জাব	৩০৬
বোম্বাই	৩২০
যুক্তপ্রদেশ	৩৫০

সুইডেনে যেখানে ১ বছর বয়স্ক ১০টি শিশুর মধ্যে ১টি মারা যায়, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশে সেখানে প্রতি ৩টি শিশুর মধ্যে ১টি অকালে ইহলীলা সংবরণ করে! এ পাপের সাজা কোথায়?

আমাদের দেশে এত বেশী মৃত্যুহার কেন? এর সোজা উত্তর দারিদ্র্য ও রোগ। রোগের কারণও অনেকটা দারিদ্র্য। এত দারিদ্র্য, অভাব যেখানে, সেখানে নিশ্চয়ই সংসারে অস্বচ্ছলতা—এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল অনটন, অর্দ্ধাহার ও অনাহার। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই পুষ্টিকর খাবার পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। এত দারিদ্র্য যেখানে, সেখানে এই অর্দ্ধাহারের জন্য মৃত্যুহার ত বাড়িবেই। দারিদ্র্যের নিস্পেষণে ভারতবাসীর জীবনীশক্তি একেবারে কমিয়া না গেলে কি ১৯১৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে ১ বছরেই ৭০ লক্ষেরও অধিক লোক মানবলীলা সংবরণ করে? এত অভাব, দারিদ্র্য যখন, তখন আবার অযথা জন্মসংখ্যা বাড়াইয়া, অনটন অনাহারকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া অমঙ্গল ডাকা কেন? ঘোর দারিদ্র্যের ফল অধিক মৃত্যুহার, তবে জন্মসংখ্যা বাড়াইয়া দারিদ্র্য, অভাব বাড়ান কি একটা পাপ নয়? এ পাপের ফল অকাল মৃত্যু। জন্মসংখ্যা কমাইলে, অভাবের ততটা নিস্পেষণ থাকিবে না, সংসার স্বচ্ছল হইবে, রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে এবং জয়ী হইতে পারিবে।

অনেকে হয়ত মাথা ঘামাইয়া ঠিক করিবেন—আমরা "গাছেরও খাব এবং তলারও কুড়াব।" অর্থাৎ আমাদের জন্মহার হাজারকরা ৩৮ থাক্ না; আমরা মৃত্যুহার সুইডেনের মত কম করিব। তা যদি বরাবর চলিত, আমরা কোনও আপত্তি করিতাম না। কিন্তু তা বরাবর চলে না।

ভারতবর্ষের মত বেশী জন্মহার এবং সুইডেনের মত কম মৃত্যুহার যেখানে, সেখানে সত্যসত্যই লোকসংখ্যা হুহু করিয়া বাড়িতেছে। অর্থাৎ হাজারকরা ২৪—২৫ জন বৃদ্ধি পাওয়া ভয়ানক বেশী—বিশেষতঃ ভারতবর্ষের মত পুরাতন দেশের পক্ষে। কতদিন আর এইরূপ দেশে অতি মাত্রায় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত লোকসমূহের খাদ্যের সংস্থান হইবে? কিছুকাল পরেই হয়ত সেখানে আবার ভীষণ দারিদ্র্য ও মহামারী দেখা দিবে এবং মৃত্যুর হার আবার বাড়িয়া যাইবে। পরাধীন ভারতের উপনিবেশ স্থাপনেই বা কি লাভ? লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনসম্পদ আরও বেশী হারে বাড়ান উচিত; তা নইলে

আবার অভাব, অনটন এবং ইহাদের অবশ্যম্ভাবী কুফল। ধনসম্পদ বাড়িয়ে শুধু এ সমস্যার সমাধান হবে না ; আগে চাই জন্মহার কমান।

শিশুহত্যা, ভ্রূণহত্যা, সময়বিশেষে সঙ্গম হইতে বিরতি প্রভৃতি উপায়ে জন্মসংখ্যা কমান যাইতে পারে অথবা আধুনিক নানান উপায়েও ঐ ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কোনও পথই আধুনিক ভারতবাসীরা অবলম্বন করে নাই বলিয়া প্রকৃতির পরিশোধ হচ্ছে জরা মরণ বাড়িয়ে।

সমস্যাটা এই। মহাদেব যেন ব্রহ্মাকে বলছেন,—তুমি যদি বুঝে না চল, তবে আমি মজা দেখাব। ফল হচ্ছে যে বিষ্ণুই মাঠে মারা যাচ্ছেন। মানুষ যদি স্বেচ্ছায় জন্মহার না কমায়, তবে প্রকৃতির পরিশোধ আছেই অকালমৃত্যু বাড়িয়ে। মাঝখান থেকে যারা বেঁচে থাকে, তারা জন্মমৃত্যুর মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে,—তারাই মাঠে মারা যায় অন্যের কর্ম্মফলে।

এই সমস্যারূপ সূত্রের খেই হচ্ছে জন্মহার, মৃত্যুহার নয়। জন্মহার কমাও, মৃত্যুহারও আপনা আপনি অনেক কমিয়া আসিবে। আমাদের দেশে রুদ্রের এই সংহার লীলা কতকাল আর চলিবে ?

প্রাণের দোসর।

(Shelleyর Love's Philosophyর অনুকল্পে)

[শ্রীশশি ভূষণ চৌধুরী বি, এ]

ঝরণার জল নদীতে মিলায়
নদী ধায় ঐ সাগর পানে।
আকাশের গায়ে মিশে যায় বায়ু
ঝির্ ঝির্ ঝির্ কোমল গানে॥

তোমারি নিয়মে পৃথিবীর পরে
একা থাকিবার সাধ্য নাই।
প্রাণের দোসর সকলেই খোঁজে
তাই তোমা সাথে মিশিতে চাই॥

গিরি চুমু খায় স্বর্গের পায়
ঢেউ নেচে উঠে ঢেউয়ের কোলে।
বাগানের বুকে সীমাহীন সুখে
ফুল নুয়ে পরে পাশের ফুলে॥

অরুণ বিতরে ধরণীরে আলো
চাঁদ দোলে উঠে সাগরের জলে।
এই মেশামিশি সকলই মিছে
আমা সাথে যোগ না যদি হলে॥

গৃহদাহে অচলা চরিত্র।

[শ্রীধীরেন্দ্র লাল দাস]

শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত অভয়া কিরণময়ীকে কেন্দ্র করিয়া যে তীক্ষ্ণ, তীব্র সমালোচনার সৃষ্টি হইয়াছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যাহারা খোঁজ খবর রাখেন তাহা তাহাদের অবিদিত নাই। অচলা চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া সেই বিশিষ্ট সমালোচক সম্প্রদায়ের নিকট লেখককে অধিকতর গালমন্দ শুনিতে হইয়াছে। এমন কি তরুণ পাঠকদল যাহাদের মাঝে শরৎচন্দ্রের প্রশংসকের অভাব নাই, যাহারা তাহার কোন বহিরই তারিফ কম করিয়া থাকে না—তাহদেরও কাহারও কাহারও সহানুভূতি হইতে অচলা বঞ্চিত। অভয়া কিরণময়ীকে সমর্থন করিতে তরুণ পাঠক মুক্তকণ্ঠ কিন্তু অচলার বেলায় তাহাদেরই কাহারও কাহারও গলা নরম হইয়া আসে, অচলার পক্ষ লইয়া দু'টা কথা কহিতে মন সরে না। সহানুভূতির অযোগ্য বলিয়াই কি অচলা ঘৃণা ও ঔদাসীন্যের পাত্রী অথবা তাহার চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টির অভাবই কি ইহার হেতু—একথাই এখানে আলোচ্য।

শরৎচন্দ্র Realist। অচলার চরিত্রের আলোচনা করিতে যাইয়া সাহিত্যে Realism ভাল কি ভালনা তাহা দেখিতে যাইব না। তাহা প্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা লইয়া কথা কাটাকাটি করিবার দরকারও হয়ত আজ কাল করেনা। গৃহদাহ একটা ট্রাজিডি। ট্রাজিডির নিমিত্ত অচলা কতখানি দায়ী তাহা দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব।

সুরেশ মহিম দুই বন্ধু। মহিমের সাথে এক ব্রাহ্ম পরিবারের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সেই পরিবারের মেয়ে অচলা ও মহিম, উভয়ে উভয়কে ভালবাসে। মহিমকে উপলক্ষ করিয়া অচলাদের সঙ্গে সুরেশ অপ্রত্যাশিতভাবে পরিচিত হয়। সুরেশ অচলাকে ভালবাসিয়া ফেলে। মহিম অচলার বিবাহ হইয়া গেলেও সুরেশ আপনাকে সংযত করিতে পারিল না। অদম্য বাসনায় সে অচলার কাছেই আকৃষ্ট হইল। অবশেষে প্রতারণা করিয়া অচলাকে সে লাভ করে এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অজ্ঞাত বিদেশে স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার লইয়া অচলার সহিত বাস করে। দু'কথায় উপন্যাসের মর্ম্ম এই। এইটুকু পড়িয়া অচলার উপর রাগ ও বিরক্তি ধরিয়া যাইবারই কথা। কিন্তু ইহার মাঝে অনেক জটিল ঘটনাবলী। সেই দিকে লক্ষ্যহীন হইয়া যা কিছু একটা রায় দিয়া ফেলিলে চলিবে না। জীবনের সকল দোষভ্রমই কিছু এক তুলাদণ্ডে মাপা চলে না। কতগুলি অন্যায় কমবেশী সকল মানুষের জীবনেই আছে,—যাহাতে আমরা ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া যাই, খাড়া হইয়া থাকিবার কোন উপায়ই হাতের কাছে পাই না। এ অতি সোজা কথা। কিন্তু এই সোজা কথাটা যখন ব্যক্তি-বিশেষের জীবনে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠে তখন ইহাই বাঁকা হইয়া দাঁড়ায়, বাহির নিয়া যাহারা বিচার করিতে বসেন তখন তাহারা চোখ রাঙাইয়া অভিশাপ করিয়া অস্থির হন। অচলার জীবনটাও তাই। তাহার জটিল জীবনটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে গেলে আমরা নালিশ করিবার মতন কিছুই পাই না।

অচলা মহিমকে ভালবাসিয়াছিল। মহিমই ছিল তাহার সমস্ত হৃদয়খানি জুড়িয়া। কিন্তু একদিন সুরেশ আসিয়া তাহার সুমুখে দাঁড়াইল। অচলা তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও ভালবাসিল না সত্য —মহিমের অধিকৃত অন্তরে অন্য কাহারো স্থান হয় না—কিন্তু তাই বলিয়া সুরেশকে 'কিছু না' বলিয়া মন হইতে সরাইয়াও দিতে পারিল না। পারা স্বাভাবিকও নহে। কেননা সুরেশের নিবিড় স্নেহ ও পরার্থপরতাটুকু অলীক ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উড়াইয়া দিবার যো তাহার রহিল না। সুরেশ উচ্ছৃঙ্খল, সুরেশ অসংযত কিন্তু সুরেশ মহতও। অচলাদের গৃহে সুরেশের প্রথম সাক্ষাতের কথা বলিতেছি। সুরেশ ব্রাহ্মদিগকে নিন্দা করে, ব্রাহ্ম মেয়ের সহিত তাহার বন্ধুর বিবাহ হোক ইহা তাহার অভিলাষ নহে। তাই অচলা-মহিমের বিবাহ ভাঙ্গিবার জন্য অচলার পিতার কাছে মহিমের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিল। কিন্তু যখন সে দেখিতে পাইল মহিমের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা অচলার অজ্ঞাত নহে, তবু অচলা তাহাকে ভালবাসিয়াছে, সে অমনি সরল ভাবে আপনার অন্যায় স্বীকার করিতে দ্বিধা করিল না। কহিল, "না জেনে তার উপর আজ যে সকল মিথ্যা দোষারোপ করেছি সে অপরাধ আজ আমার কত বড় তা কি আপনি বোঝেননি। তাকে জুয়াচোর মিথ্যাবাদী কিছু বলতেই আমি বাদ রাখিনি, এ সকল কথা তার কাছে স্বীকার না করে কেমন করে আমি পরিত্রাণ পাব।" তারপর হাত দুইটা যুক্ত করিয়া অচলার কাছে ক্ষমা চাহিল। অচলা বুঝিল যে লোক এক মিনিট আগেও মহিমের বিরুদ্ধে যাহা তাহা বলিয়াছে এবং পরক্ষণেই অবলীলাক্রমে সকল দোষ স্বীকার করিয়া ফেলিল, একজন অপরিচিতার কাছে লজ্জা অশ্রদ্ধার ভয় করিল না সে ত খুব সামান্য, সাধারণ মানুষের মতন নহে। ইহার পর একদিন সুরেশ অচলাকে বলিল "মহিম বাড়ী গেছে, একটা চিঠি লিখে যেতেও ত পারত।" অচলা কহিল "চিঠি তিনি লিখেন না।" সুরেশ কহিল "তার সুখ দুঃখ সকলই তার একার, এনিয়ে কত বড় দুঃখ ছেলেবেলা থেকে সে আমায় দিয়ে এসেছে। দিনের পর দিন নিজে নিঃশব্দ উপোস করে আমার প্রতিদিনের খাওয়া পরা তিক্ত বিষাক্ত করেছে। আমার ভয় হয় যে পাষাণকে নিয়ে আমি কখনো সুখী হতে পারিনি তাকে নিয়ে আপনি কি সুখী হতে পারেন?" বলিতে বলিতেই তাহার চোখদুটা অকস্মাৎ অশ্রুজলে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। সুরেশের বন্ধুপ্রীতি, হৃদয়ের কোমলতা অচলার চোখের সুমুখে জীবন্ত হইয়া উঠিল। সুরেশের সঙ্গে অচলার বিবাহ দিতে অচলার পিতা সানন্দে সম্মত হইলেন। সুরেশ অচলার সম্মতি চাহিল। অচলার অনিচ্ছাপ্রকাশে সুরেশ বলিল "এতে আমার চোখে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তবু যাবার সময় একটা ভিক্ষা চেয়ে যাচ্ছি, আমার দোষ অপরাধগুলি মনে রাখবেন না! খারাপ কাজের জাহাজ বোঝাই করে বিদায় হলুম, কিন্তু বাস্তবিক পিশাচও আমি নই।" এমনি অনাড়ম্বর-ভাবে-বলা কথাগুলি সুরেশের ব্যথা সরলতা কতখানি ব্যক্ত করিল তাহা অচলার চোখ এড়াইল না। তারপর সুরেশের অকাতর দান, অপরের রোগে বিপদে গা ঢালিয়া দেওয়া এ সকল অচলা চোখের উপর দেখিল। সুরেশ

উচ্ছৃঙ্খল সাংঘাতিক মাথার ঝোঁকে হঠাৎ কিছু করিয়া বসে অচলা তাহা দেখিয়াছে• তথাপি তাহার প্রতি সুরেশের ভালবাসা আবিষ্কার করিয়াও সে তাহাকে এড়াইতে পারিল না কারণ সুরেশের মাথার ঝোঁক দিয়াই কেবল অচলা তাহাকে বিচার করিতে পারিল না। তাহার ঔদ্ধত্যের আবরণের তলে যে উদারতা, কোমলতা, আবেগ, উচ্ছ্বাস লুকাইয়াছিল অচলার চেয়ে অধিক তাহার পরিচয় আর কেহ পাইলনা। দুর্গেশনন্দিনীর আয়েসা ওসমানকে অবহেলা করিতে পারিয়াছিল কারণ নবাবনন্দিনীর চোখে ওসমান অনেক ছোট ছিল। কিন্তু অচলা সুরেশকে অপমান করিতে পারিলনা। তাই সুরেশ অচলার জীবনে জড়াইয়া থাকিতে পারিল। মহিমের সহিত অচলার বিবাহ হইয়া গেল। সুরেশকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কোন দর্প দম্ভই অচলা অনুভব করিল না। সুরেশ ইহাতে কতখানি রিক্ত হইল অচলা বুঝিতে পারিল। তাহার হৃদয় আর্দ্র হইল। এইটুকু মনে রাখিলে পরে অচলাকে বুঝিতে শক্ত হইবে না। এই পর্য্যন্ত অচলার জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ। বিবাহের মুহূর্ত্তে স্বামীর উদ্দেশে ভক্তিগদগদভাবে অচলা মনে মনে বলিল "প্রভু তোমার কুটীরই আমার রাজপ্রাসাদ।" কিন্তু এই উচ্ছ্বসিত আকাঙ্ক্ষা যে পূর্ণ হইতে পরিল না ইহার নিমিত্ত অচলা কি পরিমাণে দায়ী ছিল? মিলনানন্দে বিভোর হইয়া অচলা ভাবিয়াছিল পল্লীগ্রামের অশান্তি অসন্তোষের মধ্যে তাহারা দুইটী স্বামী-স্ত্রী উভয় উভয়কে লইয়া সুখে থাকিবে। পল্লীগ্রামের সহিত তাহার মুখোমুখী কোনদিনই হয় নাই। যাহা সে বিপুল ধৈর্য্য সহকারে সহ্য করিবে ভরসা করিয়াছিল তাহাই বুকে লইয়া বহন করিবার সামর্থ্য তাহার হইল না। "পল্লীর সহিত ছাপার অক্ষরের ভিতর দিয়াই তাহার পরিচয় ছিল। সে পরিচয়ে দুঃখ দারিদ্র্যের সহস্র ঈঙ্গিতের মধ্যেও কবিতা ছিল। পাল্কী হইতে নামিয়া সে বাড়ীর ভিতরে একবার চাহিয়া দেখিল কবিত্বের এতটুকু ঈঙ্গিত তাহার হৃদয়ে আঘাত করিলনা।" তাহার বুক যেন ভাঙিয়া পড়িতে চাহিল। পাড়ার মেয়েরা বধূ দেখিতে আসিয়া অচলার বয়স অনুমান করিয়া মুখ চাওয়াচাওয়ি গা টেপাটেপী করিল এবং ম্লেচ্ছ প্রভৃতি দুই একটা মিষ্ট কথাও অচলার কাণে পৌঁছিল।" (পৃঃ ১৩৬—১৩৭) এমন অভাবনীয় অবস্থায় পড়িলে একজনের মন কি করিতে থাকে বুঝা শক্ত নয় এবং বুঝিলে অচলাকে ভর্ৎসনা না করিয়া করুণা করিতে হয়। সহরের শিক্ষিতা মেয়ে, শিষ্টাচার সহৃদয়তার মধ্য দিয়াই যে মানুষ এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সহানুভূতিহীন অশিষ্ট লোকগুলির মধ্যে—যাহারা মুখের কথায় আত্মীয়তা দেখাইতেও কাতর—দুঃখে ঘৃণায় সে যে অধীর হইয়া উঠিবে এবং সেস্থান যে তাহার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে এ আর আশ্চর্য্য কি?

মৃণাল নামে একটী মেয়েকে তাহার স্বামীগৃহ হইতে মহিম কয়দিনের জন্য বাড়ী নিয়া আসিল। "মৃণাল ঘরে ঢুকিয়াই লণ্ঠনটা অচলার মুখের কাছে ধরিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল"। তারপর মেয়েটা যাহা বলিয়া যাইতে লাগিল তাহার সকলি ঠাট্টা সন্দেহ নাই কিন্তু এই জাতীয় ঠাট্টার সহিত অচলার কোন কালেই পরিচয় নাই। মৃণাল কহিল "আচ্ছা ভাই ঠান্‌দি হিংসে হয় নাকি? এ সংসারে আমারই ত গিন্নী হ'বার কথা.. ......কি কপাল করেছিলুম ভাই কোথাকার একটা বাহাত্তুরে বুড়ো ধরে আমাকে

দিলে"। মৃণালের স্নেহময় অন্তরের সন্ধান যে অচলা পাইল না তাহা নহে কিন্তু মহিমের সহিত মৃণালের সম্পর্কটাই তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। মৃণাল যখন তাহার কাছে বলিল মহিমের সঙ্গেই তাহার বিবাহ হইবার কথা ছিল কিন্তু হইয়া উঠিল না, এই কথাটাই তাহার চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল যে, ছেলেবেলায় যাহাকে প্রাণদিয়া ভালবাসা যায় তাহার পরিবর্ত্তে একজন ষাট বৎসরের বৃদ্ধকে স্বামীরূপে পাইয়া একজন নারী কি করিয়া সুখী হইতে পারে। নিজের মন দিয়া অচলা ইহার মীমাংসা করিতে পারিল না। এই ব্যাপারের আর একটা দিকও সে লক্ষ্য করিল। "মৃণালের সঙ্গে একত্র কাজ কর্ম্ম করিতে করিতে তাহার একশবার মনে হয়, সে নিজে মেয়ে মানুষ হইয়া যখন বুকের মধ্যে একটা গোপন ঈর্ষ্যার বেদনা বহন করিতে থাকিয়াও ইহাকে (মৃণালকে) কোনমতে ছাড়িয়া দিতে পারিল না, একত্র এতকাল ঘর করিয়াও কি কোন পুরুষ মানুষে (মহিম) এ মেয়েকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে"। মৃণালের অন্তরের মাধুর্য্য অচলাকে মুগ্ধ করিয়াছিল সত্য কিন্তু ইহারই নিমিত্ত সে সন্দিগ্ধ হইল আরও বেশী।

অচলার সহিত একসঙ্গে খাইতে কোন মতেই স্বীকৃত না হইয়া অভুক্ত অবস্থায়ই মৃণাল যেদিন স্বামীগৃহে চলিয়া গেল, অচলা ব্যথা বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। এমন সময় মহিম আসিয়া অচলাকেই দোষী করিয়া বলিল "মৃণালের সঙ্গে যে তোমার বনিবনা হবে না তা আমি কিছুতেই ভাবিতে পারিনি। তার সঙ্গে কারও কোনদিন ঝগড়া হয়নি"। এই অনর্থক দোষারোপে ও মৃণালের প্রতি পক্ষপাতে অচলার জ্বালার সীমা রহিল না। এমনি করিয়া যখন অচলার মনে সন্দেহের মেঘ ঘনীভূত, তখনই সুরেশ দুষ্টগ্রহের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। মহিমকে নিয়া যখন অচলার মনে দ্বন্দ্ব, যখন তাহার চিত্তে প্রতিষ্ঠিত মহিমের মহিমময় মূর্ত্তিতে খুঁত দেখিয়া অবিশ্বাসের বেদনায় অচলা আকুল, নির্ব্বান্ধব পল্লীতে যাহার প্রেম সম্বল করিয়া সে দিন যাপন করিবে ভাবিয়াছিল তাহারই প্রেমভালবাসায় সে যখন অতীতের উজ্জ্বলতা হারাইয়া ফেলিল, তখন অকস্মাৎ আগত সুরেশকে শুভাকাঙ্ক্ষী মনে না করিয়া পারিল না। ইহাতে কাহারো গা ছম ছম করিবার কথা নহে। এখানে ছাপার লেখার ওজনে বিচার করিলে চলিবে না কারণ এখানে গভীর জটিল মনস্তত্ত্ব।

ইংরেজীতে যাহাকে Undemonstrative বলে মহিম ছিল সেই জাতীয় লোক। আবেগ উচ্ছ্বাসের ধার সে কোনদিনই ধারিত না। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে আবেগ উচ্ছ্বাসেরও একটা প্রয়োজন আছে এবং ইহারই নিমিত্ত একটা হৃদয় তৃষিত হইয়া থাকে। মহিম একথা যদিও বুঝিল, অচলার মনে একটা সন্দেহের ছায়া পড়িয়াছে তবু অচলাকে দুইটা ভাসা ভাসা কথা কহিয়াই খালাস হইতে চাহিল। এইখানে আবেগ উচ্ছ্বাসের দরকার ছিল। মহিম যদি আদর-সোহাগ করিয়া অচলার কাছে আপনার মনটা খুলিয়া দিতে পারিত এত বড় অপ্রীতিকর ব্যাপারটা সাঙ্গ হইতে বিলম্ব হইত না। মহিম তাহা করিল না, অচলার মনের আন্দোলনটা ফেনাইয়া উঠিতে লাগিল।

যেখানটায় ব্যথা সেখানেই আঘাত করিয়া সুরেশ একদিন প্রশ্ন করিল "তুমি এখানে সুখে আছ কি অচলা"? অচলা বলিল ইহা জানিতে যাওয়া তাহার উচিত নয়। সুরেশ বলিল "কেবল মাস দুই

পূর্ব্বে এ ভাবনা যে আমার উচিত ছিল তাই নয় অধিকারও ছিল। আজ দু মাস পর সব অধিকার ঘুচে থাকে ত নালিশ কচ্চিনে, এখনমাত্র সত্যি কথাটা জেনে যেতে চাই। এসে পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে জিতেচ আবার মনে হচ্ছে হেরেচ, আমার মনটাত তোমার অজানা নেই একবার সত্যি করে বল ত অচলা"। সুরেশের কথা বলিবার ভঙ্গিটাই আলাদা কারণ তাহার মুখের কথা মনের তল হইতে উঠিয়া আসে। সুরেশের বিদীর্ণ হৃদয়ের খবরটা অচলা জানিত তাই তাহার চোখ দুটা জলে ভরিয়া গেল। সুরেশের ব্যথাটাই আজ তাহার কাছে জ্বলন্ত হইয়া উঠিল। একদিকে সুরেশ, তাহার রক্ত-রাঙা হৃদয় এবং ভালবাসার শ্রাবণ-প্লাবন লইয়া, অন্য দিকে মহিম যাহার ভালবাসা অচলার চোখে উড়িয়া গেছে! অচলার এ বিষম সমস্যা। ঝোঁকের মাথায় সুরেশের সঙ্গে অচলা কলিকাতা যাইবে স্থির করিল। কিন্তু সেই দিন রাত্রিতে মহিম যখন অচলার যাওয়ার সম্বন্ধে বলিল "যাকে ভালবাসনা তারই ঘর করতে হবে এত বড় অন্যায় উপদ্রব স্বামী হলেও তোমার উপর করতে পারবো না"। তখন অশ্রু-বিকৃত-কণ্ঠে অচলা বলিল "কিন্তু তুমিও ত ভালবাস না"। এ কথার উত্তরে মহিম শুধু বলিল "আমি ত কখনো তোমাকে বলিনি"। এই যেন যথেষ্ট হইয়া গেছে। অচলা উত্তেজিত হইয়া বলিল "শুধু মুখের বলাই সত্যি আর সবই মিথ্যে! রাগের মাথায় মনের কষ্টে যা কিছু মানুষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় তা নিয়েই তুমি জোর খাটাতে চাও"। এই কথাগুলিতে অচলার আত্মত্রুটির কতখানি স্বীকারোক্তি নিহিত ছিল তাহা সহজ ও সরল। সে আরও বলিল "তোমার মতন নিক্তির ওজনে কথা বল্‌তে না পারলেই কি তাকে পা দিয়ে ডুবিয়ে দিতে হবে"। যাওয়ার পূর্ব্ব-রাত্রে মহিমের ঘর পুড়িল। ভোরে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অচলার মন হা হা রবে কাঁদিয়া উঠিল। সে পাল্কী আনিতে নিষেধ করিল। "মহিম কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে হঠাৎ ঝুকিয়া পড়িয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। হয় ত স্বামীর হাত দুটা ধরিয়া কাছে টানিয়া বসাইত ও আরো কিছু ছেলেমানুষী করিয়া ফেলিত; কিন্তু সকাল হইয়া গেছে—চারিধারে কৌতূহলী লোক।" মহিমকে ফেলিয়া অচলা সুরেশের সহিত যাইতে কোন মতেই চাহিল না। সে মহিমকে বলিল এখান হইতে দুজনে কলিকাতা যাইয়া তাহার অলঙ্কারপত্র বেচিবে এবং তারপর পশ্চিমে বাড়ী করিয়া তাহারা স্বামীস্ত্রী নিরিবিলি বাস করিবে। ইহার উত্তরে বহুদূরদর্শী মহিম বলিল "কিন্তু না আমার না তোমাদের ভাল হবে বলেই আমার বিশ্বাস"। সে দিন যদি মহিমের এ বিশ্বাস না হইত, সেই একটী মুহূর্ত্তের জন্য খালি মহিম যদি স্বল্পদর্শী থাকিয়া যাইয়া অচলাকে সুরেশের সঙ্গে ঠেলিয়া না দিয়া পত্নীর সঙ্গে নিজে যাইতে দ্বিধা না করিত, তাহা হইলে হয় ত এত বড় একটা ট্রাজেডি না হইতেও পারিত। এই গেল অচলার জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বামীগৃহ হইতে বিদায়ের মুহূর্ত্তে অচলার যে ছবি আমরা দেখিতে পাই তাহাতে সম্ভ্রম-সমবেদনায় হৃদয় পূর্ণ হয়। ইহার পর এমনি উজ্জ্বল আলোকে অচলাকে দেখিতে পাই সুরেশের গৃহে মহিমের শয্যাপার্শ্বে। চিরদিনের বাকসংযত মহিম সেদিন সেবানিরতা অচলার পানে চাহিয়া বলিল "………তুমি কাছে না থাক্‌লে আমি হয়ত বাঁচ্‌ব না।" অচলার হৃদয়ের যত স্নেহ যত মাধুর্য্য

এতদিন রুদ্ধ হইয়াছিল সমস্তই এক সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে মুখ খুলিয়া দিল। মহিমকে লইয়া জব্বলপুর চেঞ্জে যাওয়া স্থির হইল। যাওয়ার দিন যতই ঘনাইয়া আসিল, অচলার মন আশায় আনন্দে ভরিয়া উঠিতে থাকিল। "সেখানে তাহার স্বামী ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরিরা পাইবে। একাকী সে-ই সেখানে ঘরণী গৃহিণী, সর্ব্বকার্য্যে স্বামীর সাহায্যকারিণী। সেখানে জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, জীবনযাত্রার পথ সহজ ও সুগম; হয়ত তিনি ভাল হইলে তাহারা সেইখানেই ঘর সংসার পাতিয়া বসিবে এবং অচির ভবিষ্যতে যে সকল অপরিচিত অতিথিরা একে একে আসিয়া তাহাদের গৃহস্থালী পূর্ণ করিয়া তুলিবে তাহাদের কচিমুখগুলি সে যেন চোখের উপরে দেখিতে পাইল। কাহারও বিরুদ্ধে আর তাহার কোন নালিশ রহিল না—অন্তরের সমস্ত গ্লানি ধুইয়া মুছিয়া গিয়া হৃদয় গঙ্গাজলের মত পবিত্র হইয়া উঠিল।" (পৃঃ ৩০২—৩০৩) কিন্তু ক্রুদ্ধ দেবতার অভিশাপে অচলার অদৃষ্ট যে দগ্ধ তাই তাহার সুখের স্বপ্ন সার্থক হইল না।

তারপর অচলার জীবনের ভীষণ crisis;—কিন্তু এইখানেই কি তার স্বেচ্ছাকৃত কোন অপরাধ ছিল? সুরেশ তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া আসিবার পর সুযোগ পাইয়াও সে কেন সুরেশকে ত্যাগ করিয়া গেল না? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া পাওয়া খুব শক্ত নহে। মহাশত্রুর মৃত্যু অবস্থায়ও করুণা হয়। সেই সহায়হীন ইষ্টিসনে মরণাপন্ন সুরেশের পানে চাহিয়া অচলা তাহার সকল অপরাধ ভুলিয়া গেল। তাহার জীবন রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং নিজের দিকটায় দৃষ্টি করিবার অবসর পাইল না। যে ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাইয়া দুজনে আশ্রয় গ্রহণ করিল সেখানকার সকলেই তাহাদিগকে স্বামী-স্ত্রী জ্ঞানেই আশ্রয় দান করিলেন। তাহাদের এই ধারণা ভাঙ্গিয়া সত্য বলিবার অবস্থাও তখন ছিল না—অচলার সাহস ও হইল না। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও অচলা নিশ্চিত ছিল শীঘ্রই আত্ম-পরিচয় জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু বাড়ীর কর্ত্তা রামবাবু যখন অচলার বাক্য ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে তাহার পিতৃহৃদয়ে স্থান দিলেন, তাহাদের স্বামীস্ত্রীর (?) মঙ্গল কামনায় দেবতার কাছে তুলসী দিতে লাগিলেন, অচলা সেই পিতৃসম ব্যক্তিটীর স্নেহ ভালবাসা ক্ষুণ্ণ করিতে সাহস পাইল না। কিন্তু তাই বলিয়া অচলার মানসিক যাতনারই কি অন্ত ছিল? নিজের জীবনটার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অচলা দেখিল এ যেন একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপ মাত্র। "ভাগ্যবিধাতাই তাহার যৌবনের প্রথম আনন্দটাকে মিথ্যা দিয়া এমন বিকৃত এমন উপহাসের বস্তু করিয়া জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিতে লেশমাত্র মমতা বোধ করে নাই। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বার বার বলিতে লাগিল 'হে ঈশ্বর তোমার এই অতি বড় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এই দুর্ভাগিনীর জীবনটা ভিন্ন কি কৌতুক করিবার কিছুই ছিল না।" বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের উপর এবং তাহার সৃষ্টি-কর্ত্তার উপর দুর্জ্জয় অভিমানে অচলা আপনাকে অবস্থার স্রোতে ছাড়িয়া দিল। এইখানে একটা কথা উঠিবে, ভগবানের উপর অভিমান এও কি একটা কৈফিয়ৎ! মানুষের মনের খবর যাহারা রাখেন, জীবনে পদে পদে যাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হইয়া গেছে একথার সত্যতা তাহাদের অগোচর

থাকিবে না। তারপর অচলার সর্ব্বনাশ। ইহার জবাব কি? এইখানে অচলা এবং মৃণালের পার্থক্যটা লক্ষ্য করিতে হইবে। অচলাকে মৃণাল বলিয়া ভুল করিলে চলিবে না। "নিরবরুদ্ধ সমাজের অবাধ স্বাধীনতায় চোখ কান খোলা রাখিয়াই অচলা বড় হইয়াছে। তাই বাহিরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সেদিন সে ভদ্রমহিলার সম্ভ্রমের বহির্বাসটাকেই আঁকড়াইয়া রহিল এই আবরণের মোহ কাটাইয়া"। একান্ত শুভানুধ্যায়ী স্নেহশীল বৃদ্ধের পুনঃ পুনঃ "তুমি শুতে যাও মা" বলবার পর সেই দুর্য্যোগের রাত্রে কোন প্রকারেই বলিতে পারিল না, সে পরস্ত্রী—সুরেশ তাহার কেহ নহে। "মৃণালের কাছে স্বামী ছিল অত্যাজ্য ধর্ম্ম, জীবনে মরণে অদ্বিতীয় নিত্য। কিন্তু অচলার শিক্ষা এই ভাবে হয় নাই। তাহার আজন্ম শিক্ষা ও সংস্কার ভিতরটাকে তুচ্ছ করিয়া কারাগার ভাবিয়া বাহিরের জগতটাকেই সকলের উপর স্থান দিয়াছে তাই সেদিনও বাহিরের খোলসটা বড় হইয়া তাহার ধর্ম্মকে পরাভূত করিয়া দিল।" (পৃঃ ৪৯১—৪৯২) এই সকল কথা লক্ষ্য না করিয়া অচলাকে অভিশাপ করিলে অবিচার করা হইবে। অচলার জীবনের দুর্গতির তুলনা নাই সত্য কিন্তু সেই দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় অচলার হাতে ছিল না। সুরেশের সহিত প্রথম সাক্ষাতের দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত অচলার জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে মৃণালের সহিত গলা মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয় "আশ্রমই বল আশ্রয়ই বল, সেজদা, সে যে তার তোমারই কাছে।"

সুর।

[শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র কর, এম, এ]

পরাণ আমার বাইরে ছুটে,
        গানের সুরে, সুরে;
মিশিয়ে যেতে দিক্ দিগন্তে,
        দূরে—দূরে,—দূরে।
মিল্‌ছে যেথায় ভুবন, গগন,
উঠ্‌ছে শশী, ডুব্‌ছে তপন;
সুর-লহরী হারায় যেথা
        আপন কায়াটিরে;
প্রাণ যেতে চায় সীমা-হারা
        সেই সাগরের তীরে।

মেঘে মেঘে আলাপ সেথা
তড়িৎ প্রতিদানে ;
তারায় তারায় গোপন কথা,
চটুল চোখের কোণে।
সকল সুরের সেইখানে লয়,
প্রাণে প্রাণে ভাব বিনিময় ;
বাক্য সেথা অর্থ-বিহীন
নীরব আলাপনে ;
প্রাণ যেতে চায় সেইসুদূরে,
গানে,—গানে,—গানে !

'নিবেদন।'

[শ্রীরথীন্দ্র কুমার গুহরায় বি, এ]

সে ছিল দার্শনিক—আপ্‌না-ভোলা। কর্ণাটের রাজপ্রাসাদের পার্শ্বে, জীর্ণ তার কুটীর যেন ভোগ বিলাসকে ব্যঙ্গ কর্‌তো। ভোরের আলো, পাখীর গান, গোধূলির আকাশে গলিত স্বর্ণের আভা, তাকে কিছুই টলাতোনা। শুধু পুঁথির চাপে সে পড়ে থাক্‌তো। নিস্তব্ধ পূর্ণিমা রাতে অম্বরতল হ'তে যখন জ্যোৎস্না-স্রোত নেমে আস্‌তো, সমীর-হিল্লোলে মদির লহরী রজনীগন্ধার স্রোতে ভেসে বেড়াতো, বুকের বই সে জোরে আঁক্‌ড়ে ধর্‌তো। রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষার ধবল, অনিন্দ্য, নির্ম্মল, চন্দ্রকান্ত মণিময় প্রাসাদ-সৌধ-চূড় দূরে দেখা যেতো, দখিনের বাতায়ন-তলে বল্লরী-বিতানে ইন্দুমল্লী মঞ্জরিত, স্ফটিক-প্রাঙ্গণে জলযন্ত্রে ছল ছল ছল উৎসধারা বইতো, তার মন কিছুতেই বস্‌তো না, বই খুলে সে পড়্‌তো—'সৌন্দর্য্য কাহারে বলে।

* * * * * * *

বাতাস ছিল উতলা আকুল, রাজসরোবরে কমল-বনে প্রস্ফুটিত পুষ্পদলের মদির-গন্ধে চার্‌দিক্‌ আকুল হচ্ছিলো। ভোরের আলোর প্রথম চরণ-পরশের সাথে রাজ-প্রাসাদে বেজে উঠ্‌লো সাহানাধ্বনি, দখিণের দোলা-লাগা, পাখী-জাগা সেই বসন্ত প্রভাত যেন আলোর ঝল্‌মলানিতে নেচে উঠ্‌লো। হঠাৎ যেন তার কি মনে হলো—অজানা কি ভাবের শিহরণে গা শিউরে উঠ্‌লো। হাতের বই খসে পড়্‌লো, চোখ তুলে বাইরে চেয়ে সে দেখ্‌লো—সহচরীদের সাথে রাজ-কুমারী চলেছেন—হোলীর উৎসবে ফাগ্‌ খেল্‌তে। 'রক্তকমলের মতো রাঙা দু'খানি সুন্দর পা, মৃণালের মতো কোমল দু'টি

হাত, পদ্মের সুগন্ধের মতো সৌরভে তার দেহ ভরা। উষার আধ আলো এসে পড়েছিলো তার মুখের ওপর ; মেঘের মতো কালো কাজল-পরা চোখের, তারার আলোর মতো উজ্জ্বল স্নিগ্ধ চাউনীতে তার মাথা ঘুরে গেল। মনে হলো বিশ্ব-প্রকৃতি সুন্দরী মানব-তরুণীর সাজ পরে মর্ত্ত্যভূমে মূর্ত্ত হয়ে এসেছেন্। সে আর চাইতে পার্ল্না। রাজকুমারী চলে গেলেন—বিজলীর দীপ্তির পর আবার আঁধার এলো। সে বসে পড়্লো। বাইরে রাজপথ পর্য্যন্ত লালে লাল হয়ে উঠেছে। মনের তার গোপন পুরেও যেন লালিমা ঢুকেছে—কোন্ রঙে ? কে জানে। খসে-যাওয়া পুঁথি তুলে আবার সে খুলে বসলো। মন তো তাতে বস্লো না।

... ...

পূর্ণিমা রাত্রি। অমল-ধবল জোছ্না-ধারা কুটীরের ভেতর ঝরে পড়্ছে ; আজ্কের এই আলো তার কাছে তারালোকের ঝরে-পড়া ঝর্ণার মতো, রসের ফোয়ারার মতো মনে হচ্ছে। আজ সব ছন্দ-বন্ধ গ্রন্থগীতি সে ছেড়ে দিয়েছে। জোছ্নার ইন্দ্রজালে তারার চিকিমিকি, তার দেহের রক্ত ঝিল্মিল্ কর্ত্তে লাগ্লো। রাজপুরীতে কে বাঁশী বাজাচ্ছে—বাঁশীর সুর তার মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিলো। তন্ময় চিত্তে বাঁশী শুন্তে শুনতে সে দেখ্তে পেলো—বিশ্বব্যাপিনী কার এ রূপ ? চন্দ্র তার মুখের হাসি, জ্যোছ্না তার অবগুণ্ঠন, জ্যোছ্না পথ তার চরণ, কে এ ? কর্ণাটের রাজকুমারী চাঁদের আলোয় মিলিয়ে কোথা চলে গেল, বাঁশী শুধু ফিরে ফিরে কাঁদ্লো—'এসো বঁধু ফিরে এসো'।

ভোরের আলো পৃথিবীতে পৌছাবার আগেই সে তার রক্তের প্রতিকণা দিয়ে অনুভব কর্লো —পৃথিবী তাকে ডাক্ দিয়েছে, প্রকৃতি তাকে ডাক্ছে—ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়্লো। পদ্মবনে তখনো মাধবীকুঞ্জের ভৃঙ্গের ঝঙ্কার উঠেনি, অশোকের সাথে তখনো কেকারব হয়নি, উষার অন্ধকার ছায়ায় সে কোন্ অদৃশ্য আকর্ষণে রাজ-উদ্যানে উপস্থিত হলো। রমনীয় উদ্যানে কমনীয় দীর্ঘিকা। আম্র-মুকুল-গন্ধ-উদাস দখিন হাওয়া কালো জলের ওপর নাচ্ছিলো। ধীরে উদীয়মান সূর্য্যের রক্তপ্রভা পদ্মবনে এসে পড়্লো। কুহু কুহু কোকিল গাছে ডাক্তে লাগ্লো। সরোবর তীরে সে বসে পড়্লো —বড় জীর্ণ, ক্লান্ত। কিশলয় ভরা রক্তালোক, কুরুবক-ভরা মাধবী মণ্ডপ, বকুল মূলে বেদিকায় শ্বেত ফুলের রাশ, জলে শুভ্র রাজহংসের ক্রীড়া, তার চোখের সাম্নে এক দেবী পুরীর দৃশ্য তুলে ধর্লো। এ পুরী আলোয় উজ্জ্বল করে কে দেবী আস্ছেন—তার চোখ ঝল্সে গেল,—এ যে রাজকুমারী— সখীদের সহ। তার বোধ হলো, জগতে অমন শ্রী আর নেই। যা কিছু সুন্দর তাই দিয়ে তার সৃষ্টি। ফুলের গন্ধে, রামধনুর রঙ্গে, বসন্তের আনন্দে তার তনু তৈরী। সে বিস্মিত হলো, মোহিত হলো, ভীত হলো। সে উঠে দাঁড়ালো। রাজ কুমারী বল্লেন 'তুমি কে' ? সহচরীরা বল্লে 'পাগল সাধু'। কোমল চাউনী চেয়ে রাজকুমারী চলে গেলেন। সে চাউনীতে সত্যি সে পাগল হতে চল্লো। ফাগুন্-হাওয়ার উতলা কুঞ্জমাঝে তখনো যেন চারু-চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজ্ছিলো ; কুঞ্জের ধারে পৃথিবীর বুকের ওপর সে শুয়ে পড়্লো।

* * * * * * *

প্রকাণ্ড রাজসভা। আলো করে বসেছেন রাজকুমারী। তার কোণে চুপটি দাঁড়িয়ে সে মৌন। তার দৃষ্টিতে কত আশা, কত ভাষা, কত ভাব। অর্থী প্রত্যর্থী সব চলে যাচ্ছিলো, সভা প্রায় শেষ হতে চল্‌লো। মন্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস্ কল্লেন্ "বই রেখে তুমি এসেছ, কি চাও" ? রাজকুমারী বল্লেন্ 'কিছু কি চাই ?' কথার সুরে বিমুগ্ধ হয়ে সে চেয়ে রইলো—কিছু বল্‌তে পার্ল্লে না, শেষে মাথা নেড়ে জানালো—'কিছু চাইনে।' রাজকুমারী চলে গেলেন—সভা ভেঙ্গে গেল, নির্জ্জন হলো—সিংহাসনের পাদপীঠে লুটিয়ে প'ড়ে সে মনের বেদনা জানালো।

নিত্যি সে সভায় আসে, নিত্যি রাজকুমারী গেলে চলে যায়, আর দাঁড়িয়ে থাকে, নির্ব্বাত, নিষ্কম্প। পুঁথির চাপে সে আর পড়ে নেই। রাজকুমারীর একটু হাসি শতলক্ষ পুঁথির মতো তাকে আনন্দ দেয়।

* * * *

সেদিনও পূর্ণিমা। দোলপূর্ণিমা। আকাশের প্রান্ত থেকে চাঁদের অমিয়ধারা নীরব পৃথিবীর ওপর পড়্‌ছিলো। পাশে কুটীরে বাঁশীতে সুর বাজ্‌ছিলো—'আমার একটি কথা বাঁশী জানে, ভরে রইলো মনের ভিতর'। সুর উচ্চে উঠে প্রাসাদ, পথঘাট ছেয়ে ফেল্‌লো। প্রকৃতির সমস্ত যেন বাঁশীতে মুগ্ধ হয়ে গেল। কত অতৃপ্ত বাসনার কথা, কত অজানা বেদনার বাণী, কত হৃদয়ের গোপন কামনা বাঁশীতে ফুটে বেরুলো। রাজপুরী তন্ময় হয়ে গেল। সুরের রেশ আপনি কেঁদে আপনি যেন থেমে গেল। ... ...

পরদিন প্রভাতে আর তাকে দেখা গেলনা—রাজসভায়। রাজকুমারীর আদেশে প্রহরী গিয়ে দেখ্‌লো—বাঁশীর কাছে সে পড়ে রয়েছে,—মৃত,—বুকের ওপর কাগজে লেখা—

তবে পরাণে ভালোবাসা কেনগো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধিহে
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে আমি কি দিয়ে ?

চোখের কোণে অশ্রু তখনো ছল ছল কচ্ছিলো।

"কত কথা জেগে হারা অনিবার তরুণী-হৃদয়ে।"

[শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]

অঝোর ঝরিছে বারি, আকাশের ঝরণা-ধারায়,—
বিরহ আবেশ বহি' বিয়াকুল তরুণ-হিয়ায় ;
চুম্বনে রাঙ্গা'য়ে ধীরে, মুঞ্জরিত নব-কিশলয়,
আশায় ফুটায়ে কেয়া, বাদলের ব্যথা-পরিচয় !
বাতায়নে বসি' বসি' চাহি এই অকুণ্ঠিত ধারে—
নিমেষে ভাবিয়া মরি কত কথা হৃদয় মাঝারে,
প্রাণবান চিত্ররেখা সম। মানস ঘেরিয়া অনিবার
আসে কত, ভাসে কত, মানসী প্রতিমা কল্পনার
অর্ঘ্যরাশি হাতে ল'য়ে। কণ্ঠে বরি' মধুর সম্ভাষ
বক্ষে চিরামৃত ধারা, চক্ষে চল সঞ্জীবিত আশ ;—
চরণে মথিয়া বুক, পিয়াসীর আবেশ অধীর
শতমূর্ত্তি স্পষ্ট দিবালোকে।

কবরী দোলা'য়ে দিয়ে দূরান্তরে নীল বাতায়নে,
তরুণী অলস হ'য়ে। নীলাম্বরী পড়েছে খসিয়া,—
বাদলের দোল বায়ে, বক্ষ হ'তে কাঁপি' শিহরিয়া,—
আনমনে রহিয়াছে বসি'; প্রিয়দয়িত বিরহে—
অতীত স্মৃতির রেখা, আকুলিয়া চল চল রহে,
বক্ষের পঞ্জর মাঝে। কবে সেই বাসর শয্যায়,
একরাত্রি জড়াইয়া প্রিয়কণ্ঠে হিয়ায় হিয়ায় ;—
নিয়েছিল দেহ মাঝে তৃপ্তিহীন অর্দ্ধ-রক্ত কণা
পূর্ণ করিবার লোভে ; চিত্ত মাঝে প্রণয় জল্পনা
তারি স্মৃতি হাহাকারে গুমরিয়া দ্বিগুণ জ্বালা'য়ে—
আকুল করিয়া তোলে, প্রিয়মত্ত বাদলের বায়ে !

—মনে আছে চপল বিদ্যুতে,
সহসা মিলিল আঁখি, তার মুগ্ধ নয়নের পথে ;—
বিবশা রহিল বসি'। বাতাস কহিয়া গেল কাণে—
গগনের রাণী ওরে ! জানে তোর মনো কথা জানে ;—
সবার তৃপ্তিতে জাগি' অই মহা তৃপ্তিহীন আঁখি,

তরুণ চিত্তের মাঝে, নিত্য এসে করে ডাকাডাকি—
অঙ্কলক্ষ্মী হইবারে। ডেকে বলে, বন্ধু হে আমার!
যখন জাগিল বুকে, জীবনের বসন্ত-সম্ভার,
আকুলি' চাপিতে প্রিয়, বক্ষপাশে আবেশ-বিভল
উছলি ছলকি' যেতে ঝরণার সম কল কল
জাগিল বাসনা মনে। মনে হ'ত ধরুক চাপিয়া,
এই দেহ লতা মোর, এই প্রাণ যেত শিহরিয়া!
বুক মম ফেটে গেছে মুখ কভু উঠে নাই ফুটে—
সে কথার তীব্রজ্বালা বক্ষমাঝে হেরি ফুলি' উঠে
সহসা নবীন প্রাতে। প্রথম প্রভাত আলো কাছে
চাহিয়া দেখিনু সব সুগোপন স্পষ্ট হ'য়ে আছে,
ঢাকিতে হইল মনে। লজ্জা এসে জুড়িল পরাণ,
প্রাণপণে ঢেকে রাখি তাই সেই সাধের প্রমাণ
সকলের দৃষ্টি হ'তে।
সে কথা জাগেনি শুধু বক্ষমাঝে চপল অস্থির—
জেগেছে নয়ন-কোণে, চকিতার চাহনী অধীর ;
তরুণ বুঝেছে শুধু। নিশিদিন কত ভেবে যাই
লাজের রসনা রুধি', অনিবার কাহারে জানাই ?
যত ভাবি তত বাড়ে চাহনীর অযুত ছলনা,
তত দেহ শিহরয়, তত ফোটে মানস-কামনা ;
আলোর পরশ লভি'।
* * * * *
সে কথা কি জানো বন্ধু! পায় নাই যাহারা কখন ; —
প্রিয়ের দেহের স্পর্শ, মনের অযুত আলাপন —
তাদের বেদনা-জ্বালা, পিয়াসায় থাকে ভরপূর ;
গোপনে মনের কোণে আঁকি' ছবি মানস বঁধুর!
মোদের মানস ঘেরি' জাগে শুধু জাগে হাহাকার
স্মৃতির দহন জ্বালা, অতৃপ্তির লালসা-সম্ভার!
তাই এত দৈন্য মোর, তাই এই অঝোর ক্রন্দন
বরষায় তাই জাগে, নিতি নিতি প্রিয়ের বন্দন ;—
চারিদিকে বিশ্বজুড়ে। বাদলের বায় কহে ডাকি'—
অই শোন, অই শোন, নীলাকাশ কহে থাকি' থাকি' ;
বসন্তের মধুহাসে, যৌবনের নব-পরিচয়ে—
কত কথা জেগে হারা, অনিবার তরুণী-হৃদয়ে!

জাতক যুগে আর্য্যাবর্ত্তের আর্থিক অবস্থা।

[শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী বি, এ]

কে জানে কোন্ একদিন তরুণ অরুণরাগের সুন্দর প্রভাতে মুনিঋষিগণ যজ্ঞহোমানলের নিকটে বসিয়া গান গাহিয়া ভারতের ইতিহাস ঘোষিত করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাস কোন নিপুণ ঐতিহাসিকের লেখনী নিঃসৃত হয় নাই। ভারতের ইতিহাস লিখিবার জন্য কোন Thucydides কিংবা Tacitus ছিল না। কাব্য এবং সাহিত্যই ভারত ইতিহাসের উৎস।

আর্থিক অবস্থার ইতিহাস লিখিতে হইলে প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় প্রাচীন ভারতেও ইতিহাস লিখিবার উপকরণাদির যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। এই বিষয়ে ইতিহাস লিখিবার source খুব কম। Sacred Books of the East নামীয় গ্রন্থাবলীতে আমরা প্রাচীন ভারতের আর্থিক অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। তারপর খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ, পঞ্চম কিংবা চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত বৌদ্ধধর্ম্ম-পুস্তকগুলি এই বিষয়ে অত্যন্ত উপকারী। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সময় প্রাচীন ভারতের আর্থিক অবস্থার ইতিহাস লিখার প্রধান উপকরণই হইতেছে এই বৌদ্ধধর্ম্ম-সাহিত্য-গ্রন্থাবলী। বৌদ্ধধর্ম্ম-সাহিত্য তিন ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে সুত্তপিটকের (Sutta pitaka) পঞ্চম নিকায়ের অন্তর্গত এক অংশের নাম জাতক। যে সময়ের কথা জাতকে বিবৃত আছে সেই সময়কেই জাতক যুগ (Age of the Jatakas) বলা হয়। এই যুগের আর্থিক অবস্থার ইতিহাস লেখা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

জাতক কি ? "বৌদ্ধদিগের মতে ভগবান গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত। তাঁহারা বলেন শুদ্ধ এক জন্মের কর্ম্মফলে কেহই গৌতম প্রভৃতির ন্যায় অপার বিভূতিসম্পন্ন সম্যক সম্বুদ্ধ হইতে পারেন না, তিনি বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুরবেশে কোটিকল্পকাল নানা যোনিতে জন্ম-জন্মান্তর পরিগ্রহ-পূর্ব্বক দানশীলাদি পারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করেন এবং পরিশেষে পূর্ণপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হন।" (১) এই গুলিকেই জাতক বলে। প্রত্যেক জাতকের তিনটি অংশ। প্রথম অংশের নাম প্রত্যুৎপন্নবস্তু অথবা বর্ত্তমান কথা। গৌতম বুদ্ধ কি উপলক্ষে বা কোন্ প্রসঙ্গে আখ্যায়িকাটী বলিয়াছিলেন তাহা বুঝাইয়া দেওয়া এই অংশের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অংশটি প্রকৃত জাতক, অর্থাৎ মূল আখ্যায়িকা; ইহার নাম অতীতবস্তু, কারণ ইহা গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত। পরিশেষে সমবধান অর্থাৎ অতীতবস্তু-বর্ণিত পাত্রদিগের সহিত বর্ত্তমানবস্তুবর্ণিত ব্যক্তিদিগের অভেদ প্রদর্শন। যদি জাতকের সংখ্যা গণনা না করিয়া আখ্যান উপাখ্যান প্রভৃতির সংখ্যা গণনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে জাতকার্থবর্ণনায় প্রত্যুৎপন্ন ও অতীতবস্তু সমূহে ন্যূনাধিক তিন সহস্র প্রধান কথা স্থান পাইয়াছে। এক মহাউন্মার্গ জাতকেই শতাধিক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যায় যে জাতকার্থবর্ণনা কি প্রকাণ্ড গ্রন্থ। পৃথিবীর নানা দেশীয় প্রচলিত কথা-কোষের মধ্যে ইহা যে কেবল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহা নহে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনও বটে।

(১) ঈশানচন্দ্র ঘোষ—"জাতক"

গল্প বলিলে আমাদের মধ্যযুগের উপকথা মনে হয়, কিন্তু জাতক গল্প পড়িলে প্রাচীন ভারতের আর্থিক অবস্থার একটা জ্বলন্ত ছবি পাই। জাতকের অনেক আখ্যায়িকায় বিশেষতঃ প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে পুরাকালের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারি। নানা প্রসঙ্গে সমসাময়িক বিধিব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ নীতির আভাস পাওয়া যায়। Dr. Fick(২) এর বিশিষ্ট প্রকরণ গ্রন্থে জাতক যুগে ভারতের সামাজিক অবস্থার একটা আভাস পাওয়া যায়। এই পুস্তকে তিনি জাতক যুগে ভারতের সামাজিক এবং প্রসঙ্গক্রমে আর্থিক অবস্থাও বিবৃত করিয়াছেন।

এই যুগে ভারতের জমীসংক্রান্ত আর্থিক অবস্থা সাধারণতঃ গ্রাম্য পঞ্চায়তীস্বত্ব প্রথাতেই (Proprietorship of the village community) ছিল, অথবা ইউরোপে যাহা প্রজাস্বত্ব (Peasant proprietorship) নামে অভিহিত আছে। যদিও মধ্যযুগে ইউরোপের Feudalism এর ন্যায় আমরা প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী, স্বাধীনতা-সম্পন্ন জমিদার বা Feudal lord ছিল বলিয়া জ্ঞাত নহি, তথাপি মাঝে মাঝে দেখিতে পাই রাজারা প্রিয় অনুচরদের নিষ্কর ভূমি দান করিতেন। নৃপতিগণ সাধারণতঃ প্রজাদের ভোগদখল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না কিন্তু আশ্রয়ের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক গ্রামে প্রজাদের উৎপন্ন ফলশস্যাদির উপরে একটা কর ধার্য্য করিতেন। সেই কর উৎপন্ন দ্রব্যের দশমাংশ হইতে ষষ্ঠমাংশ পর্য্যন্ত ছিল। কোন কোন জায়গায় আমরা দেখিতে পাই যে রাজা ইচ্ছা করিলে ঐ কর রহিত করিতে পারিতেন। কিন্তু জাতক যুগে জমীসংক্রান্ত আর্থিক অবস্থার বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে জমীর উপর রাজার কোন অধিকার ছিল না। গ্রাম্য জমীর মালিক ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়ত। গ্রামবাসী সকলে একত্রিত হইয়া জমীর ভোগ দখল করিত।

নরমণ্ডলীর বাস বসতি স্থানে স্থানে দলবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। প্রত্যেক বসতির চারিদিকে অবারিত মাঠ, মাঠের চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকিত, যেন কোন জন্তু আসিয়া ফল শস্যাদির অনিষ্ট করিতে না পারে। গো মহিষাদির জন্য সাধারণ পশুচারণের স্থান থাকিত। গ্রামবাসীদের মধ্যে একত্রিত হইয়া কাজকর্ম্মাদি করিবার ভাব (idea of co-operation) প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল। একটি জাতকে আমরা দেখিতে পাই যে মগধদেশে কোন একটি গ্রামের ত্রিশজন অধিবাসী একত্রিত হইয়া তাহাদের রাস্তাঘাট, জলাশয়, পুস্করিণী এবং বাসবসতি সমূহ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছে (৩) এবং যেখানে নূতন কিছু সংস্কার করা দরকার তাহা করিতেছে। আমরা আরও দেখিতে পাই যে গ্রামবাসীগণ একত্রিত হইয়া দুর্ভিক্ষের জন্য কিংবা অন্য কোন আশু বিপদ আশঙ্কায় কিছু কিছু ধান গোলায় জমা করিয়া রাখিতেছে। বাস্তবিক এই সব দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হই, যে কবে কত প্রাচীন জাতকযুগে গ্রামে এমন চমৎকার ভাব এবং আদর্শ ছিল। আর আজ গ্রামবাসীগণ সেই আদর্শ ভুলিয়া সেই

(২) Social organisation in North East India in Buddha's time.

(৩) Economic Journal, 1901.

লুপ্তস্মৃতির শ্মশানে বসিয়া হাহাকার করিতেছে। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে স্নেহ দয়া মমতা নাই বলিলেই চলে, এখন আছে শুধু ঈর্ষা, দ্বেষ, আর হিংসার জ্বলন্ত চিত্র।

তারপর কৃষিকর্ম্ম বিষয়ে দেখিতে পাই যে ধানই খাদ্যের প্রধান উপাদান ছিল। নানাপ্রকার ধানের নাম উল্লিখিত আছে, তা'ছাড়া ফলফুল ও নানাপ্রকার তরকারীর চাষও করা হইত। আমাদের একটা ধারণা আছে যে কৃষিকর্ম্ম সর্ব্বদাই নিম্নশ্রেণীর লোকের দ্বারা করা হইত, কিন্তু অন্ততপক্ষে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ, ৫ম কিংবা ৪র্থ শতাব্দীতে অর্থাৎ জাতকযুগে এই রকম কোন নিয়ম বা প্রথা ছিল না। কোন জাতকেই আমরা দেখিতে পাই না যে কৃষিকর্ম্ম করিলে সামাজিক মর্য্যাদার কোন হানি হইত। জাতকে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্ম করিতেছে অথবা কোন রাজপুত্র কৃষিব্যবসা বা অন্য কোন কৃষিকর্ম্ম করিতেছে অথচ সামাজিক মর্য্যাদার কোন হানি হইতেছে না, ইহাতে বুঝা যায় যে কৃষিকর্ম্ম নিন্দাজনক ছিল না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য সকলেই কৃষিকর্ম্ম করিত। পরিশ্রমের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাহাতে বুঝা যায় যে জাতকযুগে Dignity of labour ছিল।

কৃষিকর্ম্ম ব্যতিরেকেও শ্রমসাপেক্ষ ব্যবসা (Industry) নানাপ্রকার ছিল এবং তাহাতে অনেক লোক নিযুক্ত থাকিত। আমরা আরও দেখিতে পাই যে এই প্রকার বিভিন্ন ব্যবসা বিভিন্ন স্থানে স্থানীকৃত করা হইত (localisation of industry)। কোন কোন জায়গায় এও দেখা যায় যে একেবারে গ্রামবাসী সকলে এক ব্যবসাই অনুসরণ করিত, এবং ঐ গ্রামকে ঐ ব্যবসায়ের নামানুযায়ী ডাকা হইত। আমরা প্রায়ই এ প্রকার গ্রামের নামের উল্লেখ পাই। যথা:—সূত্রধর গ্রাম, কামার গ্রাম, ব্রাহ্মণ গ্রাম। শুধু গ্রাম নয় সহরেও কোন কোন ব্যবসা কোন কোন স্থানে স্থানীকৃত করা হইত—যথা শ্রাবস্তীতে (৪) ধোপাপট্টী। আজকালও এই localisation of industryর চিহ্ন দেখা যায়, যথা ঢাকাতে শাখারী পট্টী, কুমিল্লাতে কাঁসারী পট্টী।

এখন দেখা যায় যে এইপ্রকার কাজকর্ম্মে সম্মিলনভাব (corporate spirit) যথেষ্ট প্রকারে বিস্তৃত ছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে নিপুণ হইবার বা উৎকর্ষতা লাভ করিবার প্রচেষ্টা এবং প্রবৃত্তি (specialisation of industry) জনসাধারণের মধ্যে খুব প্রবল ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নানাপ্রকার ব্যবসা ছিল, মিলিন্দপন্নতে বিভিন্নপ্রকার ব্যবসায়ের নাম দেওয়া আছে। তাহাতে দেখা যায় যে শুধু এক ধনুক নির্ম্মাণ ব্যবসাই তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। যদি ধনুক নির্ম্মাণেই তিন প্রকার বিভাগ থাকে তাহা হইলে বেশ বুঝা যায় যে ব্যবসাদি কি বৃহৎ আকারে চালান হইত। আর একটি কথা যে তখনকার দিনে সাধারণতঃ পুত্র পিতার ব্যবসাই অনুসরণ করিত; মাঝে মাঝে ইহাও দেখা গিয়াছে যে সমস্ত পরিবারশুদ্ধ সকলে পূর্ব্বপুরুষের ব্যবসা অনুসরণ করিত। মোট কথা ব্যবসাদির উৎকর্ষতার জন্য সকলে সম্মিলিত হইয়া পরিশ্রমের সহিত নিজ নিজ ব্যবসা চালাইত।

(৪) Capital of Kosala which corresponds to modern Oudh.

অনেক ইয়ুরোপীয় লেখক বলেন যে জাতকযুগে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য কিছু উন্নতি লাভ করে নাই, কারণ জাতিভেদ থাকিলে ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে। যদিও পুত্র সাধারণতঃ পিতার ব্যবসাই অনুসরণ করিত এবং localisation of industryও ছিল, তথাপি এমন কোন প্রথা বা নিয়ম ছিল না যে ব্রাহ্মণ এই কাজ করিতে পারিবে না, ক্ষত্রিয় ঐ কাজ করিতে পারিবে না। জাতকযুগে mobilisation of industry যথেষ্টভাবে প্রচলিত ছিল। জাতক গল্পে আমরা দেখিতে পাই যে ব্রাহ্মণ কৃষিকর্ম্ম করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যবসাও চালাইতেছে। (৫) একটি গল্প আছে যে কোন এক গ্রামে একদল তন্তুবায় তাহাদের নিজেদের ব্যবসা ছাড়িয়া একটি নৌকা করিয়া বাণিজ্যার্থে দ্বীপান্তর চলিয়া গেল। সে যাহা হউক এইপ্রকারে আমরা জানিতে পারি যে Industrial world জাতিভেদ দ্বারা কোন রকমে গঠিত হয় নাই, কিংবা সাধারণতঃ পুত্র পিতার ব্যবসা অনুসরণ করিত বলিয়াই যে mobilisation of industry ছিল না তাহা ভুল। উপরোক্ত গল্প হইতে বেশ বুঝা যায় যে "There was perfect mobilisation of trade or industry." সকলেই নিজের ইচ্ছা মত ব্যবসাদি অনুসরণ করিত, তাহাতে কোন বাধা বিঘ্ন ছিল না বা কোন প্রকার সামাজিক মর্য্যাদার হানি হইত না। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, আজকাল প্রায় ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণই বলেন যে জাতকযুগে জাতিভেদ তেমন স্পষ্ট ছিল না। Social organization পুস্তকে Dr. Fick এই মত প্রকাশ করেন। আর জাতক গল্প পড়িলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্রাহ্মণ চণ্ডালের সহিত আহার করিতেছে, ব্রাহ্মণ চণ্ডালের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিতেছে, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেছে ইত্যাদি। জাতক যুগে জাতিভেদ সম্বন্ধে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে Mrs. Rhys Davids বলেন "In modern India no doubt, lines of demarcation have intensified in the course of centuries and have split up the industrial world, which involves the econmic drawbacks which some writers say as characteristics of Ancient India. But in that ancient India we can say with assurance that the caste system in any proper and exact use of the term, did not exist. What we actually find is caste in making" (৬).

Dr. Mazumder দেখাইয়াছেন (৭) যে মধ্যযুগে ইউরোপের ন্যায় ভারতে এই সময়ে শিল্পিগণ এবং অন্যান্য বণিক সম্প্রদায় ব্যবসা বাণিজ্যাদির উন্নতিকল্পে বিবিধ প্রকার শ্রেণীতে (guilds) শ্রেণীবদ্ধ ছিল। মঘপক জাতকে আমরা এই প্রকার ১৮টি নাম পাই। আরও থাকিতে পারে কিন্তু তাহা আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে এই প্রকার শ্রেণী বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল এবং সম্মিলিত ভাবে শ্রেণী স্থাপন করিবার খুব

(৫) Cambridge History of India VOL—I.
Economic Conditon of India at the rise of Buddhism.

(৬) Economic Journal 1901.

(৭) Corporate Life in Ancient India.

একটা উৎসাহ ছিল। প্রত্যেকটি শ্রেণীর প্রধান কর্ম্মচারী থাকিত একজন সভাপতি (Pamakha) এবং তাহার অধীনে আর একজন কর্ম্মচারী সর্দ্দার (Aldernman or jethaka) বলিয়া অভিহিত হইত। এই কর্ম্মচারীদের শ্রেণীর উপরে কিপ্রকার আধিপত্য ছিল বা তাহারা কিভাবে শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিত, তাহা কোনখানেই ভালভাবে পাওয়া যায় না। একশ্রেণীর সহিত অন্য একশ্রেণীর বিবাদ বিসংবাদ মামলা মহাশেট্টীর (Lord High Treasurer) বিচারাধীনে ছিল। মহাশেট্টী মাঝে মাঝে অন্যান্য শ্রেণীর মহাসভাপতির কাজ করিতেন। ক্রমে ক্রমে এই শ্রেণীসমূহ উন্নতিশালী হইয়া উঠে এবং পরে শাসন ও বিচার কার্য্য সম্বন্ধীয় (Executive and judicial) ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এই শ্রেণী হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে জাতক যুগে সম্মিলিত হইয়া কাজ কর্ম্মাদি করিবার খুব একটা প্রচেষ্টা ছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যাদির উন্নতিকল্পে শ্রেণী স্থাপন করা হইত।

তারপর ভারতের বাণিজ্যেও (Trade and Commerce) জাতক যুগে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। Samaddar বলেন "If trade and Commerce are indications of the growth of culture in any age we must admit that the ancient Indians in the age of jataka had attained a high state of culture and the very first Jataka, Apannaka jataka, gives us an idea about it. (৮) এই সময়ে দেশমধ্যস্থ (inland) কিংবা সমুদ্রপথে আনীত (seabourne) এই দুইপ্রকার বাণিজ্যই খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। বণিকগণ তাহাদের বাণিজ্যে জিনিষপত্র লইয়া জলপথ কিংবা স্থলপথ দিয়া, বাণিজ্যার্থে একদেশ হইতে অন্যদেশে যাইতেন। ভারতবর্ষের এই একটা সুবিধা যে নদনদীর অভাব নাই। কাজেই তখনকার দিনে স্থলপথ খুব দুর্গম হইলে বণিক্গণ জলপথে তাহাদের পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় নিত। বারাণসী বোধ হয় সবচেয়ে প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। জাতকে আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে বারাণসী হইতে বণিক্গণ রেশম, তুলা, পশম ইত্যাদি গাড়ী বোঝাই করিয়া নিয়া যাইতেছে এবং বিদেশে চালান দিবার জন্য সমুদ্র তীরে কোন এক বন্দরে আনিতেছে। বারাণসী ছিল তখনকার দিনের ভারতের বেবিলোন। কত দেশের কত লোক সেখানে আসিত ক্রয়বিক্রয়ের জন্য, জাতক পড়িলে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন বহুলোকারণ্য বারাণসী নগরীর একটা ছবি পাওয়া যায়। দেশমধ্যস্থ (Inland) বাণিজ্যের জন্য কতকগুলি প্রধান প্রধান রাস্তা ছিল, জাতকে তাহার উল্লেখ পাই। সাধারণতঃ বণিক্গণকে শ্রাবস্তী হইতে বেনারস, বেনারস হইতে রাজগৃহ(৯), শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহ, বিদেহ (১০) হইতে গান্ধার(১১)যাইতেছে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব হইতে বুঝা যায় যে দেশমধ্যস্থ বাণিজ্যের প্রধান রাস্তা এবং বাণিজ্য কেন্দ্র

(৮) Economic condition of Ancient India.

(৯) Capital of Magadha (modern Patna Gaya Dt).

(১০) Capital of Vajjian (modern Muzuffarpur Dt).

(১১) A Province which corresponds to modern North Western side of Kashmere.

এই কয়েকটা ছিল। সমুদ্রপথে আনীত বাণিজ্যের জন্যও সমুদ্র তীরে বন্দর ছিল। জাতক যুগে মধ্য এশিয়ার সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল; এবং রাস্তা ছিল Taxila কিংবা Sogala (Punjab) এর মধ্যে দিয়া। Apannaka jatakaএ দেখিতে পাওয়া যায় যে বাণিজ্যাদি বিষয়ে বেশ প্রতিযোগিতাও ছিল। কে জিনিষপত্র বেশী মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে এবং লাভবান হইবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা ছিল (competition in trade) অপন্নক জাতকের গল্পটি এই (১২)—পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে একরাজা ছিলেন, তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, বড় হইয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পাঁচশ গরুর গাড়ী ছিল তিনি ঐ সকল গাড়ীতে মাল বোঝাই করিয়া কখনও পূর্ব্বদেশে কখনও পশ্চিম দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। একদিন এক জায়গায় বাণিজ্য করিতে যাইবেন মনস্থ করিয়াছেন, এমন সময় শুনিলেন যে অন্য এক বণিকও ঐ জায়গায় বাণিজ্য করিতে যাইবে মনস্থ করিয়াছেন। তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন আগে যাওয়া ভাল না পশ্চাৎ যাওয়া ভাল। অনেক চিন্তার পর তিনি ঠিক করিলেন যে পশ্চাৎ যাওয়াই তাহার বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক...” ইত্যাদি। এই গল্প হইতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে বাণিজ্য বিষয়ে, বেশ প্রতিযোগিতা ছিল। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই; Samaddor বলেন যে জাতকে ইহা দেখা যায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও (International trade) সেই সময়ে ভারতে ছিল। এই প্রকারে আমরা এখন দেখিতে পাই যে জাতক যুগে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যাদি খুব উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং ভারত তখন বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

Dr. Fick বলেন যে তখন সমুদ্রে নৌচালন বিজ্ঞান (navigation) অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু আজকাল ঐতিহাসিকগণ ঐ মতের পক্ষপাতী নহেন। Dr. Radha Kumud Mukherjee দেখাইয়াছেন (১৩) যে অতি প্রাচীনকাল হইতে সমুদ্রপথে ভারতের সহিত অন্যান্য দেশের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল। বণিকেরা পোতারোহণে দ্বীপান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। সমুদ্রভঞ্জজাতক, ভালহস্য-জাতক, সুপরক জাতক, পড়িলে বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে জাতক যুগে ভারতবর্ষের বহিঃবাণিজ্য (External trade) যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বাস্তবিক ভারতবর্ষের সমুদ্রপথে আনীত বাণিজ্যাদি যে শুধু জাতক যুগে ছিল তা নয়, অতি প্রাচীনকাল হইতে ঋক্‌বেদের সময় হইতে এই প্রকার বাণিজ্য সম্বন্ধ দেখা যায় এবং এই মত Dr. Sayee, Professor Rawlinson এবং Dr. Mukherjee সকলেই সমর্থন করেন। খৃঃপূঃ ৬ষ্ঠ, ৫ম কিংবা ৪র্থ শতাব্দীতে অর্থাৎ জাতকযুগে ভারতবাসীগণ চতুর্দ্দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রপথে বাণিজ্য সম্বন্ধাদি চালাইয়াছিল। বভেরু জাতকে আমরা দেখিতে পাই যে কয়েকজন ভারতীয় বণিক সমুদ্রপথে জাহাজে করিয়া বেবিলোনে (Babylon) ময়ূর নিতেছে। Professor Buhler বলেন যে জাতকে এমন অনেক গল্প পাওয়া যায়

(১২) ঈশানচন্দ্র ঘোষ “জাতক”।
(১৩) A History of Indian shipping and maritime activities.

যাহা সমুদ্রযাত্রা এবং সমুদ্রপথে জাহাজডুবি হইয়া প্রাণ বিয়োগ ইত্যাদি বিষয় নিয়া লিখিত। তা ছাড়া ভারতের সমুদ্রতীরের কয়েকটি বন্দরের নামও উল্লিখিত আছে। যথা সুপরক (১৪) এবং বরিকচ্ছ (১৫) আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমুদ্রযাত্রা করিবার সময় দিক্‌নির্ণয় করিবার জন্য নাবিকেরা কতকগুলি পাখী আকাশে ছাড়িয়া দিত এবং পাখীগুলি যেই দিকে যায় সেইদিকে জাহাজ চালাইত। সুপরক এবং বরিকচ্ছ হইতে বাণিজ্য জাহাজ বেবিলোনে যাইত এবং বেবিলোন হইতেও অনেক জাহাজ এই বন্দরে নঙ্গর করিত এবং বণিকেরা ভারতে ব্যবসা করিত। কিন্তু বাণিজ্যাদি যে কেবল আরব সাগরেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নয়—বঙ্গোপসাগরেও সামুদ্রিক বাণিজ্যাদি খুব চলিত। সুবর্ণ ভূমির (১৬) সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যাদি সম্বন্ধ ছিল এমন কি চীন দেশেও বণিকগণ বাণিজ্য করিতে যাইত। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ আজকাল ইহাও প্রমাণ করিতেছেন যে Java, Sumtra এবং Siam প্রভৃতি জায়গায় ও হিন্দুগণ উপনিবেশ (Colonisation) স্থাপন করিয়াছিল। এই সব হইতে আমরা জানিতে পারি যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য ব্যবসাদিতে ভারতবাসিগণ বিশেষ দক্ষ ছিল এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিদের সহিত ভারতের বাণিজ্যসম্বন্ধ ছিল।

তখনকার দিনে দেনাপাওনা মিটাইবার উপায় ছিল একপ্রকার তাম্রমুদ্রা। সেই তাম্রমুদ্রার নাম ছিল কহপণ (Kahapan) এবং ১৪১ গ্রেন ছিল তাহার ওজন। এই ওজন প্রতিশ্রুত থাকিত এবং ওজনে অল্প কম থাকিলে যে কোন ব্যক্তি তার যন্ত্রদ্বারা (Punch mark) ইহা দেখিতে পারিত এই যন্ত্র বিশেষ কি কোন বণিক সম্প্রদায়ের কিংবা কোন শ্রেণীর নিদর্শন ছিল তা বলা যায় না। এই মুদ্রা ব্যতিরেকেও অনেক সময় দেনা পাওনা, খত (Instrument of credit) দ্বারা মিটান হইত। আজকাল যেমন cheque কিংবা I. O. U. লিখিয়া দেয় তখনকার দিনেও ধনী বণিকেরা এই প্রকার খত লিখিয়া কারবার করিত। এই সব হইতে বুঝা যায় ব্যবসা বাণিজ্য তখন কত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ব্যবসার উন্নতি না করিলে দেশে টাকার চলন হয় না এবং টাকার আদান প্রদান খুব বেশী না হইলে কোন দেশে এবম্বিধ Instrument of creditএর দরকার হয় না। সে যাহা হউক এইভাবেই তখনকার দিনে দেনা পাওনার আদান প্রদান হইত।

জাতক যুগে Banking ছিল কিনা এই সম্বন্ধে Mrs. Rhys Davids বলেন "There does not seem to have any anticipation of modern Banking" কিন্তু Dr. Mazumdar এই মত স্বীকার করেন না। Nasika Inscriptionএ যে সমস্ত শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে ঐ সব শ্রেণীতে জনমণ্ডলী টাকা পয়সা জমা রাখিত এবং নিয়মিতরূপে সুদ ও পাইত। শতকরা ৯ টাকা হইতে ১২ টাকা পর্য্যন্ত সুদ দেওয়া হইত। কিন্তু Nasika inscriptionএর সময়কে জাতক

(১৪) Modern Supara in Thana Dt of Bombay.

(১৫) Modern Broach near gulf of Cambay.

(১৬) Modern Burma.

যুগের অন্তর্গত বলা চলে না। ইহা জাতকযুগের আরও পরে, কিন্তু Nasik inscription এর সময়ে যদি এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীনভাবে Banking system চলিতে পারে, তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে জাতক যুগে, এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে না থাকিলেও অন্য কোন আকারে Banking system ছিল। অন্য একটি জাতক হইতে আমরা জানিতে পারি যে ব্যবসায়িক সম্প্রদায় সমূহ মাঝে মাঝে সম্মিলিত মূলধনভাবেও, (on joint stock principle) গঠিত ছিল। একটি গল্প আছে তাহাতে আমরা দেখি যে একটি যুবক কোন ব্যবসা আরম্ভ করে এবং কয়েকজন বণিক তাহাকে এক হাজার মুদ্রা দিয়া ঐ ব্যবসায়ের একটি অংশ কিনে। এই গল্প হইতে বুঝা যায় যে সম্মিলিত মূলধন দ্বারাও ব্যবসাদি করা হইত। ভূমিকর্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া নানা শিল্পকার্য্যাদি এবং ব্যবসা বাণিজ্যাদি এইরূপ সমবায়ে করা হইত। বর্ত্তমান যুগে এই সমবায় ভাবের অভাব কিন্তু জাতক যুগে যে ভারতে এই ভাবটা বেশ প্রবল ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই যুগে ভারতের ধন দৌলত ঐশ্বর্য্য যা ছিল তা ভারতে আর কোন যুগে হয় নাই। সমস্ত ভারতের লুণ্ঠিত স্বর্ণমুদ্রা যখন সুলতান মামুদের রাজধানী গজনীতে নেওয়া হইল, তখন নাকি বৈদেশিকেরা বলিয়াছিল যে পৃথিবীতে এত মুদ্রা কোথাও নাই। তাই যদি হয় তা হলে জাতক যুগের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাহারা না জানি কি বলিত। সোণার ভারত সোণায় মণ্ডিত ছিল। প্রত্যেক নগরে গ্রামে ধন ঐশ্বর্য্যাদির বাহুল্য ছিল। দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ কাকে বলে ভারতবাসী জানিত না। তখনকার দিনের ধন ঐশ্বর্য্যাদির কথা শুনিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। প্রায় বণিকেরই ৮০ কোটী টাকার কম ছিল না। অনাথপিণ্ডদের ধন দৌলতের কথা এখন আমাদের দেশে উপকথার মত মনে হয়। সে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য কত কত কোটী টাকা খরচ করিয়াছে এবং বুদ্ধের আশ্রমের জন্য জেতবনে একটা জায়গা স্বর্ণ দিয়া মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল। সে কত বণিককে এবং কত দুঃখীজনকে কত টাকা বিনা সুদে দিয়াছে, এমন কি অনেক সময় ফিরিয়াও চায় নাই। এক ব্রাহ্মণ নাকি তার স্ত্রীকে ৮০ কোটী টাকা নগদ দিয়াছিল। ভগবান বুদ্ধকে কেহ একজোড়া চর্ম্মপাদুকা উপহার দিয়াছিল, তাহার মূল্য সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা, রাজার হাতীর অলঙ্কারের মূল্য ছিল প্রায় ২০ লক্ষ মুদ্রা। এইত ছিল তখনকার আর্থিক অবস্থা—কি ঐশ্বর্য্য আর কি ধন দৌলত। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ তাহাদের হাহাকারের চিত্রপট তুলিয়া ধরে নাই। সকলেই সুখে শান্তিতে থাকিত।

হায় কোথায় গেল ভারতের সেই দিন! কোথায় গেল ভারতের ধনদৌলত, সেই সুখ শান্তি আর নাই। এখন আছে শুধু হাহাকার, দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ,—সব মরক একসঙ্গে সোণার ভারতের বক্ষের উপর তাহাদের রক্ত নিশান উড়াইয়া দিয়াছে—আর সেই লুপ্ত সভ্যতার শ্মশানে ভারতবাসী একমুষ্টি অন্নের জন্য আজ পরের দুয়ারে ভিখারী।

সাহিত্যের কথা

[শ্রীঅমূল্য চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ]

কাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদি আকারে যে সাহিত্যের বিকাশ তাহার প্রধান উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি এই কথাটাই আমি এইখানে বিশেষ করিয়া বলিব। এমন কথা হইতেছে না যে, এই বিশেষ শব্দ কেবল একই জায়গায় একই দিকে তাহার কাঁটা স্থির করিয়া ধরিয়া রাখে। শব্দটি যে আপেক্ষিক এ সম্বন্ধে আমার নিজের কোনও সংশয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ধারায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভেদে এই রস-ধারা প্রবাহিত হইবে ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মিষ্টদ্রব্য বিশেষের প্রতি আমার নিজের লোভ না থাকিতে পারে, এবং যদিও আমি দেখিতে পাই যে, অনেকেরই সেই দিকে দৃষ্টিপাত করায় মুখের স্বাভাবিক আকৃতি বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, তথাপি আমি বলিব সেই বস্তুবিশেষে রসাভাব—ইহাতে আমার চরিত্রেরই যে একদিক বেশ পরিষ্কার হইয়া অঙ্কিত হইয়া গেল, তাহা আমার অগোচরে কাহারও বুঝিবার বাকী রহিল না। এই কারণেই সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে এই রস মাপিবার যন্ত্রটী লইয়া অল্প বিস্তর গোলমাল চলিয়াছে। যুগযুগান্ত ভরিয়া আলোচনার ফলেও সেই মাপকাঠি নিরূপণ হইল না সত্য; কিন্তু তাহাতে হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। কেননা, ঘরে ঘরে যেদিন দর্জ্জিদের নিত্য ব্যবহার্য্য মাপ কাঠিটির মত এই কাঠিটি আমাদের মিলিয়া যাইবে, সেই দিন রসবোধের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও আদ্যশ্রাদ্ধ—এই মত অনুমান করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, এই রসরূপ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া বিশেষ ফল লাভের আশা করা যায় না, কারণ ইহা কেবল রসিকেরই প্রাণের ভিতর অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত আবেগ-উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া চলে; বাইরে যারা থাকে তারা ইহার কোনই রূপ বা গতিবিধি দেখিতে পায় না। কম কথায়, রস উপলব্ধি করিবার জিনিষ, বুঝাইয়া দেওয়ার মত নহে। যাহার ভিতরে এই রস-গতির একটু ছন্দ, ঝঙ্কার আছে, সে-ই সৃষ্ট পদার্থ হইতে অনেকখানি রস টানিয়া লইতে সমর্থ হয়। এই কারণেই কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে লেখক তাঁহার হৃদয়ের রস-সাগরের সামান্য একটু কাঠামো তৈয়ারী করিয়া আমাদের হাতে ফেলিয়া দেন। সেই সাগর মন্থন করিবার ভার আমাদের উপর। এই মন্থনবৈচিত্র্য হইতেই আমাদেরও স্ব স্ব চরিত্র ফুটিয়া উঠে। সত্যই, যিনি রসিক, রস গ্রহণে যাঁহার যোগ্যতা আছে তিনি এই রস একেবারে সবটুকুই গ্রহণ করিতে চান। তাঁর ইচ্ছা, হয় সেই রসের পূর্ণতাকে আয়ত্ত করা, নয় সেই পূর্ণতাকে একেবারে হারাইয়া ফেলা। খণ্ড খণ্ড করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া সৌন্দর্য্য উপভোগ করা প্রেমিকের ধর্ম্ম নয়। আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী সবটুকুকেই মুঠোর ভিতর সে পাইতে চায়। যাঁহারা সাহিত্যের রস একটু একটু করিয়া পরীক্ষা করিয়া, চাখিয়া, যাচাই করিয়া উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহাদের ভিতরে রসের ঢেউ নাই এই কথাটা আমি বলিয়া

ফেলিতে চাই। এমন করিয়াই রস উপলব্ধি করা যাঁহারা বিশেষ সঙ্গত এবং নিয়মানুমোদিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সাহিত্যের দিকে রস পাইবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া, বিজ্ঞানের পুঁথিপত্র ভাল করিয়া আলোচনা করিলে বিশেষভাবে আনন্দলাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার ধারণা। সমালোচনা অথবা দরযাচাই করা যে, রসজ্ঞানের পক্ষে মোটেই অনুকূল পন্থা নহে তাহা অনেকেই সমর্থন করিয়া থাকেন। কাটিয়া কুটিয়া হাড়মাস বাহির করা চিকিৎসা শাস্ত্রেরই প্রকৃষ্ট উপায়, সাহিত্যের নহে। বিশ্লেষণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন 'লবণের' গুণাগুণ নির্ণয় করা রসায়ণ শাস্ত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। টীকা টিপ্পনী দ্বারা কলাপ, মুগ্ধবোধ, বেদ উপনিষদের ব্যাখ্যা চলিতে পারে, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের যথার্থ ব্যাখ্যা চলে না। "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" রামগিরি পদপ্রান্তে বিরহীর বক্ষ কি অব্যক্ত যাতনায় ছটফট্ করিতেছিল তাহা টীকা টিপ্পনীদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। কী মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অভাগিনী সীতা বলিয়া উঠিয়াছিলেন,

"বাঙ্মণঃ কর্ম্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি! মামন্তর্ধাতুমর্হসি॥"

ইহা কবিই সবটুকু যেমন করিয়া ব্যক্ত করিবার করিতে পারেন, আর কেহ পারেন না।

সাধারণ ক্ষেত্রে একটা ধারণা অনেককাল হইতেই আছে যে, উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য সমাজ, ধর্ম্ম অথবা কোনও প্রতিষ্ঠানের সংস্কার। চরিত্রসৃষ্টি করিয়া সমস্যার মীমাংসা করাই উপন্যাসের প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মতদ্বৈধ আছে। রস এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকে সংস্কার ছাপাইয়া উঠিবে এমন কথা আমি ভ্রান্ত বলিয়াই মনে করি। বড়দরের বাস্তবকবি হইলেও এ ধারণা তাঁহার ভিতর থাকেনা যে, বাস্তবতা আদর্শকে ছাপাইয়া উঠিবে। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি কবি বা ঔপন্যাসিক নহেন; সাহিত্যের মৃদু কনকাঙ্গুলির চাপে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে না। ইংরেজীতে যাহা "আইডিয়াল" তাহাকেই আমি এখানে আদর্শ বলিয়াছি। আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া বস্তুসৃষ্টিই যদি সাহিত্যের চরম লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে এমন অনেক পুস্তকই পাওয়া যাইত যাহা বাল্মিকী কালিদাসের সৃষ্টি হইতে বড় সৃষ্টি হইয়া পড়িত। তাহা হইলে বঙ্কিম-সাহিত্য অথবা রবি-কাব্য ছাড়িয়া সাহিত্যিকগণ ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের পুঁথিপত্র লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাইতেন। যদি তাহাই হইত তবে সকলই এমন বিশেষ বিশেষ বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতে লাগিয়া যাইতেন যাহাতে অন্নসমস্যার সুমীমাংসা হইত। একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। কোনও অভিভাষণে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, জনৈক ভদ্রলোক তাঁহাকে একবার বলিয়াছিলেন "মহাশয়, আমি এমন সব বাস্তবজীবনের ঘটনা জানি যে তাহা শুনিলে আপনার এক একটা উপন্যাস হইয়া যাইবে।" শরৎবাবু অল্প কথায় উত্তর দিলেন "তাহা হইলে মহাশয়ই অনুগ্রহ করিয়া দুই একখানা লিখুন না?" বাস্তব এবং আদর্শরচনা—যাহা লইয়া আজকাল এত মাথা মারামারি হইতেছে, এদের ভিতর যে সত্যিসত্যিই কোনও বিরোধ নাই, উপরের কথায় এই বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমার এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কেহ যেন মনে না করেন আমি আকাশ-কুসুম-

আদর্শ রচনার কথা বলিতেছি। যদি অলীক স্বপ্ন রচনাই সাহিত্যের কাজ হইত তাহা হইলে ইহাকে সাহিত্য-রচনা না বলিয়া পাগলামি বলা যাইত। ইহা নিশ্চিত যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে আদর্শ ও বস্তু উভয়েরই স্ব স্ব স্থান আছে। নিজ নিজ কক্ষে নিজেরা আবর্ত্তন করিবে ইহাই রীতি। কিন্তু একটী নিজের আবর্ত্তন পরিধি ছাড়িয়া অপরের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বেড়াইবে, ইহাতেই আপত্তির কথা উঠে।

পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে নিজ নিজ উপযোগী বস্তু সংগ্রহ করিয়া সাহিত্যের সৃষ্টি, তখন নিজের পথে চলিতে থাকিবে ইহাই হইল আসল কথা। খড়ের গাদা মনুষ্যদৃষ্টি আকর্ষণ করেনা, কেননা ইহাতে রূপ নাই, সৌন্দর্য্য নাই, রসানুভূতির আবেগ-স্পন্দন নাই—যাহা মানুষের রস এবং সৌন্দর্য্য-বোধকে আকর্ষণ করিতে পারে। খড়ের-গাদাই যে এই সৌন্দর্য্যের আসল ভিত্তি সে বিষয়ে কেহ অমত করিবে না। কিন্তু লোক কাঠামোর উপর রংফলান দেখিয়া এবং তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব দেখিয়াই প্রীতিলাভ করে, কেহ ভিতরের খড়ের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করে না। দেখিয়া আসিয়া মানুষ বলে মূর্ত্তি দেখিয়া আসিলাম; কেহ বলেনা কাঠামো দেখিয়া আসিয়াছি। এমন করিয়াই রসজ্ঞের দৃষ্টি কেবল বাস্তব সৃষ্টি অতিক্রম করিয়া পূর্ণ সৃষ্টিখানির উপর ছড়াইয়া পড়ে। সেই সৃষ্টি তার অন্তরের রসধারায় সিঞ্চিত হইয়া সৌন্দর্য্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে। প্রেয়কে শ্রেয় করিয়া তুলে। এই চিত্র-অঙ্কনের এক এক জনের এক এক ধারা আছে। বিশিষ্ট ছাপযুক্ত তুলিকা ছাড়াও ইহা চলিতে পারে। চিত্র-বিদ্যার গণ্ডী লঙ্ঘন করিয়াও এই সৃষ্টি তার মনের কথাটুকু সমস্তই খুলিয়া চিত্রিত করিতে পারে ইহাতে তাহার কোথাও আট্‌কায় না। সেই জন্যই শ্রান্ত ক্লান্ত সংসারের পথিক যখন করুণ সুরে বলিয়া উঠিয়াছেন,

"মন-মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতাম পারলাম না।"

তখন তাঁর জীবনের সমস্ত নৈরাশ্য এবং অবসাদই ভাষা পাইয়াছে; কিছুই অপ্রকাশিত থাকিলনা। মার্জ্জিত ভাষায় উচ্চারণ না করিলেও কাহারও এই কথা বলিবার রহিল না যে, কবি বলি বলি করিয়া কিছু যেন বলিতে পারেন নাই। দরদী বুঝিল এই একটুকুতেই তার জীবনব্যাপী দুঃখ, নৈরাশ্য, হাহাকার জল হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে! অথচ এই কথাই অন্যরূপেও বলা যাইত, যাহাতে ব্যাকরণ অথবা ভাষাগত দোষ কিছু থাকিত না। ঘুরাইয়া ফিরাইয়া "বাজে কথায় সময় নষ্ট" না করিয়া চট্‌পট্ বলিয়া ফেলা যাইত; তাহাতে "মোটরে" দম্ দিতে দিতেও শুনিয়া, বুঝিয়া এবং সম্ভব হইলে ইহার একটা অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যে বাহির হইয়া যাওয়া চলিত। কিন্তু তাহা হয় না। কারণ, কবি মোটরে চলেন না। তিনি "চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর" লইয়া ময়ূরপঙ্খী নৌকাতে হেলিয়া দুলিয়া চলেন। ইহাই তাঁহার চিরন্তন অভ্যাস। গন্তব্য পথের চারিধার ধূলির আবরণে ঢাকিয়া চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া কোনও গতিকে পৌঁছাই তাঁহার চলিবার রীতি নয়। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করিয়া, বুকের আগল খুলিয়া দিয়া তিনি চলেন——মন্থর গতিতে, কখনও বা দ্রুত।

এই স্থানে সাহিত্যের ভাষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া রাখাই ভাল। কেননা, ভাষাই রস-সৃষ্টির প্রধান উপায়। আমার ধারণা কেহ কোনও দিন সাহিত্যের ভাষা নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। "গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে" সে ভাষা ঝরিয়া ঝরিয়া অবিরত নিজের রাস্তা তৈয়ার করিয়াই চলিবে। লেখক তাঁর প্রাণের কথা, অন্তরের গভীরতম প্রদেশে যে সুর নিহিত রহিয়াছে তাহাকে ধীরে ধীরে পথ দেখাইয়া আনিয়া সদর দরজার সম্মুখে যাহা দিয়া দাঁড় করাইতে পারেন, তাহাই লেখকের ভাষা। রসবোধ জাগাইয়া তোলাই কবির কার্য্য। যে রস-সৌন্দর্য্যে কবি আত্মহারা হইয়াছেন, তাহার ভাষা তাঁহাকেই জোগাইতে হইবে, অন্যে নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারে না। যূথিকার গন্ধে আনন্দলাভ করিয়া যদি কোনও অরসিক তাহার একগুচ্ছ তুলিয়া আনিতে চান, তবে, তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা আর পাইবেন না। বৃন্তচ্যুত রাশি রাশি যূথিকা-পেলব-ই তাঁহার হাতে আসিবে। বস্তুতঃ যাহার ভিতরটা রসে টন্ টন্ করিয়া ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে, সে রস নিঃসরণের গতি নির্দ্দেশ তাহার নিজেরই কার্য্য, অন্যে তাহা করিতে পারে না। করিলে রস-সৃষ্টি সুদূর-পরাহত হইয়া উঠে। প্রোক্রাষ্টিসের শয্যায় মানুষের সাম্য হয় নাই ; মৃত্যুই হইত। কবি যখন গাহিলেন,

* * * *

"জানি তোমার আসা যাওয়া
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।"

তখন হইতে এই "পায়ের ভাষা" লইয়া কত যে ভাষার সৃষ্টি আজ অবধি হইয়া গিয়াছে তাহার আর সংখ্যা করা যায় না। ভাষার স্বাস্থ্য ও শুচিতা রক্ষা করিবার জন্য কতজন যে কতভাবে ইহার সমালোচনা করিয়াছেন তাহা এখানে বলিয়া উঠা সম্ভব নহে। এখনও অনেকেই এইরূপ ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন সন্দেহ নাই। তাঁহারা বলিবেন, "পায়ের ভাষা" না বলিয়া "কণ্ঠের ভাষা" বলা উচিত ছিল ; তাহা হইলেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভুল সাধু শব্দ যোজনা হইত, পরন্তু অর্থের কোনও পার্থক্য হইত না। কেন না, পায়ের কোনও ভাষা থাকিতে পারে না, যেহেতু পায়ের কোনও বাক্‌শক্তি নাই। সুতরাং সাধারণ সত্যটুকু না বুঝিয়া শব্দসমষ্টির প্রয়োগ করা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। ভাষা উচ্চারণ করা ইন্দ্রিয়বিশেষরই অধিকার ইহা কে না জানে? বাল্যকাল হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি শিশুশিক্ষায় স্পষ্টাক্ষরে লিখা রহিয়াছে, "চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্" এই পঞ্চেন্দ্রিয়। ইহার মধ্যে তোমার "পা" ঢুকাইয়া ষট্-ইন্দ্রিয় করিবার কি অধিকার? সুতরাং যাহা দেখিয়া আসিয়াছ ও বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছ তাহাই তোমার মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা সর্ব্বনাশ হইবে, জাতি যাইবে। অতএব সুবোধ বালকের মত চলিতে শিখ, পরিণামে সুখ পাইবে।

"বংশীধর ভাল ছেলে হিংসা নাই মনে,
যাহা পায় অংশ করি খায় ভাই বোনে।"

কিন্তু মধ্যে মধ্যে যে, বংশীধরের নৃত্য আরম্ভ হইয়া পড়ে তাহাতেই নিয়ম উলট পালট হইয়া যায়। বংশীধর শিখিল,— "লেখাপড়া করে যেই
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।"

কিন্তু মাঝখান হইতে যখন নৃত্যশীল বালকটী জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "মাষ্টার মহাশয়, গাড়োয়ান ও ত গাড়ী ঘোড়া চড়ে," তখন দন্ত-পংক্তির বিকাশ অথবা ইন্দ্রিয়বিশেষের সঙ্কোচন প্রসারণ বালকের মুখ সেলাই করিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তার বিচিত্র মনোজগৎকে কি নিষ্ক্রিয় রাখিতে পারে? তখন গুরুশিষ্য পরস্পরের ব্যবহারই পাঠ্যপুস্তকটীর বহির্ভূত আইনকানুনের কোঠায় আসিয়া ঠেকে। আমাদের ধারণা, ইহাই সংসারের নিয়ম। সাহিত্য ও ভাষা তত্ত্ব, সাহিত্য ও ব্যাকরণ এক জিনিষ নহে। ব্যাকরণ অনুযায়ী চলা খুবই ভাল সন্দেহ নাই; কিন্তু সর্ব্বদাই যে এ নিয়ম চলিবে এমন কোনও কথা নাই। নিশীথে তন্দ্রাজড়িত উৎকণ্ঠিত প্রেমিকের প্রতীক্ষার প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার কাণ কিসের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা প্রেমিকই বুঝিতে পারে। সে উৎকণ্ঠার প্রতি শুভমুহূর্ত্ত কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষায় থাকে কি? তখন কি প্রতি দলিত-পত্র, প্রতি বৃন্তচ্যুত ফল তাহার কাণে মূর্ত্ত ভাষা হইয়া প্রবেশ করে না? সে কি চায় কাকলী? না চির-পরিচিত পাদবিক্ষেপধ্বনি।

মোটকথা, যে সাহিত্যে প্রবাহ আছে অর্থাৎ যাহাতে জীবনী-শক্তির অভাব ঘটে নাই, তাহা যেমন নিত্য নূতন সত্য আবিষ্কার করিবে, নূতন সৌন্দর্য্য চক্ষুর সম্মুখে আঁকিয়া দিবে, তেমনিই নূতন ছন্দও সৃষ্টি করিবে, না হইলে তাহার কথা ফুটে না। ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সমস্তই সাহিত্যের বিষয়ীভূত বটে; কিন্তু ইহা মনে রাখার আবশ্যকতা আছে যে, ইহাদের চাইতেও অনেক বড় একটা জিনিষ সাহিত্যের প্রতিপাদ্য—যাহা না হইলে সাহিত্যই হইবে না। রস-ধারা ব্যতিরেকে ধর্ম্ম, নীতি অথবা সমাজ-তত্ত্ব নিতান্তই তত্ত্ব হইয়া পড়ে, একথা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হয় না। এমন অনেক বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থের নাম করা যায় যাহাকে সাহিত্যপর্য্যায়ে ফেলা চলে না। অথচ সকলগুলিই সত্যের খনি। কোনওটী যুগযুগান্ত সত্য বিতরণ করিয়া আসিতেছে, লোক শিক্ষা দিয়া আসিতেছে; কোনওটী বা আবহমান শাসন-পদ্ধতি পর্য্যন্ত আমূল উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছে। অথচ কোনটীই সাহিত্য নহে। কারণ, কবি ইহাদিগকে সৌন্দর্য্যকণায় সিঞ্চিত করিয়া অভিষেক করেন নাই। তাঁহার নিকট এদের চাইতে ক্ষুদ্র দুইটী কথাই বেশী মূল্যবান। সুতরাং সত্যমাত্রই সাহিত্যের কথা নহে, সত্যের বাজার সাহিত্যেরই একচেটীয়া নহে। এই কারণেই ইহা সাধারণের হাত হইতে দূরে পড়িয়া যায়। রক্ত-মাংসের আবরণে ঢাকা কায়ার কোন নিভৃততম প্রদেশে তাহার আনন্দ-স্পন্দন চলিতেছে তাহা সকলের অনুভূতিতে আসে না।

এইরূপ কাব্য সম্বন্ধে যে কথা, নাটক উপন্যাস সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা। কপাল কুণ্ডলার সর্ব্বশেষ দৃশ্যটী স্মরণ হইতেছে—"না——মৃণ্ময়ি——না!——" এইরূপ শব্দ করিয়া নবকুমার কপাল-কুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহুপ্রসারণ করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না।

চৈত্রবায়ুবিতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটোভাগে প্রহত হইল; অমনি তট-মৃত্তিকা-খণ্ড কপালকুণ্ডলার সহিত ঘোররবে নদী প্রবাহ মধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। * * * সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল? যেমন অকস্মাৎ তরঙ্গাঘাত কিনারায় আসিয়া লাগিল, তেমনই নূতন জীবনের সূচনা হইতে হইতেই অকস্মাৎ উপাখ্যানও শেষ হইল। যে প্রেমনির্ঝরিণী অত্যুন্নত শৈলখণ্ডে নিয়ত আঘাত পাইতে পাইতে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা অনন্ত গঙ্গা প্রবাহে ছুটিল! লেখক দুস্তর নদীতে পাঠককে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলন। কেহ বা নবকুমারের সঙ্গে সঙ্গে রস-গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, আর কেহ কূলেই রহিয়া গেলেন। এইস্থানে, যিনি রসিক তিনি কখনও এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে বসিয়া রহিলেন না যে, কপালকুণ্ডলার কি জীবনরক্ষা হইল? রসানুভূতি তাঁহাকে নায়িকার সঙ্গে সঙ্গে অমৃতরাজ্যে পৌঁছাইয়া দিল, সুতরাং তাঁহার অনুসন্ধানের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা মনে করিলেন যে, উপাখ্যানভাগ বস্তুতঃ একটু হাঠাৎই শেষ করিয়া ফেলা হইয়াছে, তাঁহাদের ঔৎসুক্যের মাত্রা এত বাড়িয়া যায় যে, তাঁহারা সন্ধান লইয়া, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাহার সম্ভাব্যতা ও সত্যতা আবিষ্কার করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যান, যে কপালকুণ্ডলার শেষ কি হইল? তাঁহাদের স্বতঃই মনে হইতে থাকে যে, এমনভাবে জমাইয়া তুলিয়া গল্পটা এমন করিয়া শেষ না করিয়া ফেলিলেই কি চলিত না? তাই তাঁহারা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন, "কপালকুণ্ডলার কি হইল?" ইহার কি কোনও উত্তর আছে? তখন কি শুধু ইচ্ছা হয় না যে বলি, "কপালকুণ্ডলা মরিয়া ভূত হইয়া গেল?" মনোজগতের এই বৈষম্যের জন্যই কি একের পূর্ণতৃপ্তি ও অন্যের অহেতুকী অনুসন্ধিৎসা নহে? এইস্থানে বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য হইতে একটী দৃষ্টান্ত মনে পড়িল। কাদম্বরী-চিত্র শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন, "কল্পনা করিয়া দেখ---গায়ক গান গাহিতেছে 'চ---ল---ত---রা---আ---আ---আ---আ,' ফিরিয়া পুনরায় 'চ---ল---তরা---আ---আ---আ---আ---আ, সুদীর্ঘ তান,---শ্রোতারা সেই তানের খেলায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; এদিকে গানের কথায় আছে, "চলত রাজকুমারী" কিন্তু তানের উপদ্রবে বেলা বহিয়া যায়, রাজকুমারীর আর চলাই হয় না; সমজদার শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে রাজকুমারী না চলে ত না-ই চলুক কিন্তু তানটা চলিতে থাক্।" * এই বৈষম্যের কারণ এই যে, প্রকৃত আনন্দ যাঁহারা পান তাঁহারা উপন্যাসের সামাজিক বা নৈতিক চরিত্র স্ফুরণের দিকে দৃষ্টি দিবার পূর্ব্বে ইহার সমস্ত সুষমাটুকু নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া নিজকে তাহাতে স্নান করাইয়া, তবে সেইদিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ পান। কারণ রস ও সৌন্দর্য্যই ইহার মূল কথা। নাটকেও ইহার ব্যতিক্রম নাই। নাটক বিষয়টাকে সমগ্রভাবে না দেখিলেও এমন এক একটী চরিত্র সৃষ্টি ইহাতে পাওয়া যায় যাহাতে আনন্দ ও সৌন্দর্য্য এতই থাকে যে, ব্যক্তি হিসাবে সেই চরিত্র চক্ষুর সম্মুখেই পড়ে না। ইহা আপন সৌন্দর্য্যেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া ঝল্‌মল্ করিতে থাকে। এই সৌন্দর্য্য সকলের কাছে ধরা পড়ে না। যে স্থানে ওথেলো ডেস্‌ডিমোনাকে

"বেশ্যা" বলিয়া চলিয়া গেলেন, সে স্থানে, তাঁহারই পরমশত্রু নরপিশাচ আয়াগোর চরণে জানু পাতিয়া কি মর্ম্মভেদী করুণসুরেই ডেস্‌ডিমোনা বলিয়াছিলেন "Am I that name Iago?" হৃদয় তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, অফুরন্ত প্রেম প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকিয়া থাকিয়া, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নীরব রোদন বহন করিয়া বেড়াইতেছে; তথাপি ভাষা নাই। সে-শব্দ উচ্চারণে অসমর্থা সতীর ওষ্ঠাধর মুহুর্মুহু কম্পিত হইতেছিল, কেবল একটা কথা—"Am I that name Iago?" এই অতি সংক্ষিপ্ত উক্তি যতখানি সৌন্দর্য্য বাহিরে ফুটাইয়া তুলিল, ভিতর হইতে তুলনা করিলে তাহা কি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হইয়া দাঁড়ায় না? চক্ষের সম্মুখে আমরা দেখিতেছি মঞ্জুরিত সৌন্দর্য্য যৌবনে টল্‌মল্ করিতেছে, অথচ নিষ্ঠুরতায় ক্ষতবিক্ষত! কিন্তু এই অসহায়া যুবতীর করুণ দৃশ্য ছাড়া আমাদের অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে পুনঃ পুনঃ যে চিত্রটী ভাসিয়া বেড়াইতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই চিত্রশালার সমস্ত চিত্রগুলি একত্রিত হইয়া দর্শকের ভিতর যে এক রেখাপাত করে তাহা সম্পূর্ণই জাতিহীন নহে কি? ইহার ভিতর খুঁজিলে ব্যক্তিগত চরিত্রগুলির ভালমন্দ, দোষাদোষ কিছুই পাওয়া যায় না; কারণ, এই উজ্জ্বল রশ্মিপাত বিভিন্ন চরিত্রের বৈষম্য ঢাকিয়া ফেলিয়া রসগ্রাহীকে এক নূতন স্থষ্টির ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। তাহাতে প্রত্যেকগুলি চরিত্র এক একটী পূর্ণস্থষ্টি, এবং তাহাদের সমষ্টিও পূর্ণরূপেই দেখা দেয়। অথবা, যে স্থানে মৃত প্রণয়ীর শ্মশানশয্যায় আশ্রয়গ্রহণে গমনোদ্যতা "থেক্‌লাকে" পরিচারিকা বলিতেছিল, -"Alas, what would you there, my dearest mistress?" অতি দুঃখে থেক্‌লা উত্তর দিলেন,—"What there? Unhappy girl! Thou wouldst not ask if thou hadst ever loved..." এ চিত্রে কি জাতিবিচার আছে? ইহা কি পারিপার্শ্বিক অবস্থা ব্যবস্থা, আচার বিচার, অথবা ব্যক্তিগত দোষাদোষ সকলের ঊর্দ্ধে নহে? অল্পক্ষণ কথোপকথনের পর পুনরায় থেক্‌লাকে ফিরাইয়া রাখিবার জন্য পরিচারিকা বলিল, "এতদূর! তুমি কেমন করিয়া যাইবে?" সেই স্থানে যখন রাজনন্দিনী বলিয়া উঠিলেন,

"Does the pilgrim count the miles, when journeying
To the distant shrine of grace?"

তখন কোন্ মহাতীর্থের দিকে তাঁহার উন্মুখ প্রেম চাহিয়া রহিয়াছিল, তাহা সাধারণের মাটীতে থাকিয়া পরিচারিকা একবর্ণও বুঝে নাই। তাঁহার হৃদয়ে কি প্রেম-মন্দাকিনী বহিয়া যাইতেছিল, এবং তাহা হইতে ক্ষণে ক্ষণে কি অমৃতধারাই ক্ষরিত হইয়া তাঁহাকে সৌন্দর্য্য ভূষিত করিয়া মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে বোধশক্তির তীব্র চেতনা চাই। অনেকেই উপরোক্ত স্থানগুলি পড়িয়া, অথবা ইহাদের অভিনয় দেখিয়া সুখী হইতে পারেন, নায়ক নায়িকার দুঃখ দেখিয়া দুঃখিত হইতে পারেন, কিন্তু বাহ্যদৃষ্টি অন্তর্নিহিত করিয়া, অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে জানেন না। রসজ্ঞ তাহা পারেন। এই রসস্থষ্টিই—কবির এবং রস স্রষ্টার স্থষ্টির পরাকাষ্ঠা। ইহাই তাঁহার আদর্শ। তৎপশ্চাৎ বাস্তবজীবনের সত্যাসত্য, ভালমন্দ সকল কথাই—আসিবে।*

* ঢাকাহল সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।

তাজ

[শ্রীধীরেন্দ্রলাল দাস]

আগরা সহর, আড়াই প্রহর রাতের ঘুমে মরা

নীল যমুনায় কাজলকালীর ছোপ,

গাছের পরে ছিমিয়ে পরে বাতাস হিমে ভরা,

তারার চোখে আকাশ চেয়ে চুপ।

রংমহলের সুন্দরীদের বন্ধ ঘরের দ্বারে

স্তব্ধ অচল অস্ত্রপাণি খোঁজা,

একটী কোঠার দখিন দুয়ার ফুলবাগিচার ধারে

শুধু কেবল আধেকখানি বোজা ;

দীপ জ্বলেছে সোণার শেজে আধার ঈষৎ আলা

দুইটি ছবি হাড়ের পালং 'পরে,

রোগ যাতনায় বেগম লুটায়, ছিন্ন ফুলের মালা,

বাদ্‌শা প্রিয়ার শিরটি কোলে ক'রে।

রাত গহনের অন্ধকারের নিবিড় অঙ্গ বেয়ে

মৃত্যু ছায়া ঘনায় নয়নব্যাপি,

বাদ্‌শা তাহার প্রাণপ্রতিমার মুখের পানে চেয়ে,

ক্ষণে ক্ষণেই উঠছে হৃদয় কাঁপি ॥

বেদনা-কাতর অস্ফুট স্বর শীর্ণ অধর থেকে

শুন্‌তে পেয়ে বিভল সাজাহান,

ব্যাকুল ব্যথায় ত্রস্তে শুধায় মমতাজেরে ডেকে

"বল্‌ছ কিছু আমায় বেগমজান্ ?"

"চোখের আলো সব ফুরালো পড়্‌লো যবনিকা"

মুমূর্ষু কয় বিপুল আয়াস ভরে

"বিদায় পলে এই কপোলে শেষ চুমো হোক্ লিখা

বেহস্তে যাই মধুর মরণ মরে'

"মিটাও হে নাথ! অন্তিমে সাধ জুড়াও উষর হিয়া
দাও সোহাগের শেষের পরশন,
"নাও আমারে বুক মাঝারে হাত দুখানি দিয়া,
তোমার কোলেই মুদ্‌ব দুনয়ন।
"আজকে রাতে তোমার সাথে অতুল অভিসারে
অতীত আশা তৃষার অপনোদন্,
"পেলুম তোমায় জীবন সীমায় পূর্ণ অধিকারে,
কৃতার্থ যে আমার দেহ মন।
"আজযে কতই অবিরতই শতদিনের স্মৃতি
মনের মাঝে নাম্‌ছে আলোর রথে,
"আমায় তোমার হারিয়ে ফেলার কিযে অশেষ ভীতি
সারাটি রাত ছাড়্‌ছে না বুক হতে।
"জ্যোৎস্না ধোওয়া বাতাস বওয়া প্রথম মিলন রাতে
নামটি ধরে ডাক্‌লে কানে কানে
"বাধ্‌লে মোরে বাহুর ডোরে চুমোর সাথে সাথে
চাইতে যখন গেলাম তোমার পানে,
"উর্ণাখানি নিলেই টানি, মান্‌লে নাকো বাধা
সরিয়ে দিলে বুকের বসন যত,
"রাত্রি জাগি কথার লাগি সাধ্‌লে সেকি সাধা
কইতে গিয়েও হলুম সরম নত।
"এমনি ধারা অন্তহারা কত অতীত কথাই
আছে আমার হৃদয় খানি ঘিরে
"এ অন্তরে দয়িতরে আর কামনা নাই,
শুধু বল ভুল্‌বেনা বাঁদীরে।
"কবর কোলে জমীনতলে মিশ্‌বে যখন দেহ
মোর জীবনের প্রদীপ গেলে নিবে,
"পরীর সমা অনুপমা তখন এসে কেহ,
স্মৃতি কি মোর মলিন করে দিবে?
"এক লহমার অপেক্ষা আর নেইক আমার প্রিয়
ঐযে কারা ছিনিয়ে নিতে এলো।

একলা ঘরে অবসরে বারেক মনে নিয়ো

দুখদরদের একটী নিশাস ফেলো।"

* * * * *

বাদশাহেরে রিক্ত করে মৃত্যু দিল সাজা

রাজ্যজুড়ে পড়্‌ল বিষাদ ছায়া

বিয়োগ কাতর মনের ভেতর থাক্‌ল উজল তাজা,

অনিন্দিতার রাঙ্গা মুখের মায়া।

আর কি তারে ভুলতে পারে হৃদ্‌ জুড়ে যার বাস

দিন যামিনী কাটলো চখের জলে

সাজাহানের ভাঙ্গা প্রাণের রুদ্ধ শোকোচ্ছ্বাস

মূর্ত্ত হল মণি তাজমহলে॥

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা।

(শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চাকলাদার বি, এস্‌সি।)

এ হতভাগ্য দেশটা অসাড় হয়ে পরে আছে একটা মস্তবড় জানোয়ারের মত। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়েছে—সে অনেক দিন হল। "আপনার ভাল পাগলেও বোঝে"—এ কথাটা যেন এই হতচ্ছাড়া দেশে প্রয়োগ করা যায়না। আত্মনির্ভরতা ছেড়ে দিয়ে "হাঁ" করে চেয়ে আছে কর্ত্তাদের মুখের দিকে। তুমি কান মলো, ঘুসি দেও—"টুঁ" শব্দটিও করবেনা—কি শান্ত, কি সুশীল—অহিংসার অবিকল অবতার যেন স্বয়ং বুদ্ধদেব। এমন উদাহরণ সমস্ত জগৎটা ঘুরেও পাবেনা। ঘরে চোর ঢুকল কর্ত্তামশাই টের পেলেন—"হা" "হু" শব্দটিও করলেন না—কি জানি টের পেলে যদি আঘাত করে। সুযোগ বুঝে মাল পত্র টাকা কড়ি গুছিয়ে চোর মশাইত নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করলেন। কর্ত্তামশাইত তখন শয্যা থেকে উঠে হৈ চৈ আরম্ভ করে দিলেন। পাড়াপ্রতিবেশী এসে হাজির হলেন আর লাগলেন তামুকের শ্রাদ্ধ করতে। সকাল বেলা থানায় এজাহার দেওয়া হল—দারোগা বাবু এসে তার খাতায় মাল পত্রের একটা হিসেব লিখে নিলেন—বাস্‌। ফুরিয়ে গেল কর্ত্তামশাইর কর্ত্তব্য। আবার স্ত্রীর উপর অত্যাচার হচ্ছে—স্বামী হাঁ করে তা দাঁড়িয়ে দেখছে একটু চোখলাল করার শক্তিটুকুও নেই রক্ষা করা ত দূরের কথা। আর কাতরস্বরে ভগবানকে ডাকতে লাগল ভগবান ত ভীরু কাপুরুষের দিকে ফিরেও চাননা। তিনি যেন ইঙ্গিত করে বলছেন—"নিজের পায়ে দাড়াতে শেখ—তখন শক্তি সাহস দরকার হলে আমি দেব।"

দেশের এই দুর্দ্দশা দেখে কয়েকজন মনীষী হৃদয়ে বড়ই আঘাত পেলেন। তাঁরা সদাই ভাবছেন কিসে এই দেশটাকে আত্মরক্ষা শিখান যায়। এই সমস্যার উৎকৃষ্ট সমাধান কল্লেই আজ দেশে "সামরিক শিক্ষার" প্রসঙ্গ উঠেছে।

সামরিক শিক্ষা একটা মস্ত বড় সমস্যা বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ প্রসঙ্গ এখনও ভাল করে দেশে উঠেনি—খুব কম লোকই এ বিষয় একটু ভেবে থাকেন। তবে সে একটা খুব সুখের দিন হবে—যে দিন সমস্ত দেশটা জুড়ে এই সামরিক শিক্ষা প্রসঙ্গ উঠবে ও ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করে ইহার প্রচলনের জন্য দেশশুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে। তবে সে দিন কতদূরে নির্দ্দেশ করে বলা সহজ নয়।

সামরিক শিক্ষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "সিলেবাস্" ভুক্ত করা উচিত কিনা এই নিয়ে বেশ একটু আলোচনা চল্‌ছে কতকগুলি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে।" বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা" বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "সিলেবাস্" ভুক্ত হউক এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব বোম্বাই ও মান্দ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "সেনেট সভায়" উপস্থিত হয়েছিল এ নিয়ে তুমুল আলোচনাও চলেছিল। কি দুঃখের বিষয় প্রস্তাবটি দুই যায়গাতেই অগ্রাহ্য হয়। ইহাতে "সেনেটের" সদস্যদিগের বর্ত্তমান মনোভাবের বেশ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু খুব আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হবে। হয়ত এমন দিন আসবে যে দিন সামরিক শিক্ষা প্রচলনে এঁরা সবাই একমত হবেন। এঁরা বিশেষ কোন যুক্তি দ্বারা নিজেদের মতের সমর্থন কচ্ছেন না—শুধু যা কিছু গলদ ঐ মনে। সামরিক শিক্ষার কথা শুনেই যেন এঁদের শরীর আঁত্‌কে উঠ্‌ছে। তবে সুখের বিষয় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "সেনেটের" সভায় ইহার অন্তর্গত কলেজগুলিতে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হউক এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তবে এখনও গবর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছে। আশা করা যায় ব্যাপারের গুরুত্ব মনে করে আজ হউক আর কাল হউক গবর্ণমেণ্ট ইহাতে অনুমতি দিয়ে ইহা প্রচলনের ব্যয়ভার রাজস্ব হতে মঞ্জুর করবেন। আমরা আশা করি অদূর ভবিষ্যতে ভারতের সমস্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি সামরিক শিক্ষার উপকারিতা বুঝে ইহা "সিলেবাস" ভুক্ত করে নেবেন।

সামরিক শিক্ষার উপকারিতা কি?

সামরিক শিক্ষা পেলে মনের অবস্থার কি প্রকার পরিবর্ত্তন হয় তাহা লক্ষ্য করার বিষয়। ইউরোপ আমেরিকার অনেক দেশেই সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই সব দেশের একটা যুবকের হাব ভাব চলাফেরা লক্ষ্য করে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই একজন ভারতের যুবক আর তাহাতে কত প্রভেদ! কি বুক ফুলিয়ে হাঁটে যেন জগতের কাউকে ডরায় না! কি বলিষ্ঠ দেহ! যে কোন বিপদ আসুক না কেন—সে বীরের মত তার সম্মুখীন হবে এক পাও হট্‌বে না। দশটা লোক মিলে তাকে আক্রমণ কর্‌লে, দেখবে সে কি বীরত্বের পরিচয় দেয়! অস্ত্র শস্ত্র থাক্‌লে সে মনে করে, "কুচ্ পরোয়া নেই, বীরের মত যুদ্ধ করে দরকার হলে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবো না।"

আর ভারতবাসী? একটা সাহেব দেখলেই প্রাণ কেঁপে উঠে। গোলাগুলির ত কথাই নাই। স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস ভারতবাসীর কাপুরুষতা, দুর্ব্বলতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করে অতি দুঃখের সহিতই বলে গেছেন ঃ—

*　　　*　　　*　　　*

"কার স্বদেশে কাদের মেয়ে,　　　এমনতর পথে পেয়ে,
জোর জবরে গাড়ীর ভিতর শাড়ী কেড়ে লয়!"

*　　　*　　　*　　　*

"স্বপ্নে দেখে গোলাগুলি,　　　চমকে উঠিস্ ভেড়াগুলি,
উইয়ের ঢিপি দেখে তোদের শিবির বলে ভয়।"

*　　　*　　　*　　　*

আমরা শান্ত শিষ্ট বাবুর দল। একটু বিপদের আশঙ্কা হলেই হৃদপিণ্ডটা কাঁপতে থাকে। একটা চোর ঘরে ঢুকলে তাকে বাধা দেওয়ার সাহসটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছি। পুলিশের কৃপা ভিক্ষা কচ্ছি আর তারা যাতে আমাদের সকল বিপদ হতে দূরে রাখে তার চেষ্টায় ব্যস্ত হচ্ছি। কোন বিপদে প্রাণের আশঙ্কা থাকলে ত আর কথাই নাই—সবেগে বীরের মত পশ্চাদ্ দিকে পলায়ন। আমাদের দেশে পণ্ডিতমশাইগণ বেশ বীরের মত শিখা নেড়ে আওড়াচ্ছেন—"য পলায়তে স জীবতি।" কাপুরুষতার এমন উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কোথাও আছে নাকি? জানিনা কোন "সাহসী" মনীষী এই বচনের সৃষ্টি করেছিলেন। বিপদ দেখলেই সবাই ঐ বুলি আওড়ায় যেন অকাট্য বেদ বাণী—আর চম্পট দিয়ে নিজের কাপুরুষতা সমর্থন করে। ঐ বচনটা দেশের যে কত ক্ষতি করেছে তা বোধ হয় এর রচয়িতা বেঁচে থাকলে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতেন।

জগতের সমক্ষে আমাদের কেউ হীন করতে চাইলে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেই। স্বামী বিবেকানন্দ বাস্তবিকই বলেছেন—"আমাদের প্রতিভা চর্ব্বিত চর্ব্বণে এবং সর্ব্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নাম কীর্ত্তনে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের যে শৌর্য্য বীর্য্য ছিল, আমাদের তার শতাংশের একাংশও নেই, আমরা বীরশ্রেণী রাজপুতদের শতমুখে প্রশংসা করে থাকি—কিন্তু তাদের উষ্ণ রক্তের একবিন্দুও যে আমাদের শিরায় প্রবাহিত হচ্ছে তার ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তারা মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য দরকার হলে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হোত না। ছোট বেলা হোতেই পুরুষস্ত্রী উভয়ই যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করত। যৌবনে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই তারা যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ হয়ে দাঁড়াত। কাজেই তারা কাউকে ভয় করত না। আত্মরক্ষা কেন—সমস্ত দেশটা রক্ষা করত তারা সিংহ বিক্রমে। আমাদের যত কিছু গলদ ঐ আত্মরক্ষা করার শক্তির অভাবে। দেশে যদি সামরিক শিক্ষা প্রচলন করা যায় তবে কয়েক বৎসর পরে দেখা যাবে যে মানুষগুলি কি প্রকার নির্ভীক ও বীর্য্যবান হয়ে দাঁড়ায়। তখন "লাথি মেরে পিলে ফাটানের" গল্প শুনা যাবে না—আর স্ত্রী জাতির

উপর অত্যাচার ও স্ত্রী হরণের পালাটাও খুব কমই এই ভারত মধ্যে অভিনীত হবে—যা নাকি এই হতভাগ্য দেশে প্রায়ই ঘটে থাকে। সামরিক শিক্ষা এই মরা জাতটার মনে আশার আলোক সঞ্চার করে দেবে—"মরা গাঙ্গে ডাক্‌বে বান"—কাপুরুষতা, দুর্ব্বলতা দূর্ করে একে বীরের মত আত্মরক্ষা করার শক্তি ও সাহস এনে দেবে আর সর্ব্বোপরি দেশে নূতন প্রাণ ও নূতন ভাবের সাড়া পাওয়া যাবে এবং নৈরাশ্যব্যঞ্জক মলিন মুখে তখন তেজ ফুটে বেরুবে।

আত্মরক্ষার শক্তি ও সাহস অভাবে আমরা জগতের সমক্ষে কত হীন, কত নিকৃষ্ট হয়ে পরে আছি—তা কজনে ভাল করে বোঝেন বা একটু স্থির হয়ে চিন্তা করে দেখেন ? এ মরা দেশে বিশ্ব-প্রেমের বন্যা ছুটান যে কতদূর বাতুলতা তা অনেক মনীষীও বোঝেন না। অহিংসার স্থানও এদেশে সেই প্রকার। সবল যদি "অহিংসা ধর্ম্ম" তার মূল মন্ত্র বলে মনে প্রাণে গ্রহণ করে, তাহলেই সেটা একটা জ্যান্ত মূলমন্ত্র হোল—তাতেই তার মহত্ব ও মহানুভবতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। "Whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also."—যিশুখৃষ্টের এ বাণী ত সবলের জন্য। দুর্ব্বল ওকথা বল্‌লে তো তার ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় পাওয়া যাবে। সাহেব বড় বাবুকে মুষ্ট্যাঘাত করলেন—বড় বাবু ত বেশ জানেন এর প্রতিবিধান করা তার পক্ষে অসম্ভব—এ নিয়ে গোলমাল করলে তো তার চাকুরী যাবে আর অন্নাভাবে প্রাণ যেতে বসবে। সে আর কি করে—মনে মনে (প্রকাশ্যে বলার সাহস কোথায় ?) বল্‌লে, "তোমাকে ক্ষমা করলুম।" একে কি ক্ষমা বলে—এ ক্ষমার মূল্য কি ? এ ত ভীরুতা, কাপুরুষতা ব্যঞ্জক।

আজ যদি দেখি শত্রু এসে আমাদের মা, বোনের উপর অত্যাচার করার প্রয়াস পাচ্ছে। তখন কি করবো ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জ অধমের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকবো আর শত্রুর কৃপাভিক্ষা করবো না কাতরস্বরে ভগবানকে ডাকবো ? ভগবান ত ভীরু কাপুরুষের সাহায্য করেন না—তিনি ঐ দুর্ব্বলতা দেখে উপহাস করেন মাত্র। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের সম্বল নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করে শত্রুকে হটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করলে ভগবান আমাদের সাহায্য করবেন কেন ? এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি ? বীরের মত এগিয়ে গিয়ে নিজেদের সম্বল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াব—শত্রুকে হটিয়ে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করবো না পারলে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হবোনা। আমাদের মা, বোন তাদের মান মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের নিকট এইটুকুও কি প্রত্যাশা করেন না ?

কাজেই আমাদের আত্মরক্ষা করার শক্তি ও কৌশল শিখতে হবে। সমর-শিক্ষা দেশে প্রচলিত না হলে আমরা কিছুতেই আত্মরক্ষা কত্তে পারবো না। সমর-শিক্ষায় শিক্ষিত হলে আমরা মা, বোনের মান ইজ্জত রক্ষা কত্তে পারবো। আর দেশে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বিরাজিত হবে ও বিদেশী শত্রুর আক্রমণ হতেও স্বদেশকে রক্ষা কত্তে পারবো।

আজ আমরা "স্বরাজ" "স্বরাজ" বলে চীৎকার কচ্ছি। দুর্ব্বলের আবার স্বরাজ কি ? আচ্ছা ধরে নিলুম আমরা স্বরাজ পেয়েছি—ইংরেজ শাসনভার আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে হাত

গুটিয়ে বস্‌লে তখনত বৈদেশিক আক্রমণ হতে দেশকে রক্ষা কত্তে হবে। তখন শুধু "প্লাটফরমে" দাঁড়িয়ে লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিলে বা খবরের কাগজে বড় বড় রচনা লিখলে চলবে না। শত্রুকে অহিংসা ধর্ম্মের বিশদ্ ব্যাখ্যা করে শুনালে বা বিশ্বপ্রেমের বড় বড় বুলি আওড়ালে তার প্রাণ গলবে না। বাধা না পেলে তার কাজ সে নির্ব্বিঘ্নে হাসিল করে নেবে। কাজেই বাহু বলের প্রয়োজন। স্বরাজ পেলে—আমেরিকা বল, ফ্রান্স বল আর জার্ম্মানই বল সবাই একবার চেষ্টা করে দেখবে এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতবর্ষটার মালিক হওয়া যায় কিনা। এদেশটা নিয়ে একটা বড় লুফো লুফি হবে সমস্ত জগতের বড় বড় জাতিদের মধ্যে। তখন যদি সামরিক শিক্ষায় উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হয়ে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে তাদেব হটিয়ে দিতে না পারি তা হলে তখন দেশের অবস্থা কি হবে? আমাদের হাত থেকে শাসন ভার ছিনিয়ে নিয়ে এদেশে তাদের আধিপত্য স্থাপন করবে। এখন আছে ইংরেজ রাজ—তখন না হয় হবে আমেরিকান রাজ, ফরাসী রাজ বা জার্ম্মান রাজ। এখন যা আছি ঠিক তাই থাকবো কিম্বা অবস্থা আরও শোচনীয় হতে পারে—'পুনর্মূষিকো ভব।''

সামরিক শিক্ষা প্রচলনের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে একদল লোক বলছেন—আত্মরক্ষা করার জন্য আমরা এত ব্যস্ত হচ্ছি কেন— আমাদের মান, ইজ্জত রক্ষা করা বা দেশে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করার জন্যত পুলিশই আছে—তারা তাদের কর্ত্তব্য করে যাবে আর আমরাও নিরাপদ থাকব। আচ্ছা ধরে নিলুম পুলিশ বেশ সতর্কতার সহিত তার কর্ত্তব্য পালন কচ্ছে। বাড়ীতে ডাকাত এসে সমস্ত বাড়ী ঘিরে দাঁড়াল একটা লোকেরও বের হওয়ার সাধ্য নেই। তখন পুলিশকে কি করে সংবাদ দেবো? আমরা সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই নিজের বাহুবলে ও কৌশলে এ বিপদ হতে উদ্ধার হতে পারবো। কিন্তু ডাকাত নির্ব্বিঘ্নে চলে গেলে পুলিশে খবর পাঠালে কি ফল হয় তাত সকলেই জানি।

আবার কেহ বলছেন যে স্বরাজ কবে হয় কে জানে। স্বরাজ হলে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ রক্ষা করা যাবে। কিন্তু শত্রু এসে পড়লে সে কি শিক্ষিত হওয়ার সময় দেবে? এখন থেকে চেষ্টা করে সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে না থাকলে বিপদ কালে আমরা হাবু ডুবু খেতে থাকব আর শত্রু দেশকে দুর্ব্বল ও অরক্ষিত পেয়ে ইচ্ছামত অত্যাচার ও লুণ্ঠন করে চলে যাবে বা তার আধিপত্য স্থাপন করে বসবে।

আবার কেহ বলছেন যে জাতি সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার একটা প্রবৃত্তি জন্মে—এর ফলে বড় বড় যুদ্ধ হয়ে থাকে তাতে অসংখ্য লোক ও অর্থ ক্ষয় হয়—জগতে একটা অশান্তির সৃষ্টি হয় ও যুদ্ধের পূর্ব্বের অবস্থা ফিরে পেতে অনেক সময় ও শক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু এঁরা একটা মস্ত বড় ভুল কচ্ছেন। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য জগতে অশান্তি ও অরাজকতার সৃষ্টি করা নহে—বরং তার উল্টো। জগতে যাতে কোন দিন মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে অশান্তির সৃষ্টি না হয় এই জন্যই সকলের সমর-শিক্ষায় সুশিক্ষিত হওয়া দরকার। একটা জাতি সমর শিক্ষায় সুশিক্ষিত হলে সমস্ত জগত তাকে সম্মান ও ভয় করবে। কোন যুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখে সে যদি মধ্যবর্ত্তী হয়ে দুই জাতির মধ্যে

সৌহার্দ্দ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তা হলে অনেক ফল হওয়া খুবই সম্ভব। কারণ তার কথা অগ্রাহ্য বা অবহেলা কত্তে সহজে কেহ সাহস পাবে না। ভারতবর্ষের মত এত বড় একটা সুসভ্য দেশ যদি সমর-শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয় তা হলে নিশ্চয় সমস্ত জগত একে মহা সম্মানের চক্ষে দেখবে। জগতে কোন মহা-যুদ্ধের আশঙ্কা হলে এই সুশিক্ষিত দেশটা যদি মধ্যবর্ত্তী হয়ে মীমাংসা করার চেষ্টা করে তা হলে নিশ্চয়ই সুফল ফল্‌বে এ আশা করা খুবই সম্ভব। এর কথা অগ্রাহ্য করা দূরে থাকুক খুব সম্ভ্রমের সহিতই গ্রহণ করবে। কাজেই সমস্ত জগতে চিরদিনের জন্য শান্তি ও সুশৃঙ্খলা রক্ষা কত্তে হলে—যার জন্য আজ অনেক বিশ্বপ্রেমিক ব্যস্ত হয়ে পরেছেন—ভারতবর্ষের সমর-শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ঐ বিষয়ে ভারতবর্ষের একটা মহৎ কর্ত্তব্য আছে—হয়ত ভারতের সেই সুদিনের জন্য সমস্ত জগত অপেক্ষা কচ্ছে। উইল্‌সন্‌ কত চেষ্টা করেছেন ইউরোপে চিরশান্তি স্থাপন কত্তে। ভারতবর্ষ তৈরী হয়ে অগ্রসর হলেই হয়ত জগতে চিরশান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হবে।

বাধ্যতামূলক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি?

কেহ কেহ বলেন সমর-শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করে দেশবাসীকে ইচ্ছামত গ্রহণ কত্তে দেওয়া উচিত। কিন্তু সমর-শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করে দেশবাসীকে আহ্বান করে তাদের ঐ শিক্ষা গ্রহণ কত্তে বল্‌লে দেখবো যে খুব কম লোকই শিক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হবে। এ হল আমাদের দেশের লোকের ভাব। আহার নিদ্রায় আরামে সময় কাটানর পরিবর্ত্তে বন্দুক ঘাড়ে করে ছুটো ছুটি করা বড়ই কষ্টকর হয়ে উঠে। কাজেই সমর-শিক্ষার যে উদ্দেশ্য অল্পসংখ্যক লোক দিয়ে সে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। উদ্দেশ্য সিদ্ধি কত্তে হলে আমাদের দেশে সমর-শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করে উপায় নাই।

অনেকে বলেন—যে কাজই হোক না কেন লোককে বাধ্য করে করান বড়ই অন্যায়—এতে তার মনের উপর একটা অনিচ্ছাকৃত ভার চাপান হয়—বিবেক বুদ্ধির উপর জোর জুলুম করা হয়। কিন্তু আমরা এমতের সম্পূর্ণ সমর্থন করি না। যা প্রচলিত হলে দেশের একটা মহা উন্নতি সাধিত হবে তাহা বাধ্যতামূলক করে গ্রহণ করার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করলে যদি কয়েক জনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়—তা হলে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। কালের স্রোতে কার্য্যের মহৎ উপকারিতা উপলব্ধি করে ইহারাই ইহার প্রচলনের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করবে। আচ্ছা, তুমি কি বলবে শৈশবে বর্ণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা অন্যায়? শৈশবে বর্ণ শিক্ষা না করলে আজ আমরা নিরক্ষর হয়ে জগতের কোন আলোক পেতুম না। স্বাধীন দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায় শিক্ষার কত বিস্তার হয়ে অজ্ঞানের অন্ধকার দূরীভূত হয়েছে। তারা এখন জগতের সমক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক নয়- ফলে শিক্ষার বিস্তার মোটেই হচ্ছেনা—জ্ঞানের আলোক না পাওয়ায় আজ আমরা এত পেছনে পরে আছি। জগতের কিছু জানিনা—কিছু বুঝি না। কূপমণ্ডুকের মত কূপে থেকে ভাবছি—বেশ আছি—এইত জগত—আমিই ত এর রাজা। সুতরাং তুমি কি বলবে আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয়। দেশের ও দশের মঙ্গল হলে

যদি তুমি সুখী হও তা হলে কোন মতেই ও কথা বলতে পারবে না। সমর-শিক্ষারও ঠিক ঐ কথা। সমর-শিক্ষা যখন দেশের দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর করে একটা মস্ত বড় শক্তিমান জাতি গড়ে তুলবে তখন ইহা বাধ্যতামূলক হওয়া কোন প্রকারেই দোষনীয় হতে পারে না। আর একটা কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার। অনেকে ভাবতে পারেন যে সমর শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে দুর্ব্বল ও সবল, সুস্থ ও রুগ্ন সবাইকেই বুঝি সে শিক্ষা গ্রহন কত্তে হবে। তা কিছুতেই হতে পারে না। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে যদি বলেন যে তার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় সমর-শিক্ষা গ্রহণ করলে শরীরে ক্ষতি হতে পারে তা হলে তিনি অবশ্যই রেহাই পাবেন—জোর জবরদস্তির কথা এখানে কিছুতেই উঠতে পারে না।

বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকৃষ্ট স্থান কিসে ?

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যুবকদের সমাগম হয়। তারাই দেশের বল ভরসা। দেশের মুখ উজ্জ্বল করার ভার ত তাদের উপরই। তাদের ভিতর থেকেই ত বড় রাজনৈতিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি বেরিয়ে দেশের নাম চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দেবে। দেশের এত অবনতি হচ্ছে কেন—এর কারণ কি—এথেকে উদ্ধার পাওয়ার কোন আশা আছে কিনা—থাকিলেই বা কোন পথে চললে এদেশ আবার জেগে জগতের স্বাধীন জাতিদের সমকক্ষ হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে—এরাইত সে পথ নির্দ্দেশ করবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় যাহা বলে অন্যান্য লোকেরা তাই ভাল মনে করে তাদের নির্দ্দিষ্ট পথে চলতে থাকে। কাজেই দেশরক্ষা কত্তে হলে এই যুবকদিগকে অন্যান্য সবাইকে চালিত কত্তে হবে—না হলে অন্য সবাই অনুসরণ করবে কেন? এরা তৈয়ারী না হলে নিরক্ষর জনসমূহকে চালিত করবে কি প্রকারে। কাজেই সর্ব্বপ্রথমেই এই যুবকদের সমর-শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে তৈয়ারী হয়ে থাকা একান্ত দরকার।

বর্ত্তমানে বিশ্ব-বিদ্যালয় কতকগুলি ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও অস্থি চর্ম্মসার যুবক তৈরী কচ্ছে। ওখান থেকে বেড়িয়ে এলে এরা বড় মুস্কিলে পড়ে যায়। সংসারের আপদ বিপদে পড়লে যে শারীরিক শক্তি, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের দরকার তাহা এদের খুব কমই থাকে। কোন পরিশ্রমের কাজ কত্তে বল্‌লে যেন মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যুবকদের পুথিগত বিদ্যার কাহিনী একটা গল্পের ভিতর দিয়া বেশ সুন্দর ভাবেই প্রকাশ করেছেন :—

পাখীটা মরিল। কোন কালে যে কেউতা ঠাহর করিতে পারে নাই।
নিন্দুক লক্ষ্মীছাড়া রটাইল—"পাখী মরিয়াছে।"
ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন—"ভাগিনা একি কথা শুনি?"
ভাগিনা বলিল,—"মহারাজ, পাখীটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।"
রাজা শুধাইলেন—"ওকি আর লাফায়?"
ভাগিনা বলিল—"আরে রাম!"
"আর কি ওড়ে?"
"না।"

"আর কি গায় ?"

"না।"

দানা না পাইলে আর কি চেঁচায় ?"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখীটাকে আনত দেখি।"

পাখী আসিল, সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখীটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, "হু" করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুথির শুকনো পাতা খস্ খস্ গজ্ গজ্ করিতে লাগিল।"

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত আর কিছুই হয় না। মস্তিষ্কের অত্যধিক চালনায় ও শরীরের চালনার অভাবে শীঘ্রই শরীর ভেঙ্গে পরে। মস্তিষ্ক ও শরীর উভয়েরই সমভাবে বিকাশ না হলে মানুষ কিছুতেই শান্তি পেতে পারে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার দোষে এমন দেখা যায় যে প্রায়ই যুবকদের সাঁতার কাটা, লম্ফ প্রদান, দৌড়ান প্রভৃতিতে কোন রকম উৎসাহ বা উদ্যম দেখা যায় না—কর্ত্তৃপক্ষ ও এ বিষয়ে সাধারণতঃ ঔদাসীন্য দেখিয়ে থাকেন। এমন অনেকে আছেন যাঁরা ঐ গুলিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ল—বলার লোভ সাম্‌লাতে পারলুম না :—

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক কৃতী যুবক নৌকায় যাচ্ছিলেন তার এক আত্মীয়ের বাড়ী। পথে যেতে যেতে তার পুথি হতে নানা রকম প্রশ্ন মাঝিকে জিজ্ঞেস কত্তে লাগ্‌লেন। মাঝিত নিরক্ষর কি আর উত্তর দেবে—নিজের অজ্ঞতার কথাই শুধু বলছে।

যুবক জিজ্ঞেস কল্‌লেন, "মাঝি, তুমি দর্শন পড়েছ ?"

মাঝি, "না বাবু, দর্শন অর্শনের নাম আমার চৌদ্দ পুরুষেও শুনছে না।"

বাবু "তবে দেখ্‌ছি, তোমার জীবনের চার আনিই বৃথা।"

বাবু, "আচ্ছা, বিজ্ঞান পড়েছ ?"

মাঝি, "না বাবু, আমি "ক" "খ"ই ল্যাখ্‌তাম পারতাম্ না আবার বিজ্ঞান টিজ্ঞান।"

বাবু, "তা হলে তোমার জীবনের আট আনিই বৃথা।"

বাবু, "আচ্ছা যাক্, সেক্সপীয়ারের নাম শুনেছ ?"

মাঝি, "সেক্সপীয়ার কিতা, বাবু ?"

বাবু, (বিরক্তির সহিত), 'আরে ছাই, সেক্সপীয়ারের নামই শোননি, তোমার দেখছি জীবনের বার আনাই বৃথা।"

কথাবার্ত্তা এইরূপ চল্‌ছিল। এদিকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব দিক অন্ধকার হয়ে এল—আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে পর্‌ল। কিছু পরে দক্ষিণ দিক হতে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগ্‌ল—তারপর ত মহা হুলুস্থূল—নদীতে ঢেউ উঠে নদী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ কর্‌ল। নৌকাখানিত ঢেউতে আছাড় খেতে লাগ্‌ল

যেন ডুব্‌বার বেশী বাকী নাই। এ দেখে ত বাবুর প্লীহা চম্‌কে গেল—চক্ষু কোটরগত—মুখদিয়ে আর কথা বেড়োয় না। এ দেখে মাঝির বড় দুঃখ হল। মাঝি জিজ্ঞেস্ কল্‌ল, "বাবু, নাও বাচাইতাম্ পারতাম্ না। অহন জলে পড়া ছাড়া আর উপায় নাই। আপনি হাঁতার জানুইন্ তো?"

বাবু (অতি ক্ষীণ স্বরে), "না মাঝি, সাঁতার কাট্‌তে কোন দিন শিখিনি।"

মাঝি, "বাবু, এত ল্যাহা পড়া হিখ্যা দেহি আপনের জানের হোল আনাই মাডি।"

বল্‌তে বল্‌তে নৌকাখানা ডুব্‌ল। মাঝি ঝাঁপ দিয়ে অতি কষ্টে গিয়ে পারে উঠ্‌ল। বাবুকে অনেক তালাস করেও আর পাওয়া গেল না—"তিনি হয়ত বিজ্ঞান, দর্শন ও সেক্সপীয়ারের ব্যাখ্যা কত্তে কত্তে অতল জলে নিমগ্ন হলেন।"

এই হল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার অবস্থা। সমর-শিক্ষা প্রচলন কর্‌লে শরীরের চালনায় এদের মাংশপেশী সমূহ দৃঢ় হবে—এরা সুস্থ ও সবল হয়ে দাঁড়াবে। সুস্থ ও সবল শরীর নিয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বেড়ুতে পারলে এরা জগতে অনেক কাজ কত্তে পারবে। মস্তিষ্কের চালনাই হউক বা শরীরের শক্তিই হউক এরা কিছুতেই পশ্চাৎপদ হবে না। আজকাল দেখা যায় বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বেড়িয়ে এসে অনেক যুবক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়—কারণ শুধু মস্তিষ্কের চালনার আধিক্যে জীবনী শক্তি আস্তে আস্তে কম্‌তে থাকে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যুবকগণ যদি শরীর স্বাস্থ্যবান ও সবল রাখ্‌তে পারে তাহলে অকাল মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কমে যাবে সন্দেহ নাই। সমর-শিক্ষা না করে ব্যায়াম করলেও শরীরের শক্তি বৃদ্ধি হতে পারে স্বীকার করি। কিন্তু সমর-শিক্ষার দুটো দিক—যেমন শরীর সবল ও সুগঠিত হয়, অন্যদিকে আবার মানুষকে আত্মরক্ষা করার ও দেশে শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের শক্তি ও কৌশল দান করে।

অনেকে বলেন যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সামরিক-শিক্ষা প্রচলন না করে যুবকদিগকে দেরাডুন কলেজে শিক্ষার জন্য পাঠালেই হয়। কিন্তু তাহাতে ত খুব অল্প সংখ্যক লোক ঢুকতে পারে। কাজেই ভারতবর্ষের মত এত বড় একটা বিশাল দেশের পক্ষে উহা সম্পূর্ণই অপর্য্যাপ্ত। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রচলিত হলে যুবকগণ তাদের সাধারণ শিক্ষার সহিত সমর-শিক্ষাও গ্রহণ কত্তে পারবে। কাজেই তাকে একঘেয়ে মানুষ হতে হবে না—তার দু'দিকই বিকশিত হবে।

সৈন্য বিভাগে আমাদের দেশের রাজস্বের একটা খুব বড় অংশই খরচ হয়ে থাকে। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যুবকদিগকে তাদের সাধারণ শিক্ষার সাথে সাথে যদি সমর-শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে অনেক অল্প ব্যয়েতে সৈন্য বিভাগের কার্য্য অতি সুচারুরূপে পরিচালিত হতে পারে; কারণ সৈন্য বিভাগে তারা 'Second line of defence' হতে পারে। এতে বেকার সমস্যার অনেক সমাধান হবে সন্দেহ নেই। "Indianisation of the army" বলে একটা প্রশ্ন উঠেছে দেশে। গবর্ণমেণ্ট যদি বাস্তবিকই ঐ কথা কার্য্যে পরিণত কত্তে আন্তরিক ইচ্ছা করেন তাহলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়ে সমর-শিক্ষা দিলে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। যে টাকা বেঁচে যাবে তাহা অনেক লোক-হিতকর কার্য্যে খরচ হতে পার্‌বে—তাতে দেশের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হবে সন্দেহ নেই।

উপসংহার

আমরা যে দিক দিয়েই বিচার করে দেখি না কেন বাধ্যতামূলক সমর-শিক্ষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রচলিত হলে দেশের বহু কল্যাণ সাধিত হবে। যাঁরা এর পক্ষপাতী নন্ বুঝতে হবে তাঁদের স্বাদেশিকতার উপর সহানুভূতির সম্পূর্ণ অভাব।

দেশের পূর্ব্বগৌরব ফিরে পেতে হলে যুবকদেরই চেষ্টিত হতে হবে। এরা যদি সবল ও সর্ব্ব বিষয়ে সুদক্ষ না হয় তা হলে দেশের উন্নতির আশা কোথায়? দেশের যুবকবৃন্দ সমর-শিক্ষায় সুশিক্ষিত হলে দেশে সুশৃঙ্খলা ও শান্তি বিরাজ করবে। আর ভবিষ্যতে কোন শত্রু আমাদের দেশ আক্রমণ করলে তারা বীরের মত অগ্রসর হয়ে শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বে। তারা ভারতটাকে জগতের সমক্ষে শক্তিমান্ ও যুদ্ধবিশারদ করে তুলবে। সমস্ত জগৎ তখন আমাদের দেশটাকে মান সম্ভ্রমের চোখে দেখ্‌বে। 'League of nations" বা ঐ প্রকারের জগতের যে কোন আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান ভারতবর্ষকে সসম্ভ্রমে নিমন্ত্রণ করে তার সৎপরামর্শ ও সাহায্য চাইবে। কাজেই যারা ভারতের ও ইহার যুবকদের কল্যাণ কামনা করেন—স্বামিজীর কথায় বল্‌তে হলে, যাঁরা মনে করেন, "ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী আর ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ"—তাঁরা সমস্বরে ও সর্ব্বান্তঃকরণে নিশ্চয়ই বলবেন যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক সমর-শিক্ষা প্রচলিত হলে দেশের ও দশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

একশত বৎসর পূর্ব্বে কোনও বঙ্গীয় ছাত্রাবাসে বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা।

(শ্রীপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ)

ছাত্রাবাস কথাটা বলা বোধ হয় ন্যায়সঙ্গত হইল না। আজকাল ছাত্রাবাস বলিলেই দ্বিতল কি ত্রিতল বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত সর্ব্বপ্রকার রুচি ও ভদ্রতা অনুমোদিত অট্টালিকা বিশেষ বুঝায়। একশত বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রাবাস অর্থে অধ্যাপকের কয়েকখানা খড়ের ঘর ছাড়া কিছুই বুঝাইত না। সেখানে পঁচিশ জন কি ত্রিশ জন বিদ্যার্থী যুবক অধ্যাপকের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট ঘরগুলিতে থাকিয়া বিদ্যার্জ্জন করিত। ছাত্রদের রুচি ও সভ্যতা কতদূর পরিমার্জ্জিত ছিল তাহার বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা অধ্যাপকের অন্নে প্রতিপালিত হইত এবং তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করিত তাহারা যে বিলাসিতা কিম্বা ব্যয় বাহুল্যের সঙ্গে কিছুই সম্পর্ক রাখিত না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আজও সভ্যতার গণ্ডীর বাইরে পাড়াগাঁয়ে দুই একটি মরণোন্মুখ টোল দেখিতে পাওয়া

যায় ; কিন্তু ইহাদিগকে পূর্ব্বকালের টোলের প্রেতাত্মা বা কঙ্কাল বলিলেও বেশী বলা হয়। সেগুলির তুলনায় এ গুলি কিছুই নয়।

অনেক বিষয়েই বর্ত্তমান টোলগুলি অবনত হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই আগের মত জীবন্ত ভাবে এবং উৎসাহের সহিত কোন কাজই হয়ত আর সেখানে হয় না। তবে, এখনও আমাদের হিন্দু ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনার সময় যে উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা যায়, এমনটা বোধ হয় আর তাহাদের কোন কাজেই দেখা যায় না। সরস্বতী পূজার বহু পূর্ব্ব হইতেই আধুনিক ছাত্রাবাসে চাঁদা আদায়ের ধুম লাগিয়া যায়, এবং পূজা উপলক্ষে খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদ প্রভৃতিতে সর্ব্বসমেত অনূন ৩০০৲ হইতে ৫০০৲ পর্য্যন্ত খরচ হইয়া যায়। আমাদের স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণও এই সময়টায় শাসনের লাগামটা একটু আল্‌গা করিয়া দেন, ছাত্রগণও আনন্দে মাতিয়া যায়। একশত বৎসর পূর্ব্বে আমোদ আহ্লাদের পরিমাণটা কিছুতেই কম ছিল বলিয়া মনে হয় না, আহারাদির ব্যবস্থা যে এখন হইতে অধিক গুরুতর ছিল তাহাতে ত আর সন্দেহই নাই। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে যাত্রাগান বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। আবার কোথাও বা ছাত্রগণ নাটকাদিরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। কিন্তু সে সময়ে ছাত্রগণ যে কেবল গানের অনুষ্ঠান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত তাহা মনে হয় না ; তাহারা সুচারুরূপে নৃত্যাদিরও ব্যবস্থা করিত। কিন্তু এখন যাহা ৩০০৲ টাকায়ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠেনা, সেই সময় তাহা ২৫৲ হইতে ৩০৲ টাকার মধ্যে সম্পূর্ণ-রূপে অনুষ্ঠিত হইত। আজকাল আমাদের একখানা সুন্দর প্রতিমা গড়াইয়া নিতেই কুম্ভকার বা গণক ব্রাহ্মণকে ৩০৲ হইতে ৫০৲ দিতে হয়।

নিম্নে যে ব্যয়ের তালিকাটি প্রদত্ত হইল, তাহাতে মোট সংগৃহীত টাকার পরিমাণ ২৭।৶০ ও ব্যয়ের পরিমাণ ২৭/০।

আয়ের মধ্যে স্থানীয় জমিদার ও সঙ্গতি-সম্পন্ন ভদ্রলোকদের নিকট হইতে সংগৃহীত চাঁদার পরিমাণই ১৩৲। ব্যয়ের সম্পূর্ণ তালিকাটি না দিলেও, যাহা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই পাঠক পাঠিকাগণ সেই সময় জিনিষপত্রের মূল্য ও জনপ্রতি জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কতটা ব্যয় করা আবশ্যক হইত তাহার একটা মোটামোটি অনুমান করিয়া নিতে পারিবেন। সেই সময় যে খাওয়া পরা একটা লোকের চিন্তার বিষয় ছিল, তাহা মোটেই অনুমানে আনা যায় না।

প্রতিমা ··· একখানা ... ... ১৲ টাকা।

বস্ত্র ··· এক জোড়া ... ··· ১৸০ টাকা।

[কাপড়ের মূল্যটা খুব কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে হয়ত চরকা হইতে সূতা সংগ্রহ করিয়া জোলাদের সাহায্যে কাপড় প্রস্তুত করাইবার খরচ সামান্যই ছিল।]

ছাগ ... দুইটী ... ... ১৷৷০ টাকা।

[এখন আর সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বলিদান বড় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের পাঠক পাঠিকাগণ দুইটী ছাগ ১৷৷০ টাকায় পাওয়া যাইত জানিয়া নিশ্চয়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।]

আতব তণ্ডুল	...	।৶ (তের সের	...	।০ (চারি আনা)
সিদ্ধ চাউল	...	৸০৴ (ত্রিশ সের)	...	॥০ (আট আনা)
চিড়া	...	॥০৴ (আধমণ)	...	॥০ (")
গুড়	...	।০৴ (দশ সের)	...	॥০ (")
চিনি	...	৴৭ (সাত সের)	...	১৲ (এক টাকা)
বাতাসা	...	৴৩॥ (সারে তিন সের)	...	॥০ (আট আনা
খাজা	...	৴২ (দুই সের)	...	।০ (চারি আনা)
মোণ্ডা	...	৴৮ (আট সের)	...	২৲ (দুই টাকা)
গোল্লা	...	৴৩ (তিন সের)	...	১৲ (এক টাকা)
ময়দা	...	॥০৴ (আধ মণ)	...	১৵০ (এক টাকা দুই আনা)
ঘৃত	...	৴৫॥০ (সাড়ে পাঁচ সের)		২৲ (দুই টাকা)
ছানা	...	৴১ (এক সের)		৵০ (দুই আনা)
দুগ্ধ	...	১।০ (সোয়া মণ)	...	॥০ (আট আনা)
অরহর	...	৴১ (এক সের)	...	৴০ (এক আনা)
খেসারী	...	৴৫ (পাঁচ সের)	...	৶০ (তিন আনা)
বুট	...	৴১ (এক সের)	...	৴০ (এক আনা)
তৈল	...	৴৪ (চারি সের)	...	॥০ (আট আনা)
লবণ	...	৴২॥ (আড়াই সের)	...	।০ (চারি আনা)

[লবণের মূল্য এখন হইতেও বেশী ছিল সন্দেহ নাই।]

আলু	...	৴১ (এক সের)	...	৻১০ (দুই পয়সা)
পান	...	(দশ বিড়া)	...	৴৫ (পাঁচ পয়সা)
সুপারী	...	৴১ (এক সের)	...	৴০ (এক আনা)
ধূপ	...	৴১ (এক সের)	...	৻১০ (দুই পয়সা)
তামাক	...	৴২ (দুই সের)	...	৵০ (দুই আনা)

(হয়ত তামাক পাতা)

টীকা	...	৫০০ (পাঁচ শত)	...	৻৫ (এক পয়সা)
আদা	...	৴১ সের	...	৻৫ (এক পয়সা)
মৎস্য	...	পরিমাণ লেখা নাই	...	।০ (চারি আনা)
নর্ত্তকী	...	একজন	...	৩৲ (তিন টাকা)
গায়ক	...	একজন	...	।০ (চারি আনা)

শাঁক	...	একটি	...	।/০ (এক আনা)
বাদ্যকর	...	... ...	...	৷৷০ (আট আনা)
পুরোহিতের দক্ষিণা		... ...	...	১৲ (এক টাকা)
বাদ্যকরের ইনাম		... ...	...	।০ (চারি আনা)
			...	... ইত্যাদি। ... ...

উপরোক্ত তালিকা দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে একটি লোক এক টাকা হইতে পাঁচসিকার মধ্যে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত এবং অন্ন-সমস্যা তাহাদের একটা চিন্তার বিষয়ই ছিল না। বাৎসরিক দোল, দুর্গোৎসব, পূজা পার্ব্বণ এখন লোকের আর্থিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন এক প্রকার দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। ফলে, এইসব উৎসবে দেশে যে অল্পাধিক পরিমাণে একটা অর্থাদির বণ্টন হইত, তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। যাঁহারা এখনও পৈতৃক নিয়ম অনুষ্ঠানাদি কষ্টে সৃষ্টে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা পূজা পার্ব্বণাদি সম্মুখে উপস্থিত হইতেছে মনে করিয়া একটা ত্রাস অনুভব করেন। সুতরাং পূজাদি উপলক্ষে সেই স্ফূর্ত্তির বিকাশ ও বিমল আনন্দ দেশ হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। অতিথি সেবা ত দেশ হইতে একপ্রকার বিদূরিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অর্থ ও অন্নসমস্যায় আমরা আমাদের পিতা, পিতামহ প্রভৃতির তুলনায় দিন দিন কৃপণ ও অধার্ম্মিক হইয়া দাঁড়াইতেছি।

ফটোর কাগজ।

(শ্রীসুখেন্দ্র চন্দ্র পাল)

জন্ম আমার বিলেতে, মফঃস্বলের এক কাগজের কারখানায়। খুব ছোট বেলাতেই লণ্ডনের এক মস্ত ব্যবসায়ী আমার আর আমারি মত এক গাদা ছেলেকে তার দোকান বাড়ীতে নিয়ে এসেছিল। সে এক প্রকাণ্ড বাড়ী। ছোট বেলার কথা প্রায় সবই ভুলে গেছি, তবু লণ্ডনের সে বাড়ীটার কথা বেশ মনে পড়ে। বড় রাস্তার উপরে ট্রাম, মোটরের ঘড়্ঘড়ানির পাশে দাঁড়িয়েছিল, দৈত্যপুরীর মত বাড়ীটা,—কী প্রকাণ্ড! পাশে রাস্তায় লণ্ডনের কোলাহল-মুখর জনস্রোত বয়ে যেত বিরামহীন গতিতে পাহাড়ি নদীর স্রোতের মত দ্রুত তালে। কাজের ডাক এসেছে,—দাঁড়াবার সময় নাই যে, মানুষের আর মেসিনের কর্ম্মকোলাহল কানে ঝালা পালা লাগিয়ে দিত,—গর্জ্জনমান জল প্রপাতের মত। নিশি দিন ঘড়্ঘড়্,—ভোঁ ভোঁ—সহস্র রকম গণ্ডগোল! লণ্ডনের এ দৈত্যাকারার কল কোলাহল আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ত না;—কাজ আর কাজ, কাজ ছাড়া যেন লোক গুলো আর কিছুই জান্‌ত না।

একদিন শুন্‌লেম আমাদের দলকে তোমাদের এই বাংলা দেশের কল্‌কাতায় পাঠানো হচ্ছে ! ক'সে প্যাকেট বাঁধা হ'ল, প্যাকেটের গায়ে ঠিকানার 'ছাপ' মারা হ'ল,--তারপর হ'ল যাত্রা ! জাহাজে চড়ে সাগরের দোলা খেতে খেতে, আর ফেণিল উচ্ছ্বাসের মুখর গান শুন্‌তে শুন্‌তে, পৌঁছলেম এসে শেষে তোমাদের এই বাংলায় ! বাংলায় যে আমার আস্‌তেই হবে ; এখানেই যে আমার প্রাণহীন কাগজ জীবনের প্রাণসঞ্চার, এখানেই যে আমার ফটো-জীবনের সার্থকতা ! এই সপ্রাণতা আর সার্থকতার কথাই আজ তোমাদের বল্‌তে বসেছি ;—তোমরা কি সামান্য কাগজের এ মর্ম্মকথা শোনবে ?—তারপর কি বল্‌ছিলেম, হ্যা—কল্‌কাতায় পৌঁছে কিন্তু আমাদের উঠ্‌তে হ'ল আবার এখানকার এক বড় দোকানে,—আবার সে ট্রাম-মোটর, আবার সে কলের ধূয়া, আবার সে ঘড়্‌ঘড়ানি ; জ্বালাতন ;—কল্‌কাতাকেও তোমরা লণ্ডনের সে দৈত্যপুরী করে তুল্‌লে দেখ্‌ছি !—যাহোক্ দুদিন পরেই কিন্তু ভাগ্য আমার ফির্‌ল,—ফটোগ্রাফার 'দত্ত' আমায় আর আমার কয়জন বন্ধুকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এলেন !

* * * বড্ডো চমৎকার দত্তের এ বাড়ীটা ! সহর ছাড়িয়ে গঙ্গার পারে বাড়ী ;—সাম্‌নে গঙ্গার জল-খেলার কলগান আর আশে পাশে গাছে ভরা মাঠ। নির্জ্জন বাড়ী,---মানুষের মধ্যে 'দত্ত' আর তার বুড়ো বামুন ঠাকুর। বাড়ীর উঠানে বাগান, ছাদে বাগান ;—বুড়ো 'দত্ত' বসে বসে ছবি আঁকেন ;—নিয়ত কবিতা লিখেন ! বেশ লাগ্‌ত আমার এ বুড়ো 'দত্ত'কে !

মাঝে মাঝে 'দত্তর' বাড়ী ফটো নেবার জন্যে লোক আস্‌ত। 'দত্ত' নাকি নামজাদা ফটোগ্রাফার ছিলেন, বুড়ো বলে কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়েছেন ; তবে এখনও তাকে অনুরোধে পরে দু' একটা ছবি নিতে হয়। কচি কচি ছেলে মেয়ে, তরুণ তরুণী, বুড়ো বুড়ীরা সব তাদের ছবি নিতে আস্‌ত,—তাদের সে ক্ষণিকের মুখের হাসি বা দুঃখের ব্যথার স্মৃতিকে তারা কাগজের বুকের ছবিতে অটুট করে ধরে রাখ্‌তে চাইত। বুড়ো 'দত্ত' আমার এক একজন বন্ধুকে নিয়ে মানুষের হাসি কান্নার সে ছাপ তার বুকে এঁকে দিতেন। মানুষ তাকে যত্ন করে নিয়ে যেত ;—কারণ তার বুকে যে দেখ্‌ত —মা তার খোকা খুকীর হাসি, তরুণ তার তরুণী প্রিয়ার চাউনি, আর ব্যথিত তার অতীত প্রিয়ের স্মৃতি ! স্মৃতিকে ছবি করে ধরে রেখেছিল মানুষের সুখ, আর সে স্মৃতির ছাপ বুকে করে ছিল আমাদের আনন্দ !

একদিন এ আনন্দযজ্ঞে আমারও ডাক পড়্‌ল। চিরন্তন মিলনের যুগল-মূর্ত্তির মত দুই তরুণ তরুণী এলো তাদের ছবি নিতে,—আমারি বুকে পড়্‌বে আজ এদের ছাপ ! কি বিমল সৌন্দর্য্য, কি অপূর্ব্ব মিলন এই তরুণ তরুণীর ! মিলনের এমন নিবিড় অটুট বন্ধন, প্রীতির এমন উচ্ছ্বসিত মধুর হাসি আমি কখনো দেখিনি। এ যেন নিজকে নিঃশেষ করে অপরের হাতে সঁপে দেওয়া,—তাই বুকে এদের এত আনন্দ, তাই মুখে এদের মিলন-তৃপ্তির এ প্রাণ-খোলা হাসি !......এই প্রেমময় মিলনের প্রাণময় প্রতিমা বুড়ো দত্ত আমার এ প্রাণহীন বুকে এঁকে দিলেন ;—আমার কাগজ-বুকে তরুণ তরুণীর এই মুখোমুখী চাওয়া প্রীতিভরা চোখে হাস্‌তে লাগ্‌ল !

তরুণী তার নীল শাড়ীর আঁচলে জড়িয়ে আমায় তাদের বাড়ী নিয়ে এলো,—স্বচ্ছ কাচের আবরণে

সোনালী ফ্রেমে আট্‌কিয়ে আমায় তারা তাদের শোবার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখ্‌লো! সুন্দর ধপ্‌ধপে ঘরখানি ;— ... ...

* * * * *

তার পর ?— নব জীবনের উচ্ছ্বসিত প্রেমের বক্ষচাপা ঢেউয়ে তরুণ তরুণী ভেসে গেল! আদর আব্দার অভিমানের শতরূপ প্রেম লীলা আর পরিপূর্ণ মিলনের তৃপ্তিভরা হাসি খেলা ঐ দুজনের জীবনকে মধুময় করে তুল্‌ল। তরুণ তরুণী প্রায়ই এসে আমার বুকে আঁকা তাদের সে প্রথম-মিলনের প্রেম-প্রতিমার দিকে চেয়ে থাক্‌তো,—ছবির সে সলাজ মধুর হাসি তাদের চোখ-মুখ রাঙ্গিয়ে দিত, সে সুখ-স্মৃতি তাদের তরুণ বুক ফুলিয়ে দিত। তাদের প্রত্যেক কথা বার্ত্তায়, পড়া শুনায়, গানে গল্পে আর কাজে কর্ম্মে বয়ে যেত একটা প্রীতি-ভরা আনন্দ-উচ্ছ্বাস! এম্‌নি পূর্ণ মিলনের পরিপূর্ণ সুখে কাট্‌ছিল তাদের দিনগুলি।

* * বছর চারেক পর মিলনের প্রথম নির্ম্মাল্য এক নূতন অতিথির আগমনে তাদের সে সুখের দিনগুলি আরও সুখময় হ'য়ে উঠ্‌লো ;—এ শিশু অতিথির আদর আব্দার আর পরিচর্য্যায় এরা যেন মেতে গেল। তরুণী-মায়ের কোলে এ সুকুমার শিশু—বেশ দেখাতো! মা তার শিশুকে নিয়ে আদর কর্‌তে কর্‌তে আমার বুকের ছবির কাছে এসে দাঁড়াতো—শিশুর মুখের আর ছবির মুখের সাদৃশ্যগুলি দেখ্‌ত আর হেসে হেসে তরুণকে বল্‌ত,—দূরে বই-হাতে তরুণ শুধুই হাস্‌তো। কী হাসিভরা আনন্দময় ছিল সে দিনগুলো!

* * * *

হিংসুক বিধাতার কিন্তু এ আনন্দ বেশী দিন সইল না! শিশুর জন্মের বছর তিনেক পর কোন্‌ অদৃশ্য নিষ্ঠুর হস্ত যেন সে তরুণ যুবককে তরুণীর বুক থেকে ছিকিয়ে নিয়ে গেল! উঃ! কী করুণ সে কাহিনী! তরুণীর সেদিনকার সে ব্যথাতুর চেহারার কথা মনে হ'লে এখনও আমার গা শিউরে উঠে! কী শূন্য উদাস দৃষ্টি! কী ব্যথাভরা আকুল অশ্রু! সর্ব্বস্ব-হারা বিধবার সে দীর্ঘ শ্বাস, সে করুণ বিলাপ, সেই আছড়িয়ে পড়ে কান্না—উঃ এখনও আমি চম্‌কে উঠি! কী নির্ম্মম তোমাদের বিধাতা! একটা ক্ষুদ্র কোমল নারী-হৃদয় এমন করে ভেঙ্গে চূরমার করে না দিলে কি তাঁর চল্‌ছিল না? হায়,—কেমন করে এমন হ'ল? সংসারের এক কোণে এই এক জনের এমন মরণ না হ'লে কি বিশ্ব-সৃষ্টি উল্‌টে যেতো? কেন এমন হয়? পরিপূর্ণ সুখের পর এ ব্যথা-ভরা রিক্ততা তরুণী বিধবা কেমন করে সইবে গো কেমন করে সইবে?

* * * *

তরুণীর চেহারা সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে, তার ঘরের চেহারাও বদ্‌লে গেছে! তরুণীর সে চঞ্চল হাসি আর নাই,—সে এখন গম্ভীর শুচি বিধবা মাতা। পিয়ানো, সেতার, টেবিল আয়না সমস্ত সে এ ঘর থেকে সরিয়েছে। এ ঘরে করেছে সে তার পূজার আসন,—আর সে আসনে বসিয়েছে আমারি বুকে আঁকা তার সে প্রিয়তম স্মৃতি-প্রতিমা! বিধবা আজ সে স্মৃতির পূজারিণী! রোজ স্নান করে এসে গলায়

আঁচল দিয়ে সে এখানে প্রণাম করে,— আর জল-ভরা চোখে তার প্রিয়ের দিকে চেয়ে থাকে। কী সে দৃষ্টি! কী সে সাধনা! সমস্ত মন দিয়ে যেন এ চাউনি! এ যেন সে তার প্রিয়ের সাথে কথা কইছে, ওই, ওই, যেন ছবির ঠোঁট কাঁপছে,—আমি যেন আমার কাগজের দেহেও সে স্পন্দন অনুভব কচ্ছি। হিন্দুর প্রেম-পূজার কথা শুনেছিলুম, কিন্তু এমন পূজার কথা ভাবতেও পারিনি।

* * * আমি ভাবি আমার ফটো-জন্ম সার্থক হ'ল। এই যে এক নারী-হৃদয়-মথিত-করা প্রেম-স্মৃতির অর্চ্চনা—আমি যে হ'তে পেরেছি তার প্রিয়ের আসন,—আমারি বুক পুড়িয়ে যে আঁকা হ'য়েছে তার এ প্রিয়-স্মৃতির ছাপ! ধন্য আমি, ধন্য আমার এ ফটো জন্ম!

* * * কত বছর কেটে গেছে। ছেলে এখন বড় হ'য়েছে, কলেজে পড়ে। নারী কিন্তু এখনও রোজ এ'সে এখানে তেম্‌নি প্রণাম করে, তে-ম্‌-নি করে চেয়ে থাকে। সমস্ত পৃথিবীর কতই না পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু নারীর মনের সে পূজা আর আমার বুকের সে স্মৃতির ছবি একটুও বদ্‌লায় নি, একটুও ম্লান হয় নি! আমার বুকের তরুণ তরুণী এখনও তেম্‌নি হাস্‌ছে!

* * * আমি ভাবি আমি না থাক্‌লে এ নারীর দিন কেমন করে কাট্‌ত!—তোমরাই বল, তা' হ'লে কি সে এ শোক সাম্‌লাতে পার্‌ত? এ ভার বইতে পার্‌ত? আমার বুকে যে সে তার প্রিয়কে তেম্‌নি কাছে কাছে পেয়েছে, তাইত তার প্রেম-সাধনা মরণ-ভেদ টুকুকে ভেঙ্গে ফেল্‌তে পেরেছে! এতে কি তার কম শান্তি!

* * * ওগো মানুষ, নিজের বুক পুড়িয়ে আমরা যে তোমাদের সমস্ত সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্নার স্মৃতির বোঝা বই,—তোমরা কি আমাদের কথা একটুও ভাব?

ফুলবালা।

[শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র গুহ বি, এস-সি]

তার বাম বাহু বেড়ি' ফুলের মালায়
ডান করে ল'য়ে সাজি,
নিতি গিরিডি সহরে ফেরি করে ফিরে
বেচিতে কুসুম রাজি।

দূরে পাহাড়ের কাছে ঘর
প্রায় দু'ক্রোশ পথের পর
রোজ ভোর বেলা এসে, সায় বেলা শেষে
ফুল বেচা হ'লে পর
ল'য়ে দিনের বেসাতি, অতি ধীর গতি,
হয়ে ক্ষুধা-জরজর।
দিনে ফুল বেচে যাহা পায়
সব বেসাতি কিনেই যায়
রাতে ভাতে ভাত রাঁধি, সংগোপনে কাঁদি
মায় ঝিয়ে বসে খায়।
মেয়ে খুটী নাটি সেরে, ক্লান্ত শরীরে
শুয়ে প'ড়ে ঘুম যায়।
বুড়ী বসে বসে তারি পাশ
খুলে বেঁধে দেয় কেশরাশ,
কত স্নেহ ক'রে চুমো খায়
ধরে মুখখানা তুলে চায়,
ভাবে "কত দুঃখ পায় দিন কেটে যায়
খদ্দের খুঁজি খুঁজি।
শেষে পেটের দায়েতে সোণার পুতুলি
হারাতেই হবে বুঝি।"

দূরে বাঁশীর সুরেতে উষার রাগিনী
যখন বাজিয়া উঠে,
"ফুলী" বিছানা ছাড়িয়া পাহাড়ে পাহাড়ে
কুসুম চয়নে ছুটে।
সেথা ডালা ভরে তুলে ফুল,
বসে গাথে মালা নাহি ভুল,
পরে ঘরে ঘরে যেচে, ফেরি করে বেচে
কারে মালা, কারে ফুল।
অই ফুলের উপরে দুইটী জীবন,
বুঝিয়াছে নিভুল।

এল সেদিন দুয়ারে মোর
যবে সন্ধ্যা হয়েছে ঘোর
বলে, "সারাদিন ধরে উপবাস করে
মা রয়েছে ঘরে মোর,
কেহ একটি পয়সার নিলনাক' ফুল—"
—নয়নে বহিল লোর।
ডেকে নিয়ে তারে মোর ঘরে
শুনে মিনিট কয়েক ধরে
তার দুঃখের কাহিনী যত
চোখে জল ঝরে অবিরত,—
দিনু একখানি নোট গুজে তার হাতে,
—মুখে চোখে হাসি ফুটে;
রেখে সবগুলি ফুল আমার টেবিলে
চলে গেল বালা ছুটে।

সেই মাতালগন্ধ কুসুম সুবাসে
ঘরখানি দিল ভরে;
আমি থরে থরে ফুল সাজায়ে রাখিনু
অতীব যতন করে।
বালা পরদিন পরভাতে
এল ফুলভরা সাজি হাতে
দিল হাসিভরা মুখে, প্রাণভরা সুখে
একগাছি মালা হাতে,
কিন্তু পয়সা সে দিন নিলনাক' বলে,—
"বড় পাপ হবে তাতে;—
কাল ভিখারিণী এলে ঘরে
তার পাত্রখানি দিলে ভরে
আজ কেমনে ভুলিবে কালিকার কথা—"
মুকুতা পড়িল ঝরে।
দূরে পাথরের মত রইনু দাঁড়া
অবাক বিস্ময়ভরে।

আমি সাজি হ'তে দুটো ফুল
নিয়ে করে যেন কত ভুল,
তার কবরীতে দিনু গুঁজে,
ধীরে চলে গেল কিবা বুঝে,—
তার লাল-হ'য়ে-উঠা মুখখানি মোর
বুকখানি দিল ভরে।
বালা কেড়ে নিয়ে গেল কি জানি আমার,
মন প্রাণ নিল হরে।

আমি আপনার মনে বসি গৃহ কোণে
আঁকিতেছিলাম ছবি ;
যবে পূরব গগন রঙ্গিণ করিয়া
উঠিল উষার রবি।
"ফুলী" চুপি চুপি ঘরে আসি
মোর সমুখে দাঁড়াল হাসি
মম কণ্ঠে পরাল মাধবীর মালা
—গন্ধ ফুলের রাশি।
বলে, বাহুলতায় মোর কণ্ঠ জড়ায়ে
"তোমা বড় ভালবাসি।"
তার হাসি ভরা মুখখানি
টেনে বুকের ভিতরে আনি
হেসে দিয়েছিনু তার বিম্ব অধরে
চুম্বনের রেখা টানি,
তার ভৎর্সনা-ভরা চাহনি দেখিনু
মুখে নাহি ছিল বাণী।
এল প্রেমের মূরতি ধরি
গেল অপরাধী মোরে করি,

আর আসে নাই কভু ফিরে
দূরে দেখিয়াছি যায় ধীরে
হায়! কোন্ দেশে আছে প্রেমের কি রীতি
জানি নাত আর সবি!
এবে পাহাড়িয়া দেশে স্মৃতির আবেশে
দিবা নিশি আঁকি ছবি।

সত্য-পীরের পাঁচালী।

[শ্রীশ্রী.................]

মাসের উনত্রিশটা দিন ভবিষ্যতে বহুমূত্র উপেক্ষা করিয়াও আলুর ঘেঁট দ্বারা কোনও প্রকারে দেহরক্ষা করিবার পর ত্রিংশৎ দিবসে যখন শুনা গেল ম্যানেজার বহু সঙ্গত কারণেই ফীষ্ট্ দিতে পারিবেন না, তখন যুগপৎ ক্রোধে ও দুঃখে সত্যেশের অন্তরাত্মা ফাটিয়া যাইতেছিল। সে তাড়াতাড়ি নিজের কোঠায় গিয়া অতি সংগোপনে রক্ষিত হুঁকায় দম দিয়া দিয়া আট ছিলিম তামাক ভস্ম করিয়া ফেলিল। যৎকিঞ্চিৎ প্রতিহিংসা সাধন করিয়া, সে বারান্দায় আসিয়া পারদর্শিতার সহিত যখন ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যে বহু লোভনীয় বস্তু উৎসর্গ করিয়া ফেলিতেছিল, তখন তাহাকে ধরিয়া কোঠায় লইয়া যাওয়া ছাড়া উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না। সারাদিনই প্রায় বৃষ্টি ছিল। সুতরাং হোষ্টেল ছাড়িয়া আর বাহির হইলাম না। চাকরকে দিয়া কিছু গরম গরম হিং দেওয়া কচুরী আনাইয়া এক টাম্বলার চা সহকারে উদরস্থ করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তাপ সৃষ্টি করিয়া লইলাম। তাহার পর কি করি? যোগেনের কোঠায় যাইতে যাইতে দেখিলাম দারোয়ানের হাতে একখানা নোটীশ। পড়িয়া দেখা গেল রসদ বিভাগ হইতে রাত্রে খেচরান্ন ঘোষণা করা হইয়াছে; অবশ্যি, সেটা মসূর ডালের কি ছোলার ডালের সে বিষয় কোনও উল্লেখ নাই। যা হউক, "অর্দ্ধং ত্যজতি" স্মরণ করিয়া সকলই যেন কিছু চাঙ্গা হইল। গামলা প্রমাণ হাতায় সোপকরণ চৌদ্দ হাতা খিচুরী একা সত্যেশই অবলীলাক্রমে তুলিয়া ফেলিতে পারিত এইরূপ জনশ্রুতি ছিল। সুতরাং সত্যেশের নাচ দেখিবার লোভ হইল। দলবল সহ তাহার কোঠায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সে মহাব্যস্ত। তেল, চিনি ও চায়ের সমবায়ে প্রস্তুত অর্দ্ধ ইঞ্চি মোটা গালিচায় ঢাকা টেবিল খানা হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া বারান্দায় ফেলিতেছে, এবং পুঁথি পত্র, ছাতা বাক্স, সমস্তই টেবিলটার উপর টানিয়া টানিয়া ফেলিতেছে। বারোয়ারী কাজের চাপে ক্ষিপ্ত পড়ুয়াদের মত অত্যধিক কর্ম্মকুশলতায় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া সে মুখে মুখে প্রকোষ্ঠবাসীদের ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেছিল তাহার কাছা খুলিয়া অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটের

টুকরা, টিকের কালি, অর্দ্ধ সিদ্ধ চায়ের পাতা, বিলাতী দুধের কৌটা ও কলসীর জল এই সমস্ত সহ এক কোণ হইতে অন্য কোণ পর্য্যন্ত ঝাঁট দিয়া ফেলিতেছিল। আমি তুলিয়া দিতে যাওয়ায় তাহার চৈতন্য হইল। লাফাইয়া উঠিয়া তার ঘরের সাথী বেচারার ঘাড়ে গিয়া পড়িল, যেন তাহারই সমস্ত দোষ। সকলে মিলিয়া তাহাকে রক্ষা করিলাম। উদ্যোগপর্ব্ব শেষ হইল।

সমস্ত খাটগুলি একত্র করিয়া দিব্যি ফরাস করিয়া চারিধারে গোল হইয়া বসিয়া পড়িলাম। চিন্তা হইল কি করা যায়? তাস পাশা পুরোণো। গান? তা পুরোণো হলেও যেন আমলকীর আচার——বিশেষ, আসর বুঝিয়া ধরিতে পারিলে একেবারে কাসন্দ! একটা অর্দ্ধ শ্মশানযাত্রী হার্মোনিয়মের জোগাড় হইল, এস্রাজও একখানা দুখানা আসিল। সত্যেশ উঠিয়া গিয়া বাঁশী লইয়া আসিল। সকলে হাঁ হাঁ, করিয়া উঠিলাম। সর্ব্বনাশ তাহা হইলে সমস্তই মাটী! আর সমস্ত সহিতে পারিলেও বড়বাবু (সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট) কি জানি কেন বাঁশীর স্বর সহিতে পারিতেন না। বাঁশী শুনিলেই যেন তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের বিরহ জাগিয়া উঠিত। উজান ত দূরের কথা, তাঁহার প্রাণ চটাং, চটাং, করিয়া লাফাইয়া ৯০ ফুট উর্দ্ধে তেতলায় উঠিয়া পড়িত। সত্যেশ শুনিল না। অগত্যা দরজা বন্ধ করিয়া বাজনা চলিতে লাগিল। মিনিট পনর পরেই শুনিলাম কে কড়া নাড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম——কে? উত্তর আসিল——দরজা খোল। সত্যেশ গম্ভীর ভাবে বলিল——ঢুক্‌নেকো মানা হ্যায়। পুনরায়——দরজা খোল। সর্ব্বনাশ! যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই। বড় বাবুই বটে! কেহ কেহ উঠিয়া মাঝের দেয়াল টপকাইল। সত্যেশের বাঁশী থামেনা। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছিল; হেঁচকা টান মারিয়া তাহার বাঁশী কাড়িয়া লইয়া অতি কষ্টে খাটের নীচে ঢুকিয়া পড়িলাম। সত্যেশ বাঁশী লইতে আসিল। খাটের নীচ হইতে তাহার সঙ্গে টানাটানি করিয়া পৃষ্ঠদেশ ঘর্ষণে ঘর্ষণে বড়ই আপ্যায়িত হইয়া পড়িতে লাগিল। ছাড়িয়া দিলাম। আবার বাঁশী আরম্ভ হইল। ওদিকে ঘন ঘন কড়া নাড়া। আন্দাজে বুঝিলাম বাইরে পাক্‌ড়ার বীজে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট তৈলের ব্যবহার চলিতেছে। দরজা খুলিয়া দিলাম। সত্যেশ আপন মনে বাজাইতেছে, যেন কিছু শুনে নাই। অঘোর বাবু বয়লিং পয়েণ্টে। কোঠায় ঢুকিয়াই সত্যেশের দিকে গম্ভীর ভাবে হাত বাড়াইলেন; ইচ্ছা, প্রথমই বাঁশীখানা বাজেয়াপ্ত করা। সত্যেশ চট্ করিয়া বাঁশীখানা বাঁ হাতে সরাইয়া রাখিয়া ডান হাতে অঘোর বাবুর করকম্পন করিয়া বলিল——Good evening, Sir. Take your seat please.—এই বলিয়া একখানা চেয়ার আগাইয়া দিল। অঘোর বাবু বাক্‌শক্তিহীন! কতক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তারপর হাসি। ওঃ, সে কি হাসি, পেট ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সত্যেশ কিন্তু পা নাচাইতে নাচাইতে সিগারেট ফুঁকিতেছে।

একপর্ব্ব শেষ করা গেল। এখন কি করা যায়? তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইয়া গেল। এক হইতে অন্যের গলা ধাপে ধাপে উঠিতে লাগিল। শেষে দণ্ডবিধি আইনের কোনও কোনও মোটা ধারার আশঙ্কা করিয়া এসিষ্টেণ্ট মহাশয় দৌড়াইয়া আসায় আপোষে মিটমাট হইল। সাব্যস্ত করা গেল যে, আপাততঃ গল্পই চলিতে থাকুক। কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচনের পরই, ক্লাসে প্রশ্ন বর্ষণের ভয়ে অধ্যাপকের চক্ষুর দিকে

না চাহিয়া এদিক সেদিক ঘাড় নাড়াইয়া যেমন বাঁচিবার চেষ্টা হয়, এ ক্ষেত্রেও প্রায় তাই দাঁড়াইল। চুপ্‌চাপ্ থাকা সহ্য করিতে না পারিয়া সত্যেশ অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। খুব একচোট বক্তৃতা ও গালি দিয়া এবং সকলেরই ভবিষ্যতের গাঢ় অন্ধকার পর্য্যন্ত দেখাইয়া দিয়া সে-ই আরম্ভ করিল,—

তখন সবে মাত্র আই, এ, পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। বড় গরম পড়িয়াছে। পরীক্ষার পর কিছুদিন সমস্ত কলিকাতা সহরখানা দৈনিক বারকতক সার্ভে করিয়া, এবং ন্যাশানেল হোটেলের ভীড় ঠেলা, প্যারাগণ ষ্টোরের সরবৎ ও সুকীয়া ষ্ট্রীটের পান যখন আর ভাল লাগিতেছিল না, তখন অগত্যা দেশে যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইলাম। বাড়ীর জন্য অবশ্য বড় একটা মাথা ব্যথা ছিল না। বারকয়েক ম্যাট্রিক ও আই, এ, তে কর্ত্তৃপক্ষ আমায় পুনদর্শনের সদিচ্ছা জ্ঞাপন করায়, আমি ইতি মধ্যেই Experienced undergraduate এর দলেই আসিয়া ঠেকিয়াছিলাম। পরীক্ষার আগে বা পরে—আমি নির্ব্বিকারই থাকিতে পারিতাম; এবং লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি ইহাতে অভিভাবকেরাও বিশেষ চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেন না। যাহা হউক, বাড়ী ত আসিলাম। কিন্তু সময় কাটে কি করিয়া? আলাপের উপযুক্ত একটা লোক বাড়ীতে খুঁজিয়া পাইনা। পাশ বালিশটা লইয়া আহা উহুঃ করিয়া পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া করিয়াও যেন এই গ্রীষ্মকালটা যাইতে চাহিত না। ভাবিয়া চিন্তিয়া দেশোদ্ধার আরম্ভ করিয়া দিলাম। শিশু, বৃদ্ধ, যুবক সমস্ত শ্রোতাকেই দেশমাতৃকার হেড্ আপিস্ হইতে রেডিওফোন সংযোগে অবিলম্বে তাঁহার আহ্বান শুনাইয়া দিবার আশ্বাস দিলাম। টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কখনো কখনো মাকে সশরীরে দেখিয়া ফেলিতাম। এমন করিয়া এক একদিন মায়ের এক এক মূর্ত্তি সকলকেই দেখাইতে লাগিলাম। দিন কাটিতেছিল। ক্রমে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি নামিল। দেখিয়া শুনিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। সকলকে বলিয়া গেলাম যে, বিদেশে মহাত্মার বাণী প্রচার করিতে যাইতেছি। পাথেয় কোথা হইতে আসিল তাহা বলিয়া কাজ নাই। পরে শুনিয়াছিলাম এই সম্পর্কে আমার খুল্লতাত আমার একটা পাকাপাকি বাসস্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু কাকীমার কথায় সে যাত্রা তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। দেশ ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। বিহার প্রদেশটা একবার না বেড়াইলেই নয়। রওনা হইলাম। দেশে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এখানে তখনও অতি গরম। যা হউক, কাজ চলিতে লাগিল। ক্রমে এদিক সেদিক করিয়া অনেক জায়গাতেই গেলাম; অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিলাম। পথে, টাটাকোম্পানীর লোহা গুঁড়া করিবার ঢেঁকি, ষ্টীল্ ফার্নেসের হাতা, পাথর লোহা (ore) টানিবার "কেঁচো-গাড়ী", পাওয়ার হাউসের হুইস্‌ল এ সমস্ত বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিলাম। ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একদিন নোটকেস্‌টায় দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম তাহা হইতে যেন কে বাটপাড়ি করিয়াছে। মাথা ঘুড়িতে লাগিল। ভ্রমণে ইতি দিয়া বক্রী কয়েকটী রজতখণ্ড সম্বল করিয়া ফিরিলাম। টিকিট ত কিনিয়া ফেলিলাম। খাবার পয়সা নাই। প্রায় একদিন লঙ্ঘন দিয়া কোনও রকমে ঝাড়সুগ্‌রা আসিয়া পৌঁছান গেল। বেলা প্রায় আটটা। পেট চোঁ চোঁ করিতেছে। কি করা যায়? হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলিল। তাড়াতাড়ি সুটকেস্‌টা খুলিয়া বাথ্‌রুমে লইয়া গিয়া বাঙ্গালী

পোষাক ছাড়িয়া দিলাম। দিব্যি সাহেব! একখানা সিগার মুখে দিয়া রেলওয়ে রেস্তোঁরাতে সপ্ সপ্ করিয়া উঠিলাম। বাট্‌লার আসিয়া সেলাম ঠুকিল। খাবার আনিতে বলিলাম। খাবার আসিল। কয়েক টুক্‌রা মুখে ফেলিবার পরই ট্যাঁকের কথা মনে হওয়ায়—আমার পেট ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া অর্দ্ধভুক্ত চপ্‌টা——মহালোভ দমন করিয়াও——ফেলিয়া দিলাম; এবং ছুরী ও ফর্কটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, চোখ লাল করিয়া ডাকিলাম—বয়? ৬১ বৎসর বয়স্ক 'বয়", ছুটিয়া আসিল। (দাদার নিকট শুনিয়াছিলাম—"বয়্" কথাটা আইনের Fiction এর মত)। গম্ভীর ভাবে বলিলাম—বাট্‌লাংকো বোলাও। প্রমাদ গণিয়া বাট্‌লার শশব্যস্তে আসিয়া সেলাম ঠুকিল। সেই দিকে নজর না করিয়া তাহাকে, আমি যে তাহার ঠাট্টার পাত্র নহি যে, পূর্ব্ব রাত্রের বাসি জিনিষ দিয়া আমাকে বিদায় করা যাইবে, তাহা সম্যকরূপে সালঙ্কারে বর্ণনা করিলাম। এবং আমি চটিলে তাহার রুটীর বরাদ্দেরও একটা ফর্দ্দ তাহাকে দিলাম। বলা বাহুল্য, খাদ্যে যে ক্রটী ছিল, তাহা পয়সা থাকিলে নজরে আসে না। বহু অনুনয় বিনয়ের-পরও বহু লম্বা লম্বা সেলামের পর তাহার উপর নেক্‌নজর প্রার্থনা করিয়া বাট্‌লার বলিল—গোস্তাকী মাফ্ কীজিএ, হুজুর। এইসা ঔর কভ্‌ভি নেই হোগা। আপ্ দোস্‌রা কোই চিজ, ফ্রুট্‌স উট্‌স ফর্‌মাইয়ে জী। আপ্‌কা খানা তো হোনা চাহিয়েই, ইত্যাদি। ফ্রুটসের কথা মনে হইতেই পেটে দৃষ্টি পড়িল। (পেট ত ভরিতেই হইবে? ইতিমধ্যে) গোলমাল শুনিয়া ম্যানেজার উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া আমার পুনরায় রাগ হইল। খুব ধম্‌কাইয়া তাহাকে "রিমার্কবুক" আনিতে বলিলাম ও তাহাতে মন্তব্য লিখিয়া তাহার চাকুরীর মস্তিষ্কটী চর্ব্বণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলাম। কাচুমাচু হইয়া সে করজোরে তাহার সমস্ত বক্তব্য নিবেদন করিয়া সাহেবের জন্য ফল আনিতে গেল। ফল আসিল, কিন্তু রিমার্কবুকটীও না আনাইয়া ছাড়িলাম না। পরিপূর্ণ ভোজনের পর দেখিলাম গাড়ী ছাড়িবার দশ মিনিট আছে। উত্তম সুযোগ। সিগারেটটী ধরাইয়া তাচ্ছিল্যের ভাবে নোটকেস্‌টা টানিতে টানিতে বিল চাহিলাম ও এক হাতে পেন্সিলটী ধরিলাম। ভৃত্যদ্বয়ের অবস্থা কাহিল। ম্যানেজার বলিতে লাগিল ——Sir, sir, excuse—pardon—mercy.——বুঝিলাম ঔষধে ধরিয়াছে। তথাপি শূন্য নোটকেসটীর মুখ খুলিলাম। ম্যানেজার হাত কি পা ধরিবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। সে আবোল তাবোল বকিয়া যাইতেছিল যাহার একমাত্র অর্থ এই যে, তাহারা কোনও বিল্ দিবেনা। হরি, হরি, হরি! ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। চাকর বাকরদের দৌড়াদৌড়ি লক্ষ্য করিয়া জানিলাম যে, রেস্তোঁরার কর্ত্তৃপক্ষ পরিদর্শনে আসিয়াছেন ও এই কোঠায় আসিতেছেন! চক্ষে যেন সর্ষেফুল দেখিলাম! মা কালীকে নগদ চারি আনা (কি এক টাকা মনে নাই) মানত করিয়া বারান্দায় আসিয়া পড়িলাম; এবং একটী মোটা দেখিয়া সিগার ধরাইয়া পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়া টানিতে লাগিলাম। সাহেব আমার পাশ দিয়া কোঠায় ঢুকিলেন। মিটি মিটি আড় চোখে সাহেবকে দেখিয়া লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু দেখিলাম ম্যানেজার আমার গাড়ীর দিকে পুনঃ পুনঃ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, আর সাহেব আমার কামরার দিকে ফিরিরা দাঁড়াইয়াছেন। তাড়াতাড়ি অন্য কামরায় গিয়া ধরাচূড়া পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর নাম করিতে করিতে

শুইয়া পড়িলাম ও একটা নাম ঠিক করিয়া রাখিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পরের ষ্টেশনে আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিয়া পুলিশের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সত্যেশ একবার রান্নাঘরে তদারক করিতে না গিয়া পারিল না। নন্দগোপাল—তাহাকে আমরা "Beg your pardon" ডাকিতাম। মোটামুটি নামের ইতিহাসটা এই। ক্লাসের অর্দ্ধেক বক্তৃতা হইয়া গেলে সে অতি ব্যস্তভাবে দিবা-নিদ্রায় স্বাস্থ্যরক্ষা শেষ করিয়া ক্লাসে ঢুকিয়া পড়িত। এবং পরে আসিয়াও প্রথম বেঞ্চিতে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটী অবশ্যই দখল করিয়া লইত। এবিষয়ে ক্রমাগত সহিয়া সহিয়া অধ্যাপকেরা তাহাকে ছাড়পত্র দিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর একটু পর পরই দক্ষিণে বামে আকর্ষণ সত্ত্বেও সে, Beg your pardon, Sir, বলিয়া উঠিয়া পড়িত, এবং যত সম্ভব অসম্ভব প্রশ্ন করিয়া তাহার সমস্ত জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া লইত। সত্যেশ চলিয়া গেলে, Beg your pardon তাড়াতাড়ি দুয়ার হইতে তাহার প্রস্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়া বলিল,—"সত্যেশের আর একদিনের কাহিনী বলিতেছি শুন।" বিষয়টা যে গোপনীয় এবং সত্যেশের কর্ণে তাহা পৌঁছিলে তাহার কোনও কোনও প্রত্যঙ্গ বিশেষ ভাবে মর্দ্দিত হইয়া যাইবে তাহা সে আমাদিগকে জানাইয়া রাখিল। সে বলিল,—সেবার সরোজ নলিনীর বিবাহ—। করালীচরণ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—সে কি ? মেয়েছেলের কথা লইয়া আমরা এখানে কি করিব ? এখানে মেয়েছেলের গেট্‌পাস নাই। এ আপত্তি উঠায় Beg your pardon এর বহু যুক্তিতর্ক দেখাইয়া তাহার বন্ধুবরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইল। অতঃপর অনুমতিক্রমে সে আরম্ভ করিল,—সম্প্রদান হইয়া গিয়াছে; স্ত্রী-আচার হইতেছে। কন্যাপক্ষীয়ের সাদর আপ্যায়নে আমাদের পেটের ভিতর দধিমন্থন চলিতেছে। সত্যেশ চুপি চুপি আসিয়া বলিল,—এ দিকে আয়। মনে করিলাম একটা কিছু ব্যবস্থা হইয়াছে। খুব খুসী হইয়া তাহার সঙ্গে গেলাম। সে দুই দালানের মাঝখানে একটী সরু গলিতে লইয়া গেল। বড় ধাঁধাঁয় পড়িলাম। বটে! ইহা ত আহারের সমীচীন স্থান নয় ? সে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—উপরে দেখ। উপরে চাহিয়া দেখিলাম জানালার পার্শে থালে থালে প্রচুর সন্দেশ, রাজভোগ, মিহিদানা। আমার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। ততটা নিরাপদ মনে না করিয়া কেবল বুক চাপ্‌ড়াইতে লাগিলাম, আর সতুর গলা ধরিয়া বলিলাম—"নিশ্চয় মরিব সখি, কেরাসিনে পুড়িয়া।" সে বলিল—চুপ। আমার সঙ্গে চল্। এই বলিয়া সে উপরে উঠিয়া পাশের কোঠায় (বরযাত্রীর বিশ্রামের আড্ডা) চলিয়া গেল। আমি বলিলাম,—শেষটায় * * * * "সাবিত্রী" না পড়িলেই হয়। চট্ করিয়া গালে এক ঘা লাগিল। কাজেই নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিলাম।

ঘর অন্ধকার! পেট ভরিয়া গিয়া সর্ব্বগাত্র পশ্চিমা ধোপার কলপ দেওয়া কাপড়ের মত চট্ চট্ করিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—আর অতি লোভে কাজ নেই ভাই। আমার কাঁধে ভর দিয়া, এক পা সেই কোঠা জানালায় রাখিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল,—এই আস্‌ছি।

উপরে নীচে সমান ভারগ্রস্ত হইয়া আমার দম্ বন্ধ হইয়া যাইবার জোগাড়। হঠাৎ পাশের

কোঠার আলো নিবিয়া গিয়া যেন টুং করিয়া একটু মিঠে শব্দ কানে আসিল। পুনরায় ক্ষীণ আলো। সত্যেশ তাড়াতাড়ি নামিতে নামিতে কি একটা জিনিষ থাবা মারিয়া মুখে পুরিল, এবং তৎক্ষণাৎ কি কারণে নিঃশব্দে বমন রুদ্ধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া আমার ঘাড় হইতে পড়িয়া যায় যায় হইল। খপ্ করিয়া ধরিয়া তাহাকে নামাইলাম। পাশের ঘরে একটা অতি মৃদু চাপা হাসি যেন শুনিলাম। সত্যেশও দেখি তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। বড় খট্‌কা লাগিল, যাইতে যাইতে বলিলাম,—ভাই, শেষে কি খেলি একটুও ত দিলি না? গম্ভীর শব্দে উত্তর হইল—হুঁ! সন্দেহ হইল। সে চলিয়া গেলে আস্তে আস্তে অন্ধকার গলিতে গিয়া দেশলাই জ্বালিলাম। অনেক গবেষণার পর উক্ত ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য পঞ্চগব্যের শ্রেণীভুক্ত বলিয়া স্থির করিতে পারিলাম। বাইরে আসিয়া শুনিতে পাইলাম সত্যেশ টবের ধারে ওয়াক্ ওয়াক্ করিতেছে, তাহার নাকি পেটে ভয়ানক ব্যথা হইয়াছে।———এমন সময় সত্যেশের পায়ের শব্দ হইল। Beg your pardon তাড়াতাড়ি আরম্ভ করিল,—

হাঁ, তারপর হলো কি, পণ্ডিত মহাশয়কে মাঝখানে রাখিয়া সকলে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে প্রাচীন আর্য্যগাথা উদ্ধার করিতেছি। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রজ্ঞা তাঁহার আকার সদৃশ এ কথা বলিতেই হইতেছে। ঘন ঘন স-পুচ্ছ মস্তক আন্দোলিত করিতে করিতে তিনি সায়ং সন্ধ্যার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকট করিতেছিলেন। ঘন ঘন করতালি পড়িতে লাগিল। পূর্ব্বরাত্রে সত্যেশের মন্দাগ্নি হওয়ায় সে আমিষান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এখানে বর্ত্তুলাকার পণ্ডিতমহাশয়টীকে দেখিয়া তাঁহার বড় লোভ হইল। পণ্ডিতমহাশয় তখন ব্রাহ্মণের কর্ণমার্জ্জনা ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে স্বয়ং গঙ্গা overtime-remuneration ছাড়াই যে চব্বিশঘণ্টা প্রবাহিতা, তাহা তিনি যুগপৎ থিয়েটার ও বায়োস্কোপ সহযোগে জলের মত বুঝাইয়া দিতেছিলেন। পুণ্যলাভের এ হেন অনায়াসলভ্য মার্গ দর্শন করিয়া সত্যেশের পরিতাপ হইতে লাগিল। কপালে করাঘাত করিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল,—

হায়, হায় প্রভুগো।
কি মোর কপালে ছিল,
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু

আমি পাদপূরণ করিলাম——"বমন হইয়া গেল!" আমার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া সে পুনরায় আরম্ভ করিল,——সে কি প্রভু! আপনি এত কাছে থাকিতেও আমাদের কলিকাতা দৌড়াইতে হইবে, তা কি হয়? এই বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া পণ্ডিতমহাশয়ের দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিয়া সদ্য গঙ্গাস্নানের মহাপুণ্য·········সঞ্চয়ে অগ্রসর হইল! দেখাদেখি আমরাও গঙ্গাস্নানে চলিলাম! পণ্ডিতমহাশয় লাফাইয়া পনর ফীট্ ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাড়ে তিন পদবিশিষ্ট কেদারাখানি সহ উল্‌টাইয়া পড়িয়া গেলেন। আমরা প্রায় ধরিয়া ফেলি ফেলি! কোমরে যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াও তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দরজার দিকে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিলেন, এবং তারস্বরে আমাদের পিতার ও তাঁহার বয়সের একত্ব দেখাইয়া আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের পিণ্ডাধিকার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সত্যেশ লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া

অগ্রসর হইয়াই চলিল। হঠাৎ একবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া দৌড়াইল—দোহাই প্রভু, অতবড় নদীটা কাঁধে করিয়া দৌড়াইবেন না, মচ্‌কাইয়া যাইবেন। প্রভুগো! —পণ্ডিত-মহাশয় কোনও প্রকারে স্খলিত বসন মুঠায় ধরিয়া পুকুর পাড় দিয়া দৌড়াইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। আমরা স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হাঁপাইতে লাগিলাম।

এতক্ষণে সত্যেশ কোঠায় ঢুকিয়াছে। মাতব্বরি চালে সে ধমক দিয়া বলিল,——যা, যা, ফাজ্‌লামো করিস্ নে। নিজের গল্প ছেড়ে আমার গল্প তুই বল্‌তে আস্‌লি কেন? কোনও উত্তর না দিয়া Beg your pardon তাহার জায়গা ছাড়িয়া দিয়া অন্যস্থানে বসিল। পরম পরিতোষ সহকারে সত্যেশ পুনরায় আসর জাঁকাইয়া বসিল। এক কোণায় ফার্ষ্ট ইয়ারের এক ছোক্‌রা চুপ্ মারিয়া বসিয়া শ্রীশ্রীকথামৃত পান করিতেছিল। বেচারা সদ্য নস্যবিদ্যায় হাত পাকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে——হেঁছ্যো—হেঁছ্যো——। অস্থির হইয়া পড়িলাম। বিমল বলিল—পারিস্ না ত কতকগুলো তামাক পাতার গুঁড়ো নাকে ঢুকাস্ কেন? যতসব বদ্‌নেশা। হাঁচিতে হাঁচিতে ছোক্‌রা বলিল——নেঃ—হেঁঃ—হেঁছ্যোঃ—নেশা নয়, সর্দ্দি করেছে—তাই—হেঁছ্যোঃ। সর্দ্দির এই অসাধারণ মুষ্টিযোগ দেখিয়া সত্যেশ দাঁত খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল——হেঃ, সর্দ্দি করেছে—না তামাক অভ্যাস হচ্ছে? ছোক্‌রা কোনও উত্তর দিলনা। সব চুপ্।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আমি সত্যেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম——বলি দাদা, সেদিকের কতদূর? (সত্যেশ আমাদের চাইতে ৫।৬ বৎসরের বড় ছিল; তাই কখনও কখনও তাহাকে সম্মান দেখাইতাম)। সে বলিল—দেরী আছে। ততক্ষণ কি করা যায়? আবার গল্প! সত্যেশ আরম্ভ করিতেই নিকুঞ্জ বলিয়া উঠিল—দেখ ভায়া, মাঝে মাঝে একটু একটু রস দিও। সব গল্পই কিন্তু আলু পটোলের ডাল্‌না হয়ে উঠ্‌চে। হয় diet বদ্‌লাও, নয় sick diet ধর্‌ব। সত্যেশ হাসিয়া সায় দিল। চারিদিকে একটু চাহিয়া লইয়া, একটু কাসিয়া, সে বলিল—আমার বিয়ের কথাটাই তোদের বল্‌ছি। অবশ্যি নিজের মুখে সে কথা কেউ বলেনা, তবু আমি বল্‌ছি।

আমি বলিলাম—এখানে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষেধ।

সত্যেশ ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—রেখে দে তোর নিষেধ। আমরা কি পর্দ্দানশীন্? আর যদি বা তিনি ঢুকেন, ত এই-ডি-কং নিয়ে ঢুক্‌চেন। বুঝেছিস্? বিশেষ, রসদ বিভাগের কল্যাণে আমাদের ব্রহ্মচর্য্য সাধনা হয়ে গেছে তা জানিস্? মনে পড়িল লেবোরেটারী হইতে অর্জ্জিত "বিকারে" preserve করা স-স্পিরিট্ মৎস্য খণ্ড! যেন এক একটী সাকার Surface! (A surface has got length and breadth but no thickness). চুপ করিলাম। সত্যেশ আরম্ভ করিল।—

কোনও রকমে আই, এ, পাশ করিয়াই পড়া ছাড়িয়া দিলাম। আর পারি না। চেষ্টা চরিত্র করিয়া একটা চাক্‌রী বাক্‌রীও জোগাড় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। এদিকে কাকা মারা যাওয়াতে সংসারও অচল হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়া উঠিল। উপার্জ্জন করিবার মধ্যে কেবল বড়দা। তাও তিনি

আবার মোটে নূতন উকীল—সুতরাং উপার্জ্জনের পরিমাণ আর বলিয়া দরকার নাই। উকীল হইবার পর হইতেই দাদা অর্থনীতির অনেক থিওরীই কাজে লাগাইয়াছেন। উরুদেশ হইতে পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত উভয় পদের ক্রমিক প্রস্থ সমান রাখিয়া স্ট্রীছাঁটের পেণ্টুলন ছাড়া আর কিছু তিনি পছন্দ করিতেন না। ইহা নাকি মাসে মাসে মোজার অপব্যয় হইতে বাঁচিবার অপূর্ব্ব কৌশল! যাহা হউক, দশ হাত ধুতি খানা যথা সম্ভব গুটাইয়া তাহার উপর কতক্ষণ টানাটানির পর উক্ত বেশটী চড়াইয়া ফেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি এক গ্লাস জল ঢক্ ঢক্ করিয়া শোষণ করিয়া ফেলিতেন। অতঃপর কোনও দিন ভাগ্যক্রমে পুরোণো কাপড়ের পাড় দিয়া তৈরী করা কোমর-বন্ধটীর অদর্শন ঘটিলে, তাহার বিরহে এক চোট সমস্ত বাড়ীখানি মাথায় তুলিয়া, একখানা গামছা কি নিদেন, ছেলে পিলের এক খানা কাপড় কোমরে বাঁধিয়া সে-দিনকার কার্য্য সমাধা করিতেন। ইহার পর সুপারীবহুল কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধখানা পান মুখে পুরিয়া কংগ্রেস কমিটি হইতে ক্রীত, কাপড়ের বোতাম লাগানো কোট খানা গায় দিতে দিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে কাছারীতে দৌড়াইতেন। বলা বাহুল্য, রৌদ্রের বহুগুণ জানা থাকায় দাদা ছাতা ব্যবহার করিতেন না। কাছারীতে আসিয়াই পরের উপর খরচ চলিয়া যাইবার স্ফূর্ত্তিতে বর্দ্ধিত পিপাসা বড় হুকাটায় খুব কসিয়া দম দিয়া দিয়া নিবৃত্তি করিয়া ফেলিতেন। অতঃপর একবার এ চেয়ারে, একবার ও চেয়ারে বসিয়া মুনসেফ মহাশয়দের পরকালের সুব্যবস্থা চলিত; কখনও বা দেশ, জাতি ইত্যাদি উদ্ধার হইয়া যাইত। ক্রমে মৌতাত ধরিয়া আসিলে, সকলই যখন টেবিলটাকে পরম ভক্তি সহকারে পুনঃ পুনঃ মস্তক ঠেকাইতেন, তখন দাদা আস্তে আস্তে উঠিয়া কাছারীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বৃক্ষবিশেষের আশে পাশে শীকারের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আর পড়িবই না স্থির করিলাম। অবশেষে খোঁজ করিয়া রেঙ্গুনে এক ব্যবসায়ী পিতৃবন্ধুর শরণাপন্ন হইলাম। চাকুরীও জুটিল। মাসহারা নগদ ৮০৲ তঙ্কা। বেশ দিন কাটিতেছে। পাশের বাড়ীওয়ালা মিঃ নাথ ব্যারিষ্টার। তাঁহার বাড়ীর লোকের সঙ্গে ভাব হইয়া গেল, অবশ্য অন্য আকর্ষণও যে না ছিল তাহা হলপ করিয়া বলিতে পারি না। রোজই সন্ধ্যায় সেখানে চায়ের আড্ডা জমিয়া উঠিত। ছোট হইতেই আমার চেহারা ছব দুরস্ত ছিল সুতরাং মিসেস্ নাথ আমায় বড় আদর যত্ন করিতেন আমারও বড় ভাল লাগিত বিশেষ নাথ-দুহিতা মিস্ প্রতিমা was a celestial beauty! ভাব জমিয়া উঠিল। ৪।৬ মাস পরে সত্যি সত্যিই আমরা শরাহত হইয়া পড়িলাম। দেখিয়া শুনিয়া মিঃ নাথ কন্যা-সম্প্রদানের সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়া ফেলিলেন। বাড়ীতে "তার" করা হইল; দাদা আসিয়া কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া গেলেন। স্থির হইল দুই মাস পরে শুভকার্য্য দৈবানুগ্রহে সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। মহাহৃষ্টমনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া, এবং আপিসের খাতায় উণষাটের সঙ্গে আট যোগ করিয়া একানব্বই ঠিক দিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে বাড়ী ফিরিলাম। ভাবিতে লাগিলাম——আহা! কি সুখ! আর যাহাই হউক ভবিষ্যতে আর খিচুরী খাইবার জন্য ভাবিতে হইবে না।

* * * সন্ধ্যাবেলা চা-চক্রে আমি ও প্রতিমা বসিয়া কখনও স-রব, কখনও নীরব কাহিনী ব্যক্ত করিতেছি। ইতিমধ্যে অষ্টমবর্ষীয় ভাবী শ্যালক আসিয়া খবর দিল, তাহার

পিতামাতা এখন কোনও কাজে ব্যস্ত, সুতরাং আমরাই যেন চা-পান শেষ করিয়া ফেলি। অত্যন্ত পুলকিত হইয়া এই সুবুদ্ধির জন্য মনে মনে তাঁহাদের অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিয়া ফেলিলাম। প্রতিমাও বোধ হয় এমনি একটা কিছু করিয়া থাকিবে। চা পান শেষ হইয়া গেল। শ্যালক চা শেষ করিয়া তিড়িং তিড়িং করিয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়া গেল। মনটা ভরিয়া উঠিল। আস্তে আস্তে প্রতিমার হাত দুখানি নিজের হাতে লইলাম। তাহার জন্য যৎসামান্য টানাটানির দরকার হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অল্প অল্প করিয়া অনেক কথাই হইতে লাগিল। শেষে পছন্দের কথাও আসিয়া পড়িল। সে তাহাতে এমনি নীরব ভঙ্গিতে অনুমোদন করিল যে, আমি একেবারে গলিয়া পড়িয়া তাহাকে টানিয়া অধর সুধা ——, ঠিক এমন সময় লাফাইতে লাফাইতে স-কুকুর শ্যালকের প্রবেশ! চমকিয়া দুই জনই সরিয়া পড়িলাম। কিন্তু হতভাগা সব দেখিয়া ফেলিয়াছে। সে কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া লাফাইতে লাগিল——হ্যাঁ, ছোড়দি, সব দেখেছি। জামাইবাবু চুমো খাচ্ছিল। ওমা, মা, জামাইবাবু——, এই বলিয়া সে উপরে যাইতেছিল। প্রমাদ গণিলাম। লম্ফ প্রদান করিয়া শ্যালকের গ্রীবাদেশ আকর্ষণ করিয়া কাছে আনিলাম ও খাবার, পুতুল ইত্যাদি সমস্ত জিনিষেরই লোভ দেখাইয়াও অকৃতকার্য্য হইলাম। তাহার কণ্ঠস্বর উচ্চতর হইতে লাগিল। মহা ফ্যাসাদে ঠেকিলাম! চট্ করিয়া একটা বুদ্ধি খেলিল। দুই হাতে প্রতিমাকে অর্দ্ধকোলে, অর্দ্ধ টানিয়া লইয়া সামনের কোঠায় চৌকীর উপর শোয়াইয়া দিলাম, এবং চৌকীর নীচ হইতে ঘটি বাহির করিয়া তাহার চোখে মুখে জল ছিটাইয়া দিলাম। একটা কিছু উপায় ঠিক হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া প্রতিমাও একটু সুস্থির হইল। তাহাকে চোখ বুঁজিয়া থাকিতে বলিলাম। শ্যালক এই অভিনয় দেখিয়া এতক্ষণ অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। আমি পাশ ফিরিতেই পুনরায় চেঁচাইয়া দৌড়াইল। আমিও অতি ব্যস্ত হইয়া দৌড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে মিসেস্ নাথের নিকট শ্যালকের পূর্ব্বে গিয়া উপস্থিত হইয়া সবিস্তারে বাগানে প্রতিমার সর্পভীতির উল্লেখ করিলাম ও তাহাকে এক প্রকার অচৈতন্যাবস্থায় আনিয়া হল্‌ঘরে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাদিগকে খবর দিতে আসিয়াছি। মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলে দৌড়াইলেন। ইতিমধ্যে শ্যালকচন্দ্র দন্তবিকশিত করিয়া পিতার নিকট বলিতেছিল—হেঁগো বাবা, জামাইবাবু দিদিকে চু——। চটাং, চটাং করিয়া তাহার গালে কয়েক চাঁটি পড়িল। বেচারা অপ্রত্যাশিত পুরস্কার লাভ করিয়া কতক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।

গল্প শেষ হইতেই আমরা সমস্বরে Bravo, Bravo বলিয়া তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলাম। দ্বিজেশ একেবারে এক কল্‌কি তামাক সাজিয়া হুকাটি তাহার মুখের কাছে ধরিয়া তাহাকে পারিশ্রমিক দিল। পিপাসা মিটাইয়া লইয়া সত্যেশ বলিল,——ওরে ছোক্‌রারা! আর একটা ঘটনা বলেই শেষ কর্‌বো, বুঝ্‌লি? আজ আর নয়।

আরম্ভ হইল।—বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে গবেষণা করিয়া দেখিলাম চিঠি পত্র ছাড়া প্রেম জমিতেছে না। সুতরাং দূরে যাইতে হইতেছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পুনরায় কলেজে আসাই

স্থির করিলাম। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মারফৎ প্রেম যেমন জমে তেমন আর কিছুতেই নয়। বিশেষতঃ, আহা! উৎসর্গীকৃত জন্তু বিশেষের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া যাপন করিবার মত এমন জীবন আর নাই। অধ্যাপকদের ঘনিষ্ঠতাই কি ভুলিতে পারি? বিশেষ করিয়া, বক্তৃতার বিষয় প্রস্তুত করিয়া না আসার দিনে ছাত্রদিগের অন্তরঙ্গ বন্ধু অধ্যাপক মহাশয়ের অযাচিত উপদেশাত্মক—তথা রহস্যাত্মক গল্প! আরও কয়েক মাস পরে সেসনের প্রারম্ভে চাকুরী ছাড়িব কল্পনা করিয়া রাখিলাম। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা তখনই চাকুরী ছাড়িতে হইবে। * * * মনের আনন্দে বসিয়া বসিয়া রিপোর্টবুকের মাঝখানে রাখিয়া সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বের অবস্থা কল্পনা করিয়া এক খানা ছবি আঁকিয়াছিলাম। আমি ডারউইন্ পূর্ব্বেই পড়িয়াছিলাম। ছবির নীচে কয়েক ছত্র পদ্যও লিখিলাম; অতঃপর ইহা সকলকেই দেখাইয়া বাহাদুরী করিতেছি, এমন সময় মিঃ তারাপরিওয়ালা (কারখানার মালিক) আসিয়া হাজির! গম্ভীর হইয়া ডাকিলেন—What is that Mr. Roy? মস্তকের পশ্চাদ্দেশে কণ্ডূয়ণ অনুভব করিলাম। বলিলাম "—Sir, Sir—." All right, let me have it—এই বলিয়া ছবিখানা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

মিঃ তারাপরিওয়ালা আমার শ্বশুরের বন্ধু। বিবাহের পর হইতে আমার চাকুরীরও বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। বাসায় আসিতেই (শ্বশুরালয়েই থাকিতাম) উপরে ডাক পড়িল। বুঝিলাম নালিশ আসিয়াছে। মনটা বড় খারাপ হইয়া গেল। স্ত্রীর সাম্‌নে, বিশেষতঃ নাবালক শ্যালকের সম্মুখে——। কি করি উপায় নাই! উপরে গিয়া দেখিলাম আমার আশঙ্কা সর্ব্বৈব মিথ্যা। সে দিন কি একটা উপলক্ষে বিশেষ খাবার দাবার বন্দোবস্ত। খুসিতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। অন্য দিনের দেড়গুণ আহার করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে গল্প করিতেছি। শ্বাশুরী বলিতে ছিলেন,—কর্ত্তা মফঃস্বল চলে যাচ্ছেন, একদিন তুমিই একটু ছেলেপিলেদের দেখো। এমন সময় শুনিতে পাইলাম টাই বাঁধিতে বাঁধিতে শ্বশুর মহাশয় আমাকে আহ্বান করিয়া এই দিকেই আসিতেছেন। এইবার বুঝি কিল্লা ফতে! চাহিয়া দেখিলাম তাঁর মোটরে দম দেওয়া হইয়া গিয়াছে। যেমনি তিনি কোঠায় পা দিলেন, আমি একটুখানি কাণ পাতিয়া ——যাই——বলিয়া চীৎকার করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরের দিকে চলিয়া গেলাম। ভাবখানা—— জরুরী কাজে কে আমায় ডাকিয়াছে। দেরী করা যায় না ভাবিয়া শ্বশুর মহাশয় রওনা হইয়া গেলেন। কতক্ষণ বাহিরে কাটাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। সন্ধ্যাবেলায় প্রতিমার নিকট হইতে শুনিলাম, ঔৎসুক্য থাকিলেও এ সম্বন্ধে বাড়ীতে আর কোনও আলোচনা হয় নাই। মনটা ঝরঝরে হইয়া উঠিল। অতঃপর শ্বশুর মহাশয় মফঃস্বল থাকিতে থাকিতেই সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া একবারে দেশে আসিয়া পড়িলাম।

এই বলিয়া সত্যেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, এবং আমায় বলিল,———ওরে হৃদেশ, চল্ একবার ঘুরে দেখে আসি উড়ে ভূতগুলো কি কর্‌ছে।"

আমি বলিলাম,—সে কি দাদা, এতক্ষণ বক্তৃতা দিলে, একটা পারিশ্রমিক নেবে না? ততক্ষণে একজন দাঁড়াইয়া সভার পক্ষ হইতে সত্যেশকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। সঙ্গে সঙ্গেঃ———ঢং ঢং ঢং, অনেকক্ষণ—তারপর সিঁড়িতে অবিশ্রাম চটাচট্, চটাচট্ শব্দ।

ভূমিকম্প।

[শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এস্, সি].

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভূমিকম্প সম্বন্ধে আমাদের দেশে নানা প্রবাদ বাক্য চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণ লোকের নিকট ইহা আজও নিতান্ত রহস্যময় ও অমঙ্গল সূচক। বিবিধ কারণ সম্ভূত বলিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ ইহার কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। আকাশে গ্রহ নক্ষত্রের নিয়মিত গতি হইতে সাধারণ গণিত ও জ্যামিতির সাহায্যে অতি প্রাচীনকালেই জ্যোতির্ব্বিদ্যার সূত্রপাত হইয়াছিল; কিন্তু ভূমির কম্পন অনিয়মিত ও অতর্কিত বলিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনও গবেষণা সম্ভবপর হয় নাই। ভূকম্প-পীড়িত দেশসমূহ ভূপৃষ্ঠে অসংলগ্নভাবে বিক্ষিপ্ত; বিশেষতঃ বহুকাল পর্য্যন্ত এ সকল স্থান সভ্যতার কেন্দ্র হইতে দূরে ছিল বলিয়া বিজ্ঞানের অন্যান্য ধারার সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্প বিদ্যার সম্যক পুষ্টি সাধন হয় নাই। ভূতত্ত্ববিদ্যার (geology) সাহায্য ব্যতীত পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না; এবং ভূকম্পবিদ্যারও সম্যক আলোচনা হইতে পারেনা। এই সকল কারণে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাত্র ভূকম্পবিদ্যা প্রকৃতভাবে বিজ্ঞানের গণ্ডীতে প্রবেশ করিয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ইওকোহামা ও টকিও সহরে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহার পর ভূকম্পবিদ্যার আলোচনার জন্য জাপানে বৈজ্ঞানিকদিগের এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর হইতে ইউরোপের নানা শিক্ষা কেন্দ্রে এ বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণা আরম্ভ হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী তাঁহাদের মধ্যে প্রফেসার জন মিল্‌নির (John Milne) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি জাপানে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কালে সেখানে ভূমিকম্প সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন। তাঁহাকে এ বিষয়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রস্তাবনা

ভূমিকম্প প্রায় অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভূমিকম্পের সময় সচরাচর ভূমি গৃহাদি আস্তে আস্তে কম্পিত হয়, কিন্তু কখন কখন উহাদ্বারা ভূপৃষ্ঠ এরূপ প্রবল বেগে কম্পিত হয় যে প্রস্তরাদি স্থানভ্রষ্ট হয়, বৃক্ষাদি উৎপাটিত হয় এবং গ্রাম নগরাদি ভূমিস্যাৎ হইয়া যায়। ভূমিকম্পে লোকের যে ক্ষতি হয় তাহা অতি ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়জনক। পূর্ব্বে প্রায় কিছুই জানা থাকে না; সহসা দূরবর্ত্তী মেঘ গর্জ্জন বা তোপের শব্দের ন্যায় শব্দ হয়, এবং লোকে চমকিত হইয়া দেখে যে পদতলস্থ ভূমি দোলায়মান হইতেছে, ইতস্ততঃ ভূভাগ বিদীর্ণ হইতেছে এবং কোথাও বা বিদীর্ণ হইয়া পুনরায় সংযুক্ত হইতেছে।* কখন কখন নিমিষ মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ নগরাদি ভগ্ন ও সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এবং কখন কখন উহার প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত হইয়া দূরবর্ত্তী প্রদেশেরও অশেষ অনিষ্ট করে। যেমন সমুদ্রে তরঙ্গ হইলে সমুদ্র আলোড়িত হয় এবং জাহাজাদির

ভূমিকম্পের বিবরণ

মাস্তুল ইতস্ততঃ দোলিতে থাকে, ভূমিকম্পকালে ভূমিতেও ঐরূপ তরঙ্গ উৎপাদিত হয়। এই তরঙ্গ একস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ চতুষ্পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

ভূমিকম্পের প্রভাবে কখন কখন ভূমি উন্নত অথবা নিম্ন হইয়া যায়। ১৮৩৫ অব্দে চিলি-দেশের ভূমিকম্পে তত্রত্য উপকূল সহসা দশফুট উন্নত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে মিসিসিপি নদীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অনেকবার ভূমিকম্প হয়; তাহাতে সুবৃহৎ ভূভাগ অনেক নিম্নে বসিয়া যায়। ঐ প্রদেশের কত বৃহৎ বৃক্ষাদি এখনও জলমগ্ন অবস্থায় দেখা যায়।

ভূমিকম্পে অনেক সময় ভূভাগে ঘূর্ণাবর্ত্ত উপস্থিত হয়। সেই সময় মানুষের দাঁড়াইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ছাতকের জর্জ্জ ইংলিস মনুমেণ্ট এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পের ফলে ইহার উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া কতকটা ঘুরিয়া গিয়াছে, তাহা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন বাগানে উত্তর-দক্ষিণ দিকে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষসমূহ পূর্ব্ব-পশ্চিম রেখায় ঘুরিয়া গিয়াছে। রেললাইন, সেতু প্রভৃতি বাঁকিয়া অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে। শিলং এ উয়িলেন স্মৃতিস্তম্ভ যেরূপ ভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহা হইতেও ভূমিকম্পের প্রভাবের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

জাপান, ইটালী, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি অঞ্চলে ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। ভারতের উত্তরভাগে, বিশেষতঃ কাশ্মীর ও বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্ব পার্ব্বতীয় অঞ্চলে উহাদ্বারা মধ্যে মধ্যে অনেক অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে।

১২৯২ সালে রথযাত্রার দিন এই দেশে একটী ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রায় সমুদয় বঙ্গদেশ বিকম্পিত হইয়াছিল। ইহাতে বগুড়া, নাটোর প্রভৃতি অঞ্চলের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই ভূমিকম্পের কয়েক দিন পূর্ব্বে কাশ্মীর অঞ্চলে একটী ভীষণ ভূমিকম্প হয়; তাহাতে তিন সহস্রের অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৩০৪ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় এদেশে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখা অসম্ভব। ইহা প্রায় পাঁচ মিনিট কাল স্থায়ী ছিল। ইহার প্রভাব প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে প্রকাশ পাইয়াছিল। এরূপ বহুদূর ব্যাপী ও দীর্ঘকাল স্থায়ী ভূকম্পন আর কোন দিনও এদেশে ঘটে নাই। ইহার প্রভাবে ক্ষণকালের মধ্যে লক্ষ লক্ষ গৃহ ধরাশায়ী ও অসংখ্য লোক আশ্রয়হীন ও মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

ভূমিকম্প শেষ হইলেই ভূকম্পবিদ্ পণ্ডিতগণের কাজ আরম্ভ হয়। তাঁহারা প্রত্যেক স্থান পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া সেখানে ঘর বাড়ী, প্রাচীর, স্তূপ, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি ভূমিকম্পের প্রভাবে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করেন। স্থানীয় লোকের নিকট হইতে সমস্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করেন। তাহাদের বর্ণনায় যাহা অতিরঞ্জিত মনে হয় তাহা বাদ দিয়া, এবং যাহা বাদ পড়িয়াছে মনে হয়, তাহা পূরণ করিয়া ভূমিকম্পের একটা বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। এই প্রকারে ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থান এবং তাহার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করা যায়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মন এরূপ অসম্পূর্ণতা ও অনিশ্চয়তা নিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল ভূমির কম্পন নির্দ্দেশের জন্য বৈজ্ঞানিক এক প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। আলীপুরের বিজ্ঞানাগারেও এই প্রকারের যন্ত্র সাহায্যে ভূমিকম্প নিরূপিত হইতেছে। যে সকল কম্পন নিতান্ত মৃদু বলিয়া আমরা অনুভব করিতে পারি না, তাহাও এই যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়ে। ভূমিকম্প আরম্ভ হইলে এই যন্ত্র চলিতে থাকে; এবং তাহার উপর কম্পনের রেখাপাত আরম্ভ হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের প্রভাব ও উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। অনেক সময় ভূমিকম্প জনমানবহীন স্থান বা সমুদ্রগর্ভে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এরূপ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত সেই সকল স্থান নির্দ্দেশ অসম্ভব হইত। আজকাল প্রায় সকল শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্দ্রেই এইরূপে ভূমিকম্প নিরূপিত হইতেছে। এক জাপানেই প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় বার হাজার ভূমিকম্প ধরা পড়িয়া থাকে; সমস্ত পৃথিবীতে বৎসরে ষাট হাজারেরও অধিক ভূমিকম্প হইতেছে, অর্থাৎ প্রতি দশ মিনিটেই পৃথিবীর এক একবার কম্পন হইতেছে। আবার ইহাদের মধ্যে প্রায় একশতটাই লোকের পক্ষে অনিষ্টকর ও ভীতিপ্রদ।

ভূমির কম্পন নিরূপণ

এই গেল শুধু স্থলভাগের কথা। পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। আমরা যে সকল ভূমিকম্প অনুভব করিয়া থাকি, তাহারও অনেক সমুদ্রগর্ভে উৎপন্ন হইয়া থাকে; আর কত ভূমিকম্প যে গভীর সমুদ্রতলে উৎপন্ন হইয়া লোকের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইয়াই বিলীন হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভূমিকম্পে সমুদ্রের জল অনেক সময় তীরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায়; তারপর পর্ব্বতাকারে তরঙ্গ তুলিয়া তীর-ভূমির দিকে ফিরিয়া আসে, এবং কূল-ভূমি একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। এই জন্য সমুদ্রের তীরবর্ত্তী স্থানে ভূমিকম্পে যেরূপ অনিষ্ট সাধিত হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না। সমুদ্রে কিরূপ ভূমিকম্প হয় তাহারও মোটামোটি বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। যে সকল জাহাজ সর্ব্বদা সমুদ্রে চলাচল করিয়া থাকে, তাহাদের নাবিকগণের নিকট হইতে যে বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে তাহার উপরই নির্ভর করিয়া এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সমুদ্রে জাহাজ সাধারণতঃ বাণিজ্য-পথ দিয়া চলাচল করিয়া থাকে; কাজেই বিশাল বারিধি বক্ষে যে ভূমিকম্প হইতেছে তাহার বিবরণ নিতান্তই অসম্পূর্ণ।

সমুদ্রে ভূমিকম্প

ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে বহুকাল যাবত বিভিন্ন দেশে নানারূপ মত ছিল। আধুনিক ভূমিকম্পবিদ্‌দিগের মতে দেখা যায় যে ইহার উৎপত্তির কারণ বহুবিধ; সকল স্থানে একই প্রকারে ভূমিকম্প উৎপন্ন হয় না। পৃথিবীর যে সব স্থানে আগ্নেয়গিরি বেশী সেই সকল স্থানে ভূমিকম্পেরও উপদ্রব বেশী দেখা যায়। ইহাতে অনেকেরই বিশ্বাস যে আগ্নেয় গিরির উদ্ভবের সহিত ভূমিকম্পের সম্বন্ধ আছে। ভূমিকম্প ও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গম কালে ভূগর্ভ হইতে বাষ্প, উষ্ণজল ও দ্রব পদার্থ প্রভৃতি উৎক্ষিপ্ত হয়; ইহাতে বোধ হয় যে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপই এতদুভয়ের আদি কারণ। ভূপৃষ্ঠের কোন কোন স্থানে গহ্বর আছে;

ভূমিকম্পের বিবিধ কারণ

তাহাতে জল অথবা অন্যবিধ পদার্থ সঞ্চিত থাকে। গহ্বরের জল ছিদ্রাদি দিয়া অত্যুষ্ণ স্থানে উপস্থিত হইলে বাষ্পে পরিণত হয়। জল বাষ্পে পরিণত হইবার সময় উহার আকার সহসা অনেকগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বাষ্পরাশি যে পথ পায় সেই পথ দিয়াই ধাবমান হয়। উক্ত স্থান হইতে ভূপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কোনও ছিদ্র থাকিলে বাষ্পরাশি সেই পথেই গমন করে; নতুবা নিজ প্রসারণ শক্তিতে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া বহির্গত হয়। যেমন বারুদে আগুন দিলে তদুৎপন্ন বাষ্প আকারে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়া অতিশয় বেগে গুলির সহিত বন্দুকের নলের মুখ দিয়া বহির্গত হয়, ভূগর্ভেও সেইরূপ ঘটনা হওয়াতে অভ্যন্তরস্থ গলিত পদার্থ প্রবল বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়। যে প্রদেশের ভূগর্ভে এরূপ উপদ্রব হয়, সে অঞ্চল সহজেই সঞ্চালিত হইয়া ভূমিকম্প উৎপাদন করে। কখন কখন ভিতরের বাষ্পারাশি ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ পর্য্যন্ত না উঠিতে উঠিতেই পুনরায় তরল হইয়া যায়; এরূপ সময় কেবল ভূমিকম্প হয়, কিন্তু অগ্ন্যুদ্গম হইতে পারে না।

আগ্নেয় গিরির উদ্ভব ব্যতীতও অনেক স্থানেই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকাস্তরে কোনওরূপ স্থিতিশীলতার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সেই স্তরভাগ আবার পূর্ব্বাবস্থা বা কোন কোন স্থলে নূতন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইবার কালে ভূমিকম্প উৎপাদন করিয়া থাকে। এখন কি কি প্রকারে ভূস্তরে এরূপ বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ যে বহির্ভাগ অপেক্ষা উষ্ণতর, ইহা সকলেরই জানা আছে। কূপ খননের সময় যতই নিম্নে যাওয়া যায়, ততই এই উত্তাপ অধিকতর অনুভব করা যায়। সৃষ্টির প্রাগ্ যুগে পৃথিবী অগ্নিময় গোলকের মত ছিল। ক্রমে ক্রমে বহির্ভাগ শীতল হইয়া মনুষ্যবাসোপযোগী হইয়াছে, কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ এখনও অত্যুষ্ণ তরল অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। যুগে যুগে ঐ অভ্যন্তর ভাগও শীতল হইয়া তরল হইতে কঠিন অবস্থায় পরিণত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে ভিতরে যে সঙ্কোচন হইতেছে তাহাতে বাহিরের স্তরে গ্রন্থির সমতা নষ্ট হইয়া অনেক সময় ভূমিকম্পের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ভূগর্ভে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলেও অনেক সময় ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ঝরণার জল বিশ্লেষণ করিয়া উহার মধ্যে অনেক সময় যে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, ইহা হইতে আভ্যন্তরীণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অনেক আভাস পাওয়া যায়। রাসায়নিক পরিবর্ত্তনে অনেক সময় কিরূপ উত্তাপের সমুদ্ভব হইয়া থাকে তাহা বৈজ্ঞানিকের নিকট অবিদিত নহে। এইরূপ স্থানীয় উত্তাপের প্রভাবে ভূস্তরে হঠাৎ বিপর্য্যয় ঘটিয়া ভূমিকম্প হওয়া খুবই সম্ভবপর।

পৃথিবীর আহ্নিকগতির প্রভাবে তাহার ভিতরের স্তরে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে তাহাই এখন দেখা যাউক। কোনও নরম জিনিসের একটী বল হাতের উপর ঘুরাইলে তাহা ক্রমশঃ চেপ্টা হইয়া কমলালেবুর আকার ধারণ করে। পৃথিবীও এককালে এইরূপ নরম ছিল। যুগে যুগে ইহা যেমন শীতল হইয়া কঠিন অবস্থায় আসিয়াছে, নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তনের ফলে তাহার বহির্ভাগও মেরু-দণ্ডের দুই মাথায় কতকটা চেপ্টা হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ভিতর ভাগ এখনও নমনীয় অবস্থায় রহিয়াছে;

কাজেই এই ঘূর্ণনের ফলে সে স্থানেও এইরূপ একটা পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহার প্রভাব যে উপরের স্তর পর্য্যন্ত আসিয়া ভূমিকম্পের সৃষ্টি করিতে পারে তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণে নদী ও সমুদ্রের জল যেরূপ স্ফীত হইয়া উঠে, স্থলভাগও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এরূপ আকর্ষণ বশতঃ ভূস্তরের গ্রন্থি বিদীর্ণ হইতে পারে না। যদি ইহা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর যে অংশে যখন চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণ হয়, সেই অংশেই তখন ভূমিকম্প হইত; এবং ভূমিকম্প সম্বন্ধে ভবিষ্যদুক্তি করাও সহজ হইয়া দাঁড়াইত। তবে যে সব স্থানে ভূমির গ্রন্থি নিতান্ত শিথিল, সেই সব স্থানে আকর্ষণ হইলে তাহা আকর্ষণের বলে বিধ্বস্ত হইয়া ভূমিকম্প উৎপাদন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। পৃথিবীর কোনও স্থান যদি অতিরিক্ত পরিমাণে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও স্তরের স্থিতিশীলতায় ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের সময় নদী ও সমুদ্রে জোয়ার হইয়া জল বহু উর্দ্ধে স্ফীত হইয়া উঠে। জল এক ফুট উর্দ্ধে উঠিলে এক বর্গ ফুট ভূমির উপর প্রায় ত্রিশ সের চাপ বাড়িয়া যায়। সমুদ্রে জোয়ারের সময় জল এত উর্দ্ধে উঠে যে সেখানে চাপের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ভূভাগ পূর্ব্বে শিথিল অবস্থায় না থাকিলে এরূপ চাপের প্রভাবে ভূমিকম্প হওয়া সম্ভবপর নহে। এইরূপ বায়ুর চাপের হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গেও ভূমিকম্পের সম্বন্ধ আছে। হঠাৎ বায়ুর চাপ কমিয়া গেলে অনেক সময় ঝঞ্ঝাবায়ু ও ভূমিকম্প এক সঙ্গে ঘটিয়া থাকে।

উপরে ভূমিকম্পের যে নানারূপ কারণ দেওয়া গেল, ইহাদের মধ্যে একাধিক কারণের সমন্বয়েও ভূমিকম্প ঘটিতে পারে। এই যে অহরহঃ ভূমিকম্প হইতেছে ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে এখনও সৃষ্টির একটা বিরাট ও বিচিত্র পরিবর্ত্তন চলিতেছে। যদি পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগও শীতল হইয়া বহির্ভাগের মত দৃঢ় ও সমধর্ম্ম বিশিষ্ট হইত, তবে তাহার ভিতরের স্তরে পরিবর্ত্তনের মাত্রা কমিয়া যাইত, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পও হ্রাস পাইত।

এখন ভূকম্প পীড়িত দেশ সমূহে গৃহনির্ম্মাণ কিরূপে সম্ভবপর হইয়াছে তাহাই আলোচনা করা হইবে। জাপান, ইটালী, স্পেন ও দক্ষিণ আমেরিকায়ই ভূমিকম্পের প্রকোপ বেশী। জাপানে প্রায় প্রত্যহই ভূমিকম্প হইতেছে। উপযুক্ত গৃহনির্ম্মাণে জাপান বহুকাল যাবত কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিয়াছে। ভূমিকম্পে কোনও অট্টালিকা বিধ্বস্ত হইলে সেই ধ্বংসের মধ্যে একটা নিয়ম ও শৃঙ্খলা দেখা যায়।

ভূমিকম্প ও গৃহ নির্ম্মাণ

যেদিক হইতে ভূমিকম্পের প্রকোপ আসিয়া থাকে, এবং যেদিকে অট্টালিকা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ দেখা যায়; তবে এইরূপ সম্বন্ধ স্থান বিশেষের উপর নির্ভর করে। যে দিকে ভূমি কম্পিত হয় তাহার সহিত সমান্তরাল দেওয়াল গুলির যেরূপ অনিষ্ট হয় অন্যগুলি সেরূপ হয় না। আর গৃহের যে সব দেওয়ালে দরজা জানালা থাকে সেগুলি অন্যান্য দেওয়াল অপেক্ষা হাল্‌কা। কাজেই কোনও স্থানে গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ভূমির কম্পন কোন্ দিক দিয়া বেশী হয় তাহাই স্থির করিতে হইবে। ইহা যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপণ করা

যায়। তৎপরে গৃহনির্ম্মাণের সময় বন্ধ দেওয়ালগুলি সেইদিকে তুলিয়া দরজা জানালা-বিশিষ্ট দেওয়াল অন্যান্য দিকে জুড়িয়া দিতে হয়। দেওয়ালগুলি হাল্‌কা করিবার জন্য যথাসাধ্য কাঠ ব্যবহার করা হয়। ছাদ ও অন্যান্য ভাগ শক্ত অথচ হাল্‌কা করা আবশ্যক। আর গৃহের ভিত্তিও শক্তস্তরের উপর হইতে গড়িয়া তুলিতে হয়। এইরূপ নানা উপায় অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির এই অনিয়মিত ও অবিশ্রান্ত অত্যাচারের মধ্যেও মানুষের বসবাস সম্ভবপর হইয়াছে।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে ভবিষ্যদুক্তি করিবার চেষ্টা বহুকাল হইতেই পণ্ডিতদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ইহাতেই ভূকম্পবিদের পরীক্ষা, ইহাতেই তাহার চরম সার্থকতা। কিন্তু এপর্য্যন্ত স্থান ও সময় নির্দ্দেশ করিয়া ভূমিকম্প সম্বন্ধে কোনরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবপর হয় নাই; তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নানা প্রকার নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন হইতে এসম্বন্ধে অনেকটা পূর্ব্বাভাস দিতে পারেন। তাঁহারা ভূমিকম্পের পূর্ব্বে বায়ুমণ্ডলে নানারূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন। আর সেই সময় ঝরণার জলের রং, স্বাদ ও উত্তাপেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটে। অনেক সময় মাটীর নীচেও নানারূপ শব্দ শোনা যায়।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে ভবিষ্যদুক্তি

পশুপক্ষীর মধ্যে এ বিষয়ে অদ্ভুত ধারণাশক্তি দেখা যায়। কারাকাসের আদিম অধিবাসীরা এক প্রকার অদ্ভুত চতুষ্পদ জন্তু পালন করে। সেখানে ভূমিকম্প প্রায়ই হইয়া থাকে। এবং অধিবাসীরা সেই সব জন্তুর অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়া ভূমিকম্পের পূর্ব্বাভাস পাইয়া থাকে; অনেক সময় উহারা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করিতেও বাধ্য হয়।

ভূমিকম্পের পূর্ব্বে সামুদ্রিক পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে তীরের দিকে আসিতে থাকে। প্রবল কম্পনের পূর্ব্বে ভূমির যে মৃদু স্পন্দন হয় উহারা তাহাই টের পায়। এইরূপ মৃদু কম্পন যন্ত্রের সাহায্যেও ধরা পড়ে। এই সকল উপায়েই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নির্দ্দেশ করা যায়। এবিষয়ে আরও অনেক গবেষণা হইতেছে; তবে সেগুলি এখনও বিজ্ঞানাগারের গণ্ডী হইতে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আসিতে পারে নাই।

প্রতিদান

[শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহ বি, এস্‌, সি]

ভ্রমর বলে, "গোলাপ বঁধু, পান করে যাই যত মধু
দেই না ত তার কোনই প্রতিদান!"
গোলাপ বলে "ভ্রমর ভাই, এর চেয়ে আর বেশী না চাই,
—বঁধুর সনে মধুর আলিঙ্গন।"

কাক্সবাজার ভ্রমণ।

গিরি-তনয়ার স্মৃতিশক্তি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে অধিক স্থায়ী হোতো, অথবা শিবঠাকুর যদি অধ্যাপকদের মত বৎসরের পর বৎসর কৈলাস পর্ব্বতের চূড়ায় বসে সৃষ্টির গোড়া থেকে আরম্ভ করে, সত্যাদি চতুর্যুগের মধ্য দিয়ে প্রলয় পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ আবার নূতন করে বল্‌তে গররাজি হতেন; তা'হলে শিব-শিবানীর দাম্পত্য জীবনে কোন গোলযোগ উপস্থিত হোতো কিনা, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে, কিন্তু আমাদের পাড়ার বধির গণক ঠাকুরের জীবন যাত্রা যে বিশেষভাবে কষ্টকর হয়ে উঠ্‌তো, তাতে কেউ সন্দেহ করেন না। বৎসরের গোড়াতেই শ্রবণ-খর্ব্ব এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পাড়ায় পাড়ায় হর-পার্ব্বতীর দাম্পত্যালাপ প্রসঙ্গে সংবৎসরের যে ফলাফল বিবৃত করেন এবং প্রত্যেক মাসের আদিতে আবার তাকে চন্দ্রতারাদির শুদ্ধাশুদ্ধি সমেত যে রকম নূতন করে ঝালিয়ে আসেন, তাতে কেউ বিশ্বাস করুক আর নাই করুক, কতকটা কথকতার গুণে এবং কতকটা দুঃস্থের প্রতি অনুকম্পা প্রযুক্ত সকলেই তাকে যা কিছু দান করে তাতেই কোনমতে তার চলে যায়।

এবারের ১লা বৈশাখ বৃদ্ধের কর্ণকুহরে "মূলা ধনু" "মূলা ধনু" বলে মুহুর্মুহু চীৎকারের পর আমার প্রশ্নের প্রতি সচেতন হয়ে যখন তিনি গ্রহ বিশেষের ত্রিপাদ, অর্দ্ধপাদ প্রভৃতি নানান ভগ্নাংশিক দৃষ্টির ফলে আমার সমুদ্রযাত্রা যোগ ঘোষণা কল্লেন, যৌবন-সুলভ মনের উড়ো স্বভাব বশতঃ সমুদ্রযাত্রাকে বিলাতযাত্রার সঙ্গে ভুল করে, বরাবরের মতই বুড়োর কথা হাসিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ঘটনা-চক্রে কাক্সবাজার যাওয়ার কথা উঠ্‌লে, "মধ্বাভাবাৎ গুড়ং" এর মতই এই দ্বিতীয় পন্থার ব্যবস্থা দেখে নিয়তির অপরিজ্ঞেয় রহস্যের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ না করে থাক্‌তে পাল্লাম না। আমার কাক্সবাজার ভ্রমণের সঙ্গে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা পাঠকের কাছে যতই অপ্রাসঙ্গিক মনে হউক না কেন, বৃদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে আমার সমুদ্রযাত্রার এম্‌নি মানসিক যোগ হয়ে গেছে, যে আমি উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেখ্‌তে পারি না! সে জন্য পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাই প্রশস্ত মনে করি।

৩রা জানুয়ারী কাক্সবাজার যাত্রা করি। সঙ্গী হলেন মথুর বাবু। বয়স তাঁর ত্রিশের উপরেও হ'তে পারে; আর তাঁকে শুধু লোলচর্ম্ম স্থূল দেহ বল্‌লে অর্দ্ধোক্তি দোষ হয়; কারণ শরীরানুযায়ী স্বভাবটাও তাঁর অনেকটা স্থিতিশীল। যাই হোক্, 'ব্যসনের' এই সাথীটিকে বয়স এবং আকৃতি প্রকৃতির প্রভূত বৈষম্য সত্ত্বেও শাস্ত্রমতে যখন বন্ধুত্বে বরণ করে নিলাম, তিনি শরীর-গোলার্দ্ধময় হাসি ছড়িয়ে, ঘাঁড় নাড়ার বৃথা চেষ্টা করে বিনয় সহকারে সে বন্ধুত্ব স্বীকার করে নিলেন।

রেল গাড়ীতে আমাদের চট্টগ্রাম যেতে হয়েছিল; সেখান থেকে ষ্টীমারে কাক্সবাজার গিয়েছি। চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত গাড়ীতে আমারই প্রস্তাব মত তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট করা গেল। তরুণ বন্ধুত্বের অসংলগ্নতাটা যাত্রাতেই প্রকাশ হয়ে পড়বে ভয়ে যদিও বন্ধু তাতে কোন আপত্তি কর্‌লেন না, তথাপি

আসন্ন ভিড়ের চিন্তায় মনে মনে একটু অপ্রসন্ন হয়ে গিয়েছিলেন ;—তা আমার টের পেতে দেরী হয়নি ! গাড়ী ষ্টেশনে ঢুক্‌তেই দেখি ছদিকে মালগাড়ীর মধ্যে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী রয়েছে ; কেউ তাতে উঠ্‌ছেনা। বন্ধুর অঙ্গুলি নির্দ্দেশক্রমে বাক্স পেটেরা নিয়ে সেখানে উঠে পড়্‌লাম। সেই অপ্রত্যাশিত অংশে আর কেউ ভিড়্‌লনা।

মিনিট কয়েক হাঁপিয়ে যখন বন্ধুর এই উত্থান-শ্রমের লাঘব হোলো তখন গাড়ীও ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের তুলনায় অন্যান্য তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা বুদ্ধিতে কত খাট সেই প্রসঙ্গ নিয়ে বন্ধু আলাপ সুরু কল্লেন, আর আমিও "মনসাবাচা" তার কথায় সায় দেইনি বল্লে সত্যের অপলাপ হয়, বন্ধু আমার বেজায় আলাপী লোক, যদিও প্রত্যেক তৃতীয় শব্দের পর তাঁকে একবার দম নিতে হয়, আর দৈবছুর্য্যোগে যদি কোন হাসির বিষয় উঠে ত কথাই নেই ; তাঁর হাসির নমুনা দেখে দয়ালু লোকের কান্না পাবার উপক্রম। আমি ভাবছিলাম, যদি বন্ধুটির সঙ্গে শরীর সম্বন্ধে "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি" চল্‌তো তা'হলে আমাদের কারুই কাক্সবাজার যাওয়ার দরকার হোতোনা। বিশ্বকর্ম্মা যদি হাঁড় মাংস বিতরণে বন্ধুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব আর আমার প্রতি কার্পণ্য না কর্‌তেন তাহ'লে তাঁর মালমসল্লাও গড়ে সমান থাক্‌তো, অথচ উভয়েই অনেক দুর্ভোগ থেকে বেঁচে যেতাম। বিশ্বকর্ম্মার এই নির্ব্বোধ পক্ষপাতিত্বের ভুলেই যে আমাদের অশেষ কষ্ট পেতে হচ্ছে, তা ভাব্‌তে ভাব্‌তে উত্তরোত্তর তাঁর প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠ্‌ছি, এমন সময় সীতাকুণ্ড এসে গাড়ী থাম্‌লো। একজন টিকিট কালেক্টার এসে জানিয়ে গেলেন, যে আমাদের ঐ গাড়ীতে উঠা ভুল হয়েছে, কারণ সেটা সেখানেই রেখে যাওয়া হবে। শুনে আমার রাগ পড়ে গেল, আর বন্ধুটি যে বিপন্নভাব দেখালেন, তাতে হাসি চেপে রাখা দায় হোতো ; তবু নূতন বন্ধুত্বের প্রতি অসম্মান হয় ভয়ে, হাসি দমন কর্‌তে যে কস্‌রৎ কত্তে হয়েছিল, তাতেই হয়ত স্বাস্থ্যোন্নতির প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হয়ে গেছে। যাইহোক, এই ঘোর বিপদে আমি তাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা কল্লাম, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না টানা হেছ্‌ড়া করে কোন রকমে মালপত্র ও বন্ধু সমেত গাড়ী বদল করতে সমর্থ হলাম ততক্ষণ তিনি কোন ভাবান্তর প্রকাশ কল্লেন না। বন্ধু বড় হিসাবী লোক, কোন জিনিসই বাইরে রাখেন নি। ঘটী গামছা থেকে আরম্ভ করে লেপটি পর্য্যন্ত ভিতরে পুরে তিনটি বড় বড় ট্রাঙ্ক সঙ্গে নিয়েছেন। আমার একটি বেতের বাক্স আর বিছানা ছাড়া কিছু ছিল না। গাড়ী ছেড়ে দিলে উত্তীর্ণ বিপদের কথা স্মরণ করে বন্ধু কি ভাবে অদৃষ্ট দেবতাকে নিন্দাবাদ এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন, সে সব বিস্তৃত করে বলে পাঠককে চট্টগ্রামের পথে আটক করে রাখাটা ন্যায়সঙ্গত হবে না। এটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে সে দিন বন্ধুর পরিচিত এক গোমোস্তার আশ্রয়ে টীনের ঘরে এক শয্যায় দুই বন্ধু রাত্রি যাপন করেছিলাম। রাত অকালে বৃষ্টি নাম্‌লো ; কিন্তু গর্জ্জন ছাড়া বর্ষণ শোভা পায় না ; তাই বন্ধু অল্পক্ষণের মধ্যেই একমনে নাসিকা-নিনাদ সুরু করে দিলেন। বলা বাহুল্য সে রাত ঘুমের বৃথা চেষ্টা করে দার্শনিক চিন্তায় কাটিয়ে দিয়েছি।

সকালবেলাই ষ্টীমার ছাড়্‌বে। গোমোস্তা গাড়ী ডাকিয়ে আমাদের ষ্টীমার ঘাটে রওনা করিয়ে দিলেন। গাড়োয়ানকে "টের্না-মার্চ্চেন্টের" ঘাটে যেতে উপদেশ দিয়ে দিলেন। "মার্চ্চেন্ট" কথাটি

যেমন বুঝেছিলাম "টেনা" কথাটিও যদি তেম্‌নি বুঝে যেতাম, তাহ'লে "টেনা-মার্চ্চেণ্টের" রহস্যোদ্ধার হয়ত আর ইহকালে হোতোনা। কিন্তু "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এই নীতিবাক্য লঙ্ঘন করেও যখন লোভী-মন সমস্ত তথ্য জান্‌তে উৎসুক হয়ে উঠলো, তখন "টেনা" ও "মার্চ্চেণ্ট" দুটুকেই হারিয়ে ফেল্লাম। টিকিট বাবুর কাছে জান্‌তে পেলাম Turner-Morrison কোম্পানীর ষ্টীমার তাদের ঘাট থেকেই ছাড়্‌বে।

টিকিট করে ষ্টীমার উঠ্‌তে যাবো, কুলী আমার বেতের বাক্স ও বিছানা রেখে এসেছে; বন্ধু মহাশয়ের ট্রাঙ্ক নিয়ে চলেছে; এমন সময়ে আর এক দুর্য্যোগ উপস্থিত হোলো। চেকার বাবু বিছানা ছাড়া আর কিছু বিনা ভাড়ায় নিতে দিবেন না। একটী ট্রাঙ্কে যে কেবল মাত্র বিছানাই আছে তা খুলে দেখাবার অঙ্গীকার করেও যখন বন্ধু সেটির ভাড়াও মাপ পেলেন না, তখন "যথালাভ" এই মনে করে তিনি ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে বিছানা পত্র সব বার করে দিনের আলোতে ধরলেন, অন্ততঃ যাতে তার ওজন মাশুল থেকে বাদ পড়ে। কিন্তু ট্রাঙ্ক তিনটি ওজন না করে লাগেজবাবু যখন তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ মেপে খালী ট্রাঙ্কটীরই বেশী ভাড়া বসিয়ে দিলেন, তখন মাশুল ধার্য্যের এই অভিনব কৌশলে প্রমাদ গ'ণে একদিকে যেমন বিস্ময় বিরক্তিতে মন ভরে গেল, অন্যদিকে তেমনি যাত্রার অশুভতার বিষয়ে বন্ধুবরের সমস্ত সন্দেহ অন্তর্হিত হোয়ে গেল। যাই হোক্ এত গোলযোগের পর ষ্টীমারে ভাল জায়গা দখলের দুরাশা ছেড়েই দিলাম। তবু বন্ধুর শরীর রক্ষার স্থানটি হওয়ায় উভয়েই তৃপ্তি বোধ কল্লাম।

তখন মেঘ কেটে রোদ উঠেছে। কর্ণফুলী নদী বেয়ে খানিক এগিয়ে নীলা (Nilla) ষ্টীমারটী নীল সমুদ্রে এসে পড়্‌লো। প্রথম কিনারা দিয়েই চলেছিল; কিন্তু কুতুবদিয়ার কাছে এসে উন্মুক্ত সাগরে পড়া গেল। উপরে নীল আকাশ, নীচে হিল্লোল-বিলোলিত নীল সমুদ্র; আর তারই মাঝে আমাদের ক্ষুদ্রা "নীলা" নেচে নেচে ছুটেছে। আকাশের দূরে দূরে "শাদা মেঘের ভেলা" ভেসে চলেছিল, নীচে বঙ্গোপ-সাগরের বক্ষে তারই প্রতিবিম্বের মত দূরে দূরে দু একখানি নৌকা শাদা পাল বেয়ে চলেছিল; আর ঢেউ যেখানে শত শত শাদা ফুল হয়ে ফুটছিল, তারই খানিক উপরে শাদা শাদা চিল শিকারের চেষ্টায় উড়ে বেড়াচ্ছিল। এ ছাড়া সে বিরাট সৌন্দর্য্যে আর কোন বৈচিত্র্য ছিল না। বেলা যখন পড়ে এসেছে দূরে কাক্সবাজারের সমুদ্র-বিধৌত ছোট ছোট পাহাড়গুলি শীতের জলে কুয়াসার মত দেখাচ্ছিল। সমুদ্র থেকে উঠেছে মাটীর পাহাড়; তারপর মেঘের পাহাড়; কোথায় কোন্‌টির সীমানা সন্ধ্যার ধূসরালোকে তা ধর্‌বার জো ছিল না। সে দিন সন্ধ্যায় ষ্টীমার থেকে নেমে "সাম্পান" নৌকায় কাক্সবাজার এসে পৌঁছলাম।

যা বল্‌বার ভূমিকাই এতটা হয়ে গেল, পাঠক যদি এতক্ষণে তার মধ্যে কোন সরস গল্পের প্রত্যাশী হয়ে থাকেন তবে Wordsworth এর Simon Leeর মত ভাবপ্রাণ পাঠকের ঘাড়েই গল্প রচনার ভার চাপিয়ে কাক্সবাজার সম্বন্ধে অল্প পরিচয়ের এলোমেলো দু'একটা কথা বল্‌তে পারি।

এই ঐতিহাসিক গবেষণার দিনে কাক্সবাজার নামটির ব্যুৎপত্তি বা উৎপত্তি সম্বন্ধে কৌতূহল হওয়াটা কেবল যে মার্জ্জনীয় তা নয়; পাণ্ডিত্যেরও পরিচায়ক বটে। সুতরাং আদিতে সে কথাটাই বলা দরকার। ইংরেজ অধিকারের প্রথম অবস্থায় এ জায়গায় পর্ত্তুগীজ ও আরাকানী দস্যুদের ভয়ানক অত্যাচার

ছিল। Captain Cox নামে জনৈক ইংরেজ সেনা-নায়ক স্থানীয় মগদের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে তাদের সাহায্যে দস্যু দমন করেছিলেন বলে এজায়গাটীর নাম Cox's Bazar হয়েছে। বাংলা কাক্সবাজার "সেক্ষপীরেরই" মত সরল অনুবাদ মাত্র।

কাক্সবাজার সহরটা কতকটা উপদ্বীপের মত সমুদ্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছে; সুতরাং প্রায় তিন দিকেই এর জল। উত্তরে ৫।৬ মাইল দূরে আদিনাথ দ্বীপ, হিন্দুদের তীর্থস্থান। পশ্চিমদিকে দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত বঙ্গোপসাগর। এদিকে স্বাস্থ্যাবাসের জন্য ধনী লোকেরা সমুদ্রের পাড়েই বাংলোনামধারী কতকগুলি বাড়ী করে রেখেছেন। তারই একটাতে আমরা দুইবন্ধু আশ্রয় নিয়েছিলাম। এ সকল বাড়ী আর সমুদ্রের মধ্যে বালুর চর ব্যতীত কোন ব্যবধান নেই। এখানে জীবনযাত্রা একটা অবিশ্রাম ছুটীর পালা। দিনরাত হু হু বাতাস, সোঁ সোঁ সমুদ্রের ডাক ঘুমপাড়ানী ছড়ার মতই ঘুম এনে দেয়।

প্রথমদিন সমুদ্রের পাড়ে বেড়াতে গিয়ে বড়ই নিরাশ হ'য়ে ফিরে এসেছিলাম। বইতে পড়েছি সমুদ্র অসীম; মানচিত্রে দেখেছি সমুদ্র বিশাল; কিন্তু চোখে দেখ্‌তে গিয়ে মনে হোলো—এইতো, কত আর দূর হবে, যেখানে আকাশ এসে সমুদ্রে নেমে পড়েছে। তার পর আর কিছুইত দেখা যায় না। সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়েও তার অসীমতা প্রত্যক্ষ কর্‌তে না পেরে বড় কষ্ট হয়েছিল মনে। ঐতো ষ্টীমারটি দূর সীমান্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। কল্পনা তার পেছন পেছন ছুটে চলেছে; দৃষ্টি বদ্ধ রয়েছে আমারই কাছে। মোটেই খুসী লাগ্‌লো না। সেদিন সমুদ্র ছিল বড় শান্ত; তার বিশালতায় কোন বৈচিত্র্য ছিল না। শূন্য জলরাশির দিকে চেয়ে চেয়ে মন কোথাও তিষ্ঠিবার ঠাঁই পাচ্ছিল না; তাই হাঁপিয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু পূর্ণিমার কাছাকাছি আর একদিন যা দেখেছি সে অন্যরকম দৃশ্য। সকাল বেলা বিলম্বিত বেলা ভূমির উপর দিয়ে দক্ষিণ মুখে চলেছি। বাম পাশে ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী; ডান পাশে বঙ্গোপসাগর। উপরে দেবলোকের চাষারা মেঘের মাঠে সবেমাত্র প্রথম চাষ দিয়েছে। তার ভেতর দিয়ে শত বিচ্ছিন্ন সূর্য্যালোক এসে পড়েছে পাহাড়ের গায়, আর সমুদ্রের বুকে। সবটায় মিলে কি যেন একটা স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। সে রাজ্যে এক্‌লা আমি প্রেতাত্মার মত দিক্‌বিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভুল হয়ে যায় একি বাস্তব ঘটনা, না একটা স্বপ্নের ছবি।

সেদিন সমুদ্রের বড় উল্লাস। পাগ্‌লা ভোলার মত তাণ্ডব নৃত্যে মেতেছে সে। ঢেউয়ের পর ঢেউ উন্মত্ত বেগে ছুটে আস্‌চে লাফিয়ে লাফিয়ে hurdle race খেলার মত। সমুদ্রের সহস্র সহস্র ঢেউ অসংখ্য শাদা ফুল হয়ে বেলা ভূমিতে লুটিয়ে পড়্‌ছে। এতো ভক্তির অর্ঘ্য নয়। এ যেন যোদ্ধার অভিবাদন। অর্জ্জুন যেমন দ্রোণাচার্য্যের পায়ে বাণ মেরে গুরুদেবকে বন্দনা করেছিলেন। মৃত্যুবর্ষী সে বন্দনার সঙ্গে এ বন্দনার বুঝি মিল আছে। সমুদ্র আজ সমর-চঞ্চল। স্থলদেব কিন্তু স্থির হয়েই আছেন; চিরন্তন সমরে কোন উৎকণ্ঠা নেই। শাস্ত্রে জলকেই আদিম সৃষ্টি বলা হয়; কিন্তু দেখ্‌তে তা মনে হয়না। এই অন্তহীন দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্থলদেব কবেই এসে পাহাড়ের তাঁবু দিয়ে সীমান্ত ঘিরে বসে আছেন তার ঠিকানা নেই। সমুদ্র তার পর কত চেষ্টা কচ্ছে; উত্তেজনার আতিশয্যে প্রতিনিয়ত বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌ছে; তবু

জয়ের নামটি নেই। যদিবা শত ঘাতপ্রতিঘাতে একটু জায়গা দখল করে নেয়, স্থলদেব সুচতুর চালে আর এক জায়গায় খানিকটা এগিয়ে পড়েন। সমুদ্রের ভগ্নদূত পরাজয় বার্ত্তা নিয়ে ফিরে যায়। দিনের পর দিন চলেছে সে যুদ্ধ; শ্রান্তি নেই, বিরাম নেই। নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে দৃশ্যটি মন্দই বা কি?—এ রকম নানা দৃশ্যই দেখা যায় এখানে। পুরীতে যেমন সূর্য্যোদয়ের দৃশ্যটি বড়ই মনোরম, এখানেও তেমনি সূর্য্যাস্তের দৃশ্য খুব সুন্দর। "সোণার কলসী" হয়ে কি করে সূর্য্য অস্ত যায়, তা বাস্তবিকই দেখ্‌বার জিনিস।

সমুদ্রের হাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর। ঢেউগুলি যেখানে এসে ভেঙ্গে পড়ে সেখানে নাকি প্রচণ্ড আঘাতে জল decomposed হয়ে ozone তৈরী হয়, যা মানুষের পক্ষে খুব উপকারী। কাজেই স্বাস্থ্যান্বেষী লোকদের ঢেউয়ের কাছে কাছে ভিজে বালুতে খালি পায়ে বেড়াতে হয়। আমরা দুই বন্ধু যখন সমুদ্রের পাড়ে হেটে বেড়াই তখন আমার খরগোস ও কচ্ছপের গল্প মনে পড়ে যায়। কূর্ম্মগতির নিবন্ধন বন্ধু আমার চেয়ে যেটুকু কম হাটেন, নানা রং বেরঙ্গের শঙ্খ, কড়ি ও ঝিনুক কুড়িয়ে আবার তার ক্ষতিপূরণ করে লন। এসমস্ত সামুদ্রিক জিনিসের নানা রকম অদ্ভুত গঠন ও বর্ণসমাবেশ দেখ্‌লে হঠাৎ নাস্তিকের মনোরাজ্যে একটা বিদ্রোহ সঞ্চারের সম্ভাবনা হয়ে উঠে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে যে সব দৃশ্য দেখি আমরা—তা সবই আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নেই; কিন্তু নিত্য পরিচয়ের দোষে বা গুণে তাদের অদ্ভুত সৃষ্টি-কৌশল আমাদের চোখে পড়ে না। তাই চারদিকে যা দেখ্‌ছি, তা কোন স্রষ্টার অপেক্ষা না রেখে আপ্‌না আপ্‌নি গড়ে উঠেছে—একথা বল্‌তে প্রাণে কোন বাধা ঠেকেনা। কিন্তু এখানে এসে হঠাৎ এতগুলি অপরিচিত কারুকার্য্যের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে, সৃষ্টির স্বতঃজনন মতের উপর আস্থা রাখা দুষ্কর হয়ে পড়ে। মন যেন অকারণেই কোন অজ্ঞাত শিল্পীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে চায়। আর মনে হয়, মানুষ এখনো এমন কিছু গড়ে উঠ্‌তে পারেনি, যা সৃষ্টিতে আগেই ছিল না। মানুষের আঁকা অনেক চিত্র দেখে মনে হতে পারে, এ কেবল মাত্র কল্পনা-প্রসূত। কিন্তু ঝিনুক আর কড়ির গায়ে নানা রকম চিত্র-কৌশল দেখে সে বিশ্বাস চলে যায়। এ যে মানুষের আঁকা চিত্রেরই অনুরূপ, আর এর রকমেরও ত কোন ইয়ত্তা নেই। কত লোক কত কুড়িয়ে নিচ্ছে, তবু ফুরায় না। সমুদ্রকে রত্নাকর বলা হয় যথার্থই।

সমুদ্র-স্নান এখানে বড়ই আমোদ-জনক, যদি না হাঙ্গর বা কুমীর এসে হঠাৎ অতর্কিতে গলাধঃকরণ করে বসে। কুমীর এখানে খুবই কম তবে হাঙ্গরের ভয় নাকি কিছু বেশী। এইতো সেদিন আমরা ১০।১২ জন মিলে স্নান করছি হঠাৎ দুটো বড় বড় কি মাছ তেড়ে এসেছে আমাদের। কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে উপরে উঠেছি, কিন্তু একটা মাছ এত জোরে এসেছিল যে বালুর চরে তার মাথা ঠেকে গিয়েছে। যে ঢেউয়ের সাথে সে এসেছিল সেইটী যখন নেমে গেল তখন অল্প জলে মাছটি হুড়োহুড়ি কচ্ছে। আর এক ঢেউ এলেই হয়ত চলে যেতে পার্‌তো কিন্তু ঘটোৎকচ যেমন সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে পড়েছিল, বন্ধুমশায় তেমনি মাছটার উপর চেপে পড়্‌লেন। "তুল্যং তুলেন"—বালী সুগ্রীবের খানিক মল্ল হোলো; আমরাও গিয়ে ধরলাম। আর কোথায় যায়। লঙ্কায় দশ সহস্র রাক্ষসের হাতে বাঁধা

পড়ে মহাবীর পবন-নন্দনের যে দশা হয়েছিল, আমাদের দশ বীরের হাতে মাছটীরও সে দশাই হোলো। সবাই মিলে টানাটানি করে মাছটাকে ডাঙ্গায় তুলে ফেল্‌লাম। বন্ধুর সঙ্গে তুলনামূলক ওজনে এই হনুমানানুজ দ্বিগুণের বেশী না হইলেও লেখকের যে চতুর্গুণ ছিল সে বিষয়ে কোনই ভুল নেই।

জোয়ারের সময় যখনই ঢেউয়ের জোর বেশী থাকে তখন এসব মাছ কাছে আসে না। কাজেই ঐ সময়ই স্নানের জন্য প্রশস্ত। ঢেউয়ের পর ঢেউ উচু হয়ে আস্‌ছে, বাস্‌, কাপড় কসে তার সঙ্গে লড়াইতে নেমে যাও। কোমর জল পর্য্যন্ত লাফিয়ে লাফিয়ে ঢেউগুলি পার হয়ে যাওয়া যায়, শেষে আর পারা যায় না। তখন পিঠ পেতে দাও; ঢেউটা মাথার উপর দিয়ে চলে গেল, আবার তুমি কোমর জলেই আছ। এরকম ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে তোমাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। বেশ মজা। জোর করে থাক্‌তে হয় না; হইলে অর্দ্ধচন্দ্রক্রমে ডাঙ্গায় উঠিয়ে ফেল্‌বার উপক্রম। স্নানের সময় বন্ধুর কাছে আমার হার মান্‌তে হয়। তিনি মৈনাক পর্ব্বতের মত পড়ে থাকেন; ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আঘাত করে ফিরে যাচ্ছে; ভ্রুক্ষেপ মাত্র নাই। আর আমি চার পাঁচটা ঢেউ খেয়েই কড়ি শঙ্খের মত কিনারায় এসে পড়ি।

সমুদ্রের কথা হয়ত আর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন; সহর সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলা যেতে পারে। কাক্সবাজার একটি সাবডিভিশন একথা সকলেই জানেন সুতরাং সাবডিভিশনে সাধারণতঃ যা যা থাকে—আদালত, ফৌজদারী, পোষ্ট ও টেলিগ্রাম আফিস, ডাক্তারখানা, স্কুল, সাবরেজেষ্ট্রী আফিস, বাজার ইত্যাদি এখানেও সবই আছে। সহরটি পাহাড়ের ধারে, সেজন্য জায়গাটি উচু নীচু ও ঘরবাড়ী সব এলোমেলো। অধিবাসীদের মধ্যে মগের সংখ্যাই বেশী, মুসলমানও আছে, আর হিন্দু নিতান্ত মুষ্টিমেয়।

মগদের বিষয় দু'একটি কথা হয়ত বলা দরকার। এরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মঙ্গোলিয়ান শ্রেণীর লোক, সুতরাং চেহারা ও রং ঠিক মঙ্গোলিয়ান ধরণের। অনেকেই গরীব, কাজেই কুঁড়েঘরে থাকে, আর যারা অপেক্ষাকৃত ধনী তারা কাঠের ঘরে থাকে। কিন্তু কুঁড়েই হোক্‌ আর কাঠের ঘরই হোক এরা কোনদিনই মাটীর ভিটির উপর ঘর করে না। খুঁটির সঙ্গে যোগ করে মাটী থেকে ৪ ৫ হাত উপরে অবস্থানুসারে বাঁশের কি কাঠের মেজে করে নেয় এবং তার উপর ঘর তৈরী করে। জানালার জঞ্জাল এদের ঘরে নেই বল্‌লেই চলে।

এদের মধ্যে স্ত্রী-অবরোধ প্রথা নেই, বরং তারাই কাঠ কাটা প্রভৃতি বাইরের শ্রমসাধ্য কাজ বেশীর ভাগ করে থাকে। কাজেই তাদের স্বাস্থ্যও অতি সুন্দর। পুরুষেরা অধিকাংশ সময়ই বাবুগিরি করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। মেয়েরা সর্ব্বদাই কাজ করে। কোন জায়গা জমি নেই এদের—কৃষিরও ধার ধারে না। সিল্কের লুঙ্গি বয়নই এদের প্রধান ব্যবসা, এবং মেয়েরাই রাতদিন পরিশ্রম করে সে ব্যবসাটাকে সজীব রাখ্‌ছে। প্রত্যেক ঘরেই ২।৩ খানা তাঁত আছে। ভারি সুন্দর লুঙ্গি করে এরা আর দামও তেম্‌নি বেশী। এক একখানা ৫৲ টাকা থেকে আরম্ভ করে ৪০৲।৫০৲ টাকাও বিক্রি হয়। পুরুষেরা নাকি অনেকেই বিদেশে বাণিজ্য ব্যবসায় নিয়ে থাকে, তাই বাড়ী এলে নিশ্চিন্ত আরামে বাবুগিরি করে বেড়ায়। খাদ্যাখাদ্যের বিচার এদের বিশেষ নেই, এবং শারীরিক পরিচ্ছন্নতা বিষয়েও নাকি খুব

উদাসীন। তবে গায়ের রং সুন্দর বলে তা ধরা পড়ে না। স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলের মুখেই সর্ব্বদা একটা মোটা চুরট বা পাইপ লেগে আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভার এখনো এদের জাতীয় জীবনের সজীবতাকে পিষে ফেল্‌তে পারেনি। চলা ফেরা সাজ সজ্জা এবং উৎসবাদিতেই তা বেশ বোঝা যায়। উজ্জ্বল রং এবং ফুলের আদর এদের মধ্যে খুব বেশী। উৎসবের দিনে যখন মেয়েরা খোঁপায় ও চুলে ফুল পরে সুন্দর সুন্দর ফলফুলপূর্ণ ডালা আর কারুকার্য্য বিশিষ্ট পাখা হাতে নিয়ে সিল্কের নিশান আর মাথায় সিল্কের ওড়না উড়িয়ে দলে দলে ক্যাংঘরের দিকে শোভা যাত্রা করে যায় তখন দেখ্‌তে ঠিক বায়স্কোপের ছবির মতই মনে হয়। ক্যাংঘর (Pagoda) গুলি বৌদ্ধ উপাসনা-মন্দির। এখানে ৫।৭টা ক্যাংঘর আছে। সবগুলিই কাঠের তৈরী। ব্রহ্মদেশীয় নির্ম্মাণ-শিল্পীরা কাঠের উপর সব রকম কারু-কার্য্য করে এসব ঘর তৈরী করে। প্রত্যেক ক্যাংঘরে ৪।৫টি কি ততোধিক শ্বেতপ্রস্তর বা বিভিন্ন ধাতু-নির্ম্মিত বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। সেখানে নিত্য পূজা ও ভোগ হয়। ক্যাংঘরগুলি কতকটা প্রাচীন আশ্রমের মত। পুরোহিত তার শিষ্য-মণ্ডলী নিয়ে ক্যাংঘরে বাস করেন, এবং পাঠাভ্যাস বা ধর্ম্ম-চর্চ্চায় দিন যাপন করেন। পুরোহিতেরা চিরকুমার ব্রতাবলম্বী। স্থানীয় লোকেরাই এসমস্ত ক্যাংঘরের ব্যয়ভার বহন করে।

মগদের শ্মশান যাত্রা পর্য্যন্ত বলা হয়ে গেল, বোধ হয় তারপর আর কেউ জানতে চাইবে না, আর চাইলেও শ্মশানের পরপারের বিষয় লেখক উত্তর দিতে অক্ষম। মৃত্যু এদের মধ্যে বাস্তবিকই মহাযাত্রা। ৩।৪শ স্ত্রী পুরুষ মিলে সিল্কে ঘেরা রথে করে শব নিয়ে শ্মশানের দিকে শোভাযাত্রা করে যায়। সে দিন সবাই উৎসবের সাজে সেজে আসে। বাজী, বাদ্য, নিশান কিছুরই অভাব থাকে না। মৃতের জন্য এরা খারাপ জিনিসটি বেছে দেয় না। আত্মীয় বন্ধুর চিতায় অনেক বহুমূল্য জিনিস ও সুন্দর সুন্দর ফলফুল উপহার দিয়ে আসে। ঐ সমস্ত জিনিস পুরোহিতের প্রাপ্য। সাধারণ লোকের সৎকারে ৪।৫শত টাকা খরচ হয়, আর বিশিষ্ট পুরোহিত হলে ৪।৫ লক্ষও হতে পারে। লেখক ও পাঠকের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বশতঃ আপাততঃ কোন পুরোহিতের মৃত্যু ঘটে নাই। সুতরাং এইখানেই পালা শেষ করা যেতে পারে।

আর্‌সি।

["শেওলা"]

পূজার বাজার। বীরগাঁয়ের বাবু সহরে আসিয়াছেন। ছোট ছেলের জন্য জড়ির পোষাক কিনিতে হইবে; মাপ মিলিতেছিল না।

একটি অনাথ ছেলে দুয়ারে দাঁড়াইয়াছিল। বাবু তাহাকে কাছে ডাকিলেন। দোকানী তাহার শরীরে পোষাকটা আটিয়া বাবুর দিকে চাহিল। আজন্ম দুঃখী বালক অযাচিত করুণায় আবিষ্ট হইয়া রহিল।

একটু পরেই দোকানী জামাটা খুলিয়া নিয়া ভাঁজ করিয়া বাবুর হাতে গুজিয়া দিল। ছেলেটা কিছু বুঝিতে পারিল না—শুধু বেদনাতুর চোখ দু'টী জিজ্ঞাসুভাবে বাবুটির পানে তাকাইয়া রহিল।

পরপারে

কিঞ্চিদধিক আটমাস কাল অতীত হইল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় দার্জ্জিলিং এর "Step-Aside" ভবনে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নশ্বর দেহ আজ পঞ্চভূতে বিলীন হইলেও সেই অক্লান্ত-কর্ম্মী মুক্তি-সাধক স্বাধীনতার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক কার্য্যধারা ও কর্ম্মশক্তিকে বিপুলভাবে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া যে কীর্ত্তি ও প্রাণশক্তির উদ্বোধন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি আমাদের মনে ক্রমশঃ ক্ষীণ না হইয়া বরং অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াই উঠিতেছে। তাঁহার পবিত্র জীবনকথা ও কীর্ত্তিগাথা সারা বাংলা তথা সমগ্র ভারতের—এমনকি সমগ্র পৃথিবীর আকাশে বাতাসে বিঘোষিত হইয়াছে। জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য কিরূপ উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে হয় এবং কিভাবে দেশহিততরে যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়া যোগী সন্ন্যাসীর বেশে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হয় তাঁহার জীবন হইতে সমস্ত পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে সেই শিক্ষাই লাভ করিয়াছে। দেশবন্ধু বলিয়াছিলেন,—"জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত তিনি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য দান করিবেন।" তাই বুঝি অবশেষে প্রাণদিয়া অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। ভারতবাসী কোনদিন তাঁহার স্মৃতি বিস্মৃত হইলেও বাঙ্গালী তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারিবেনা। আজিও বাংলার প্রতি পল্লী, প্রতি জনপদ "দেশবন্ধু" নামে মুখরিত। আজিও বাঙ্গালী দেশবন্ধুর উদ্বোধিত দেশাত্মবোধে জাগরিত। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সেই স্বাধীনতাকামী বিরাটপুরুষ, বাংলার কে ছিলেন,—বাঙ্গালীর কি ছিলেন; এবং তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বাংলা কি হারাইয়াছে—বাঙ্গলীই বা কি হারাইয়াছে!

চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক জীবনের অত্যুচ্চ আদর্শ, উন্নত চরিত্র, বিপুল দেশাত্মবোধ, অতুল সাহস, সুমহান্ ব্যক্তিত্ব, দুর্জ্জয় কল্পনা, নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও অতুলনীয় দানশীলতার কথা ছাড়িয়া দিয়া আজ আমরা একমাত্র বাংলার ছাত্রসমাজের সঙ্গে তাঁহার কি মধুর সম্পর্ক ছিল, এবং তাঁহার জীবন হইতে ঘনিষ্ট-ভাবে ছাত্রসমাজ কি শিক্ষা লাভ করিয়াছে, অশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত তাহারই যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিব। যথার্থই বাংলার ছাত্রসমাজ দেশবন্ধুর কাছে কত অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বাংলার কত দরিদ্র ছাত্র তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া উচ্চশিক্ষিত ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কত দুঃস্থ পরিবার কতভাবে তাঁহাদ্বারা উপকৃত হইয়াছে কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে? বাংলার কত ছাত্র, কত যুবক কত সময় রাজরোষে অথবা দুষ্ট গ্রহফাঁদে পড়িয়া অন্ধকারাবাস, অন্তরীণ বা দ্বীপান্তরে পঁচিয়া পঁচিয়া অবশেষে অদ্বিতীয় আইন-ব্যবসায়ী চিত্তরঞ্জনের অশেষ চেষ্টা ও অযাচিত করুণায় মুক্তিলাভ করিয়াছে। বাস্তবিক দেশবন্ধু বাংলার ছাত্রগণকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিতে হইলে দেশের ছাত্রগণই সৈনিকের কাজ করিবে। তাই তিনি দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসাস্থল ছাত্র ও যুবকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে এবং তাহাদের সকলকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় যে তিনি সফলকাম হইয়াছিলেন

তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বাংলার ছাত্র ও যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে আজকাল আমরা যে স্বদেশ-হিতৈষণা দেখিতে পাই, যে অনুপ্রেরণা আজ তাহাদিগকে তাহাদের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা-লাভে অনুপ্রাণিত করিতেছে, তাহার অন্যতম উৎস দেশবন্ধু দাশ ও তাঁহার দেশসেবার মহান্ আদর্শ।

যে বিরাট পুরুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের অদৃশ্য প্রভাব কেবল বর্ত্তমান সময়ের নয় ভবিষ্যৎ দেশবাসিগণের মধ্যেও একটা বিশাল শক্তি ও সাহস সঞ্চারিত করিবে, এবং যে মহাপুরুষ আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইলে, অন্যতম প্রতিষ্ঠাতারূপে পূজিত হইবেন তাঁহার পুণ্যময় স্মৃতি আজ আমরা কেমনে ভুলিব? তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন মনে রাখিতে পারি যে তাঁহার আরব্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিলেই আমাদের দ্বারা তাঁহার স্মৃতির প্রকৃত তর্পণ করা হইবে, নচেৎ নয়।

আমরা সাহিত্যসেবী হইবার স্পর্দ্ধা না রাখিলেও "মালঞ্চের" কবি চিত্তরঞ্জনের সাহিত্যসেবার কথা একটিবার উল্লেখ না করিলে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বাস্তবিক দেশবন্ধু যে কেবল তাঁহার পার্থিব ধনদৌলত দেশসেবায় বিলাইয়া দিয়া ও সর্ব্বশেষে নিজের অমূল্য জীবন স্বাধীনতার যজ্ঞে আহুতি দিয়াই অমর হইয়া রহিয়াছেন তাহা নহে; বঙ্গভাষার অপূর্ব্বসৃষ্টি তাঁহার "মালঞ্চ" ও "অন্তর্য্যামী" তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যেও অমর করিয়া রাখিবে।

* * * * * *

ভারতের ভাগ্য-বিধাতা ভারতকে কি কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া চালিত করিয়া কোথায় লইয়া চলিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে দুইমাস অতীত হইতে না হইতেই ভারতের রাষ্ট্রগুরু দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথকে আমাদের মধ্য হইতে কাড়িয়া না লইলে ভগবানের সৃষ্টি উল্টাইয়া যাইত কিনা জানিনা, কিন্তু একে একে লোকপ্রিয় দেশনায়কগণকে অপসারিত করিয়া ভারতকে এইভাবে নায়কশূন্য করায়, এইদেশের ভাগ্য ও আশা আকাঙ্ক্ষা যে অনেকটা উল্টাইয়া গিয়াছে তাহার আর সন্দেহ নাই।

জীবনের শেষ সাত-আট বৎসর ভারতের জন-সাধারণের উপর সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব কমিয়া গিয়া থাকিলেও, একটা কথা আমাদের প্রত্যেক ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে চিরদিন স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনিই সমগ্রদেশে জাতীয়তার ভাব উদ্বুদ্ধ না করিলে, জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমুদয় ভারতীয়দিগকে একই মহাজাতি বলিয়া মনে করিয়া সকলের মধ্যে এক জাতীয়তা প্রচার না করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা সংস্কার ও অধিকার লাভের জন্য ৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে আন্দোলন না করিলে আজ রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, দাবী ও আদর্শ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিত না। রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে একাধিকবার ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অসাধারণ বাগ্মীতা-প্রভাবে সর্ব্বত্র স্বদেশপ্রেমের বন্যা ছুটাইয়া দেন; এবং এই সময়ই তিনি সমগ্র ভারতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও অগ্রণীরূপে গণ্য হন। বঙ্গ-ভঙ্গের পর তিনি কয়েক বৎসর উহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন, এবং উহা যে একদিন রহিত হইবেই, সেই বিষয়েও তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি কখনও ভগ্নোদ্যম হইতেন না।

জীবনে তিনি যতবার নিরাশ হইয়াছেন ততবারই পূর্ণ উদ্যমে নূতন কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপ দিয়া পৌরুষের পরিচয় দিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য কনষ্টিটিউশন্যাল আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতীয়দের স্বাধীনতা খর্ব্বকারী গবর্ণমেণ্টের অনেক আইন প্রণয়নের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করিয়া কখনও তাহা রদ এবং কখনও বা তাহার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। বাংলা গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রীরূপে তিনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটী আইন প্রণয়ন করিয়া কলিকাতা মহানগরীকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। কলিকাতাবাসী সকলেই এইজন্য তাঁহার কাছে অপরিশোধনীয় ঋণে ঋণী।

সুরেন্দ্রনাথের সমসাময়িক বহু শক্তিশালী লোক জীবিত থাকিলেও রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি স্বীয় প্রতিভা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অশেষ সদ্গুণরাশির প্রভাবে সমগ্র ভারতে নিজের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আজ ভারতে স্বাধীনতার জন্য যে অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে এবং যে দেশাত্মবোধে আজ প্রত্যেক ভারতবাসী উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূলে রাষ্ট্রগুরু দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ। তিনি যে বিপুল কর্ম্মশক্তির অধিকারী ছিলেন তাহা তাঁহার ৭৭ বৎসর বয়সে তিনখানি দৈনিক কাগজের সম্পাদকীয় কার্য্যে ব্রতী হওয়ার দৃষ্টান্তেই সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যতদিন ভারত ও ভারতবাসী থাকিবে ততদিন সুরেন্দ্রনাথের চিতাভস্ম ভারতের আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রতি ভারতবাসীর হৃদয়ে বিপুল কর্ম্মশক্তি ও অশেষ কর্ম্মপ্রেরণা সঞ্চারিত করিবে সন্দেহ নাই।

* * * *

গত ২১শে পৌষ নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্র নাথ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজপথে গতিশীল যানে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন কে মনে করিয়াছিল যে এমনই অতর্কিত অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার আয়ু শেষ হইবে? কিন্তু তাহাইত হইল! বাঙ্গালীর মাথায় যে বিনামেঘেই বজ্রাঘাত হয়।

আজ বাংলা ও বাঙ্গালী যে জগদিন্দ্র নাথের অকালমৃত্যুশোকে কাতর, তিনি শুধু নাটোরের মহারাজাই ছিলেন না, তিনি একজন সুধী, সুরসিক সাহিত্য-প্রেমিক ও সত্য সত্য দেশ-প্রেমিক ছিলেন।

জগদিন্দ্র নাথ শৈশবে রাণী ব্রজসুন্দরীর দত্তক পুত্ররূপে নাটোরের রাজপরিবারে প্রবেশ করেন। দরিদ্র ভদ্র-পরিবারে তাঁহার জন্ম। তাই তাঁহার অভিজাত সম্প্রদায়োচিত ভাবের সঙ্গে রাজবেশের অন্তরালে একটা গণতান্ত্রিক ভাবও বেশ সুস্পষ্টভাবেই লক্ষিত হইত। দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে নাটোরের রাজ-প্রাসাদে নীত হইয়া একদিনের জন্যও তিনি কুটীরের কথা ভুলেন নাই। তিনি বলিতেন,—"বংশ পরম্পরাগত দারিদ্র্যের দোষগুণ আমার রক্তের সঙ্গে শিরায় শিরায় বহিতেছে সুতরাং দেহে মনে আমি দরিদ্রেরই একজন।"

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের নাটোর অধিবেশনের পর জগদিন্দ্র নাথ রাজনীতিক্ষেত্রে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। দেশের ভূস্বামীরা যে দেশের জনগণ হইতে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নহে তাহাই তিনি তাঁহার

সকল কার্য্যে দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে জগদিন্দ্রনাথ ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। কেবল রাজ-প্রাসাদের বিলাস ব্যসনে নিমজ্জিত না থাকিয়া তিনি স্বীয় স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া প্রথমতঃ "মর্ম্মবাণী" পত্র প্রচার করেন এবং কিছুদিন পরে, "মর্ম্মবাণী" "মানসীর" সঙ্গে মিলিত হইলে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত "মানসী" পত্রিকার সম্পাদনরূপ গুরুদায়িত্বভার বহন করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী ও উচ্চপ্রাণ সাহিত্যিক হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম।

মৃত্যুর কাছে কোনদেশের লাভালাভ বা জয় পরাজয়ের বিচার নাই। চিত্তরঞ্জন গেলে ভারতের কি অবস্থা হইবে, সুরেন্দ্রনাথ গেলেইবা ভারতের কি দুর্দ্দশা হইবে সেই বিচার সে কোনদিনই করেনা। তবে লোকচক্ষুর কাছে শুধু এই জিনিষটাই ধরা পড়ে যে ভারতের যখন দুর্দ্দশা একবার আরম্ভ হইয়াছে, তখন কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজনীতি, কি কাব্য-সাহিত্য কোন ক্ষেত্রেই তার দুর্দ্দশা কম হইবে না। নয় যে মানুষ আরও বিশবৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া দেশসেবা সমাজসেবা করিতে পারিতেন, যে মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার একটা বিশেষ দরকার ছিল, তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হন কেন? আবার যে মহাপুরুষ দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছিলেন, তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ার পূর্ব্বেই মৃত্যু তাঁহাকে আমাদের সম্মুখ হইতে ছিনাইয়া লয় কেন? ভারতভূমিতে মৃত্যুর এই অবিচারিত ধ্বংস-লীলা আর কতকাল চলিবে?

* * * *

গত ৫ই মাঘ মঙ্গলবার কলিকাতার ঠাকুরবংশের শীর্ষস্থানীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বোলপুরের শান্তিনিকেতনে পরিণত বয়সে পূর্ণ শান্তিতে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াছিলেন। এত বড় বিষয়ী হইয়াও বিষয়ে তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন। তাঁহার মনের একমাত্র অবলম্বন ছিল সাহিত্য; এবং সাহিত্যচর্চ্চাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। বাণীর একনিষ্ঠ সেবকের ন্যায়ই আজীবন অশেষ উদ্যম উৎসাহ ও একাগ্রতা সহকারে তিনি সাহিত্য, গণিত ও দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিভৃতে বাঁশীর সাধনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন।

"বড়দাদা" দ্বিজেন্দ্র নাথের অনন্যসাধারণ কবিতাশক্তি ও বৈচিত্র্যময় প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও শ্রীমণ্ডিত করিয়াছিল। গণিত ও দর্শনেও তাঁর প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। একাধারে তিনি কবি সাহিত্যিক, দার্শনিক, গণিতবিদ ও স্বদেশসেবী ছিলেন। শেষ জীবনে শান্তিনিকেতনের তপোবনে তাঁহার ঋষির মত পূত পবিত্র জীবন যাপন দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার শিশুসুলভ সরলতা, উদার, অনাবিল হাস্য পরিহাস, বিনয় ও সৌজন্য দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইতেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে সজ্ঞানে পূর্ণ শান্তিতে শান্তিময় ধামে চলিয়া গিয়াছেন—ইহাতে শোক করিবার কিছুই নাই, কিন্তু অভিশপ্ত বাঙ্গালার যেস্থান একবার শূন্য হয় তাহা পূর্ণ করিবার কেহ থাকেনা ইহাই একমাত্র দুঃখ।

হাস্য-কৌতুক।

গিন্নী (চাকরের প্রতি)—হ্যাঁ রে রামা, বল্ দিকিন কী শক্ত ময়দাই না এনেছিস্?

চাকর (আশ্চর্য্য ভাবে)—সে কি মা, ময়দা আবার শক্ত হয় নাকি?

গি—হ্যাঁগো হ্যাঁ, বাবুকে পুডিং বানিয়ে দিলুম, বাবু ছুড়ি দিয়ে পর্য্যন্ত কাট্‌তে পারলেন না।

* *
*

পিতা (ছোট্ট ছেলের প্রতি)—এই যে কত চাবুক খেলি—সব গেল কোথা? ফের মিনিদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্?—তুই বড় হলে যে কি হবি!—

পুত্র (গম্ভীরভাবে)—কেন, তখন ত আমিই বাবা হব।

* *
*

নব বিবাহিতা (Fids কুকুরের প্রতি)—এসো মোর আদুরে, এস মোর কাছে ...।

স্বামী (টেবিলে পাঠ-নিরত)—কেন ওগো প্রাণপ্রিয়ে ডাক্‌ছো আমারে?

ন-বি—পাগলামো করো না। আমি আমার Fidsর সঙ্গে খেলা কর্‌ছি।

* *
*

হোটেল স্বামী (মুরব্বীচালে)—সাত সাত কাপ কফি খেলেন। দেখ্‌তে পাচ্ছি মশাই খুব কফির ভক্ত!

কফি-খোর—যথার্থ, নইলে এতটুকু কফি পাবার আশায় এতগুলি জল কি শুধুই খেলাম?

* *
*

পিতা (বেহুদা-খরচ-করা ছেলের প্রতি)—বাপু এই যে তোমার নামে ৪০৲ টাকার আর এক-খানা বিল এসেছে। এবারও টাকাটা দিচ্ছি। কিন্তু কথাটা হচ্ছে কি বর্ষার দিনের জন্য প্রস্তুত থেকো।

পুত্র—সেকি বাবা, এ বিল্ যেসত্য সত্যই একটা বর্ষার দিনের water-proof এর জন্য।

* *
*

পারুল (ন্যাকা সেজে)—দ্যাখ্, তরু, সুনীল আমায় বে কর্ত্তে চায়, আর সেদিন বল্লে কিনা আমায় ছাড়া সে বাঁচতেই পারবে না। বল্‌না ভাই, কি করেঁ তার ভুল বুঝিয়ে দি?

তরু (ফিক করে একগাল হেসে)—কেন, সে ত খুব সহজ—তাকে বে করে!

* *
*

মোটরকার-স্বামী (সগর্জ্জনে)—জোচ্চোরি আর কি,—এমন গাড়ী দিয়েছেন যে একদিনও মোটে চল্‌লো না।

মোটরকার-বিক্রেতা—উত্তম, সব চাইতে কম পেট্রল খায় এমন গাড়ীই ত চেয়েছিলেন।

* *
*

(মার্কিনে) ডাক্তার—আপনাকে কি করে হুইস্কির প্রেস্‌ক্রপশন লিখে দি? রোগের অবস্থা বল্‌বেন তবেত? বলুন না কি হয়েছে?

মদ্যপিপাসু রোগী—তাইত............আ আ—আচ্ছা আপনিই বলুন না কি হলে দিচ্চে‌ন।

* *
*

গিন্নী (কুড়ের বাদ্‌সা স্বামীর প্রতি)— কেমন লোক, কিচ্ছু না কত্তে কত্তে হয়রাণ হয়েও পড় না?

স্বামী (হাফাইতে হাফাইতে)—বাপরে, হয়রাণ আবার হই না! * * * এমনি হয়রাণ হয়ে পড়ি যে সত্যি সত্যি আর কিচ্ছু কর্‌তে ইচ্ছে হয় না।

* *
*

ডাক্তার—ব্যাথাটা দিনে কবার হচ্ছে?

রোগী—পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর।

ডা—তাইত.........আচ্ছা একবারে কতক্ষণ থাকে?

রো—প্রায় পনের মিনিট।

প্র—তোমার বয়স কত হে বাপু?

উ—এগার।

প্র—বল্‌ছকি, গেল বছর না পাঁচ বছর ছিল!

উ—হাঁ, তাইত গেল বছর ছিলুম পাঁচ, এবার ছয়—এই এগার।

* *
*

অ—ভাই, বিলেতে বেকারদল একেবারে ক্ষেপে উঠেছে আর কি।

আ—কী বোকা—তারা strike কচ্ছে না কেন?

* *
*

হাকিম (চোরের প্রতি)—রেষ্টোরেণ্ট থেকে চাম্‌চে চুরি করে নিয়েছ—তোমার পক্ষে কিছু বলবার আছে?

চোর—আজ্ঞে হুজুর আমি ভুলে নিয়েছিলুম।

হা—ভুল কি রকম?

চোর—আজ্ঞে আমি ভেবেছিলুম চাম্‌চেগুলি রূপোর।

* *
*

পিতা—কিরে খোকা, ইস্কুলে যাস্‌নি কেন?

পুত্র—না বাবা, আমি ইস্কুলে যাবনা, মাষ্টার মশাই পাগল হয়েছেন।

পি—সে কি?

পু—সেদিন বল্লেন চার আর পাঁচে নয় হয়, কাল কিনা বলেন ছয় আর তিনে নয়।

* *
*

বুড়ো ঠাকুর্দ্দা এই প্রথম বায়োস্কোপে গিয়েছিলেন—বাড়ী এলে নাতি জিজ্ঞেস করল্—কি ঠাকুর্দ্দা? কেমন দেখ্‌লেন?

ঠাকুর্দ্দা—"চমৎকার"। দেখ্‌লাম ত খুব ভালই কিন্তু কি বল্‌ব দাদা, বুড়ো বয়সে কাণের মাথা খেয়েছি তাই কিচ্ছু শুন্‌তে পেলামনা।

* *
*

আদুরে স্ত্রী (মন-ভোলা প্রফেসার স্বামীর প্রতি)—হাঁগা, হপ্তা ধরে আমায় একটিবার চুমো খেলেনা?

প্রঃ স্বামী—কি অন্যায়ই হয়ে গেছে। তাইত, তবে কাকেই বা এদ্দিন চুমো খেলাম?

এই চুট্‌কী গুলোতে মৌলিকতা নেই বল্‌লেই হয়। ইংরেজী থেকে নেয়া নমুনার উপর খানিকটা রং ঢেলে দেয়া হয়েছে মাত্র। কস্তুরী যেমন একটা-গন্ধের দানই রেখে যায় অনন্ত কালের গায়ে, তেমনি প্রকৃত রসিকতা শাশ্বত—রস সঞ্চারে ও হাস্যোৎপাদনে; পাঠকবৃন্দ সুধীজন, তাই "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্" হওয়ার আশঙ্কা নাই।

ঢাকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। কবির অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনার জন্য যে বিপুল আয়োজন এখানে হইয়াছিল তাহাতে নাকি কলিকাতার কোন কোন সংবাদ-পত্রের মতে অনেক লাট বড়লাটের মনেও ঈর্ষার উদ্রেক হইতে পারে। কাজেই আমাদের আর সেই বিষয়ে কিছু বলিবার নাই।

কবি একদিন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী (বাঙ্গাল্ নয়ত ?) যে তাঁহাকে ভালবাসে তাহা তিনি ঢাকায় আসিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বেও তাঁহার এবিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার ত তেমন কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইনা। বিশ্বকবি ত বিশ্বজয়ের আগে বা পরে এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আর কখনও তাঁহার গুণমুগ্ধ জয়মুগ্ধ পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণকে তাঁহার প্রতি তাহাদের অন্তরের গভীর প্রীতি ভালবাসা দেখাইবার কোন সুযোগসুবিধা প্রদান করেন নাই। তাই আমরা এবার দেখিয়াছি, কবিকে আপনাদের মধ্যে পাইয়া কে কাহার আগে যাইবে, কে কাহার আগে অঞ্জলি প্রদান করিবে, কে কোথায় রাখিবে ইহা লইয়া ঢাকায় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কবিও হয়ত অনেকটা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আমরা আশাকরি বাঙ্গালীর ভালবাসায় কবির কোন সন্দেহ বা মিথ্যা ভ্রম থাকিলে এবার তাহা দূর হইয়াছে।

কবির অভ্যর্থনা উপলক্ষে যে সব অভিনন্দন পত্র পঠিত হয়, তাহার উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। দেশের মহাপুরুষদের মুখ হইতে আমরা যুগে যুগে যে সত্যের বাণী শুনিয়া থাকি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি ও সামর্থ্য যেন আমাদের নাই, তাই দেশের আজ এই অবস্থা। কবি একদিন বলিয়াছেন, "সেবা ও আত্মোৎসর্গ" ব্যতীত প্রকৃত কাজ হইতে পারেনা। অবিরত চেষ্টা এবং আত্মোৎসর্গের বলে নিজের দেশের উপর যে অধিকার ও শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় সেই অধিকার ও শক্তি যতদিন পর্য্যন্ত আমরা লাভ করিতে না পারিব ততদিন পর্য্যন্ত শাসকবর্গের সহিত আদান প্রদানে মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমরা চলিতে পারিবনা, আর সেই আদান প্রদানে কোন খাঁটী লাভও আমাদের হইবেনা।" কবির মুখে দেশের কথা শুনিলেই আমাদের সেই স্বদেশী আন্দোলনের কথা মনে হয়, যখন কবি গাহিয়াছিলেন,—

"কর মোরে সম্মানিত নব বীর-বেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্য ভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য করো দাসে
সকল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি' নিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে ক'রে দাও সক্ষম স্বাধীন।'

কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্যভাবে অবতীর্ণ হইবার জন্য এই প্রার্থনা করিয়া, কিছুদিন পরে যখন তিনি সেই আন্দোলন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়া গাহিলেন,—

"বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি ত আর নাই।
এগিয়ে সবে যাওনা দলে দলে,
জয় মাল্য লওনা তুলি' গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়োনা ভাই।
অনেকদূর এলেম সাথে সাথে
চলেছিলেম সবাই হাতে হাতে
এই খানেতে দুটি পথের মোড়ে,
হিয়া আমার উঠ্‌ল কেমন করে
জানিনে কোন ফুলের গন্ধ ঘোরে
সৃষ্টিছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে
আর ত চলা হয়না সাথে সাথে।"

তখন কিন্তু তাঁহার এই পথের মোড়ে আসিয়া ভিন্নপথ লওয়াটা ভাল হইয়াছিল কি মন্দ হইয়াছিল, তাহা নিয়া অনেকেই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজ যখন দেখি বাংলার কবি বিশ্বের দরবারে দুঃস্থ ভারতের জন্য উচ্চ আসন অর্জ্জন করিয়া বিশ্বের জয়মাল্য গলায় পরিয়া বিশ্ববরেণ্য কবি সাজিয়াছেন, তখন কিন্তু আবার আমাদেরই মনে হয় যে ঐ পথের মোড়ে আসিয়া ভিন্ন পথ লওয়াটাই ছিল কবির স্বধর্ম্ম, এবং এই স্বধর্ম্মপালন করিয়াই আজ বাংলার কবির পক্ষে ভারতের অতিথিশালা হইতে "জগতের যে যেথায় আছ, আমার কাছে এস" বলিয়া সমস্ত জগতবাসীকে আহ্বান করা সম্ভবপর হইয়াছে।

...তারপর, যাহা বলিতেছিলাম—

কবি তিন দিন পর্য্যন্ত ঢাকা জনসাধারণের অতিথিস্বরূপ মিউনিসিপালিটী, পিপ্‌লস্ এসোসিয়েসন, বিশ্বভারতী, দিপালী, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির অভিনন্দন গ্রহণ করিয়া ১০ই ফেব্রুয়ারী বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আতিথ্য স্বীকার করিয়া বেলা আড়াইটার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শুভ পদার্পণ করেন এবং ২—৪৫ মিনিটের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী-সঙ্ঘের অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করেন। উত্তরে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বীণাকণ্ঠে প্রায় ৫০ মিনিট ব্যাপী সুদীর্ঘ বক্তৃতায় যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া সকলেই বিশেষ মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। প্রথমেই তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করেন যে উচ্চ বক্তৃতা-মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ছাত্রদের সম্মুখে পোষাকীভাবে বক্তৃতা করিয়া নিয়মরক্ষাকরার কাজটিকে তিনি কোনদিনই পছন্দ করেন না।

নেহাৎ আপনার জনের মত প্রাণ খোলাখোলি ভাবে মিশিয়া উভয়ের প্রাণের কথার আদান প্রদান করাটাই তিনি খুব ভালবাসেন এবং তাহা করিতে পারিলেই সব চাইতে বেশী সুখী হন। দূরে দূরে থাকিয়া বক্তৃতা দিয়া বা শুনিয়া বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সত্যিকার পরিচয়লাভ কখনও ঘটিতে পারে না। তাই তিনি চান ছাত্রেরা তাঁহাকে চুরি করিয়া আপনাদের মধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহার প্রাণের কথা কাড়িয়া লউক এবং তাঁহাকেও ছাত্রগণকে খুব ঘনিষ্টভাবে চিনিয়া লইবার সুযোগ প্রদান করুক। এখানে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার চুলে 'পাক ধরিলেও' তাঁহার মনটা খুবই কাঁচা রহিয়া গিয়াছে এবং তিনি ছাত্রদেরই সম-বয়সী। কাজেই অবাধ মেলামেশায় সঙ্কোচ করিবার কিছুই নাই। এইসব কথায় কিন্তু আমাদের মনে হইয়াছিল,—

"কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পানে নজর এত কেন?
পাড়ায় যত ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক-বয়সী জেনো।
... ...
সবাই মোরে কয়েন ডাকাডাকি
কখন শুনি পরকালের ডাক?
সবার আমি সমান বয়সী যে
চুলে আমার যত ধরুক পাক।"

তারপর কবি তাঁহার বাল্যকাল ও ছাত্রজীবন স্মরণ করিয়া বড়ই দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন তখনকার দিনে শিক্ষার এত সুব্যবস্থা, জ্ঞান অর্জ্জনের এত সুযোগ সুবিধা মোটেই ছিল না। বাহ্য জগতের শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞানের সঙ্গে ভারতের এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ও সংযোগের নিতান্তই অভাব ছিল। তাই আজ তিনি বিংশ শতাব্দীর যুবক সাজিয়া বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান আহরণ পূর্ব্বক নূতনতর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য অনেক সময় একটা ব্যাকুলতা অনুভব করেন। শেষে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে ডাকিয়া বলেন "দেশের বড় সুসময় এসেছে। দেশের জন্য তোমরা আজ নূতন ক'রে, বড় ক'রে ভাবতে শেখ। বড় আদর্শ সম্মুখে রেখে কেবল কাজ ক'রে যাও। তোমাদের মধ্যে যে বিপুল কর্ম্মশক্তি আছে তা' কেবল নিজেরে প্রচার করতেই ব্যয় করে ফেলো না—কাজে লাগিও। এঞ্জিনের সবটুকু ষ্টিম্ কেবল হুইসিল দিয়ে ফুকিয়ে ফুকিয়েই নিঃশেষ করে দিওনা।"

কতবড় সত্যকথা। বাঙ্গালীর যে আত্মপ্রচারেই সব ষ্টীম্ খরচ হইয়া যায়, সে রেলগাড়ী চালাইবে কি দিয়া? বাঙ্গালী আমরা ভুলিয়া যাই,—

"আমারে না যেন করি প্রচার
আমারি আপন কাজে;
তোমারি ইচ্ছা কর হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।"

কবি ঐ দিনই বৈকাল বেলা সারে চারিটার সময় মুস্‌লিম্ হলের অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করেন।

তাহার উত্তরে তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপনদ্বারা ভারতে যে বিশাল জাতীয়তার উন্মেষ হইবে ভারতের মুক্তি যে শুধু তাহারই উপর নির্ভর করে, তাহাই সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তৎপর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জ্জন হলে "Meaning of Art" সম্বন্ধে ইংরেজীতে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতাপাঠ করেন। এইসব বক্তৃতা অনেক কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছে। কাজেই অমরা সে বিষয় আর কিছু বলিবনা।

একই দিনে সহরের অন্যান্য স্থানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচ ছয়টা সভায় বক্তৃতা করিয়া কবি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। কাজেই ১ ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারীর সব Porgramme cancelled হয়।

১১ই ও ১২ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঢাকায় আগত ইতালীয় প্রোফেসার Formichi এবং Tucci কার্জ্জন হলে, "Meditative and Active India" ও "Idealistic School in Buddhism" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা পাঠকরেন। পরদিন ১৩ই ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় কবিবর অসুস্থ শরীরেই "Rule of the Giant" সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাঁহার এবারকার কর্ত্তব্য শেষ করেন। ঢাকা হল ও জগন্নাথহলে কবিসম্বর্দ্ধনার যে আয়োজন হইয়াছিল কবির অসুস্থতা নিবন্ধন তাহা Cancelled হওয়ায় ঢাকা ও জগন্নাথ হলের পক্ষ হইতে দুইখানা অভিনন্দনপত্র শনিবারের বক্তৃতার পূর্ব্বে কার্জ্জন হলেই পঠিত হয়। ইহার উত্তরে কবি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন নাই। নেহাত কাতরস্বরে একটি কথা মাত্র বলিয়াছিলেন "আমি যদি তোমাদিগকে কিছু দিয়ে গিয়ে থাকি তবে আমার স্মৃতির সঙ্গে তাই তোমরা মনে রেখো।"

১৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার বেলা এগারটার গাড়ীতে কবিবর ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ রওনা হন।

ঢাকায় বুড়ীগঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া সেদিন কবি করোনেশন পার্কে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের দিকে হাত বাড়াইয়া যখন বলিয়াছিলেন, অস্তসাগরের কূল হইতে তাঁহার মিত্র "রবি" তাঁহাকে ডাকিতেছে, তখন সকলেই বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন। যদিও কবি তাঁহার "বড়দাদাকে" হারাইয়া তাঁহার শোকে কাতর হইয়াই নিজের বিদায়ের সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছেন, তথাপি আমাদের মন কিন্তু তাহা মানিতে চায় না। আমাদের মনে পূর্ণ আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে তিনিও তাঁহার দীর্ঘজীবী পিতা ও অগ্রজদের মত দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া বিশ্বমানবের আরও অশেষ কল্যাণ ও আনন্দের কারণ হইবেন। আটাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি গাহিয়াছিলেন,—

"এবার চলিনু তবে।
সময় হয়েছে নিকট, এখন
বাঁধন ছিড়িতে হবে।"

তখন যেমন আমরা ইহাকে শুধু গান বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম, আজ কবির এই শেষ-বিদায়-গ্রহণ-সূচক কথাগুলিকেও আমরা তেমনি 'কথার কথা' বলিয়াই মনে করিতেছি, আমরা এখনই তাঁহাক ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নাই।

খেলা।

[শ্রীহীরেন্দ্র নাথ রায় বি, এ]

কবে কোন্ সুদূর অতীতে হে মহান্ বিরাট পুরুষ,
আপনি আপনা হ'তে
নানারূপে নানাছন্দে ছুটে এলে অনন্তের কোলে,—
কোন্ ছলে,
কেহ নাহি জানে।
সেই হ'তে কেন তুমি পলে পলে যুগ যুগ ধরি
হারাণো সুরের মত
কত ভাবে কত সুরে ফুকারিছ গুমরি গুমরি
কত তালে
অতি সঙ্গোপনে॥
শরতের ভরা নদী বেয়ে উচ্ছল যৌবন বেগে
ধাও তুমি কার পানে?
ঊর্ম্মি দিয়ে মালা গাঁথ জ্যোৎস্না-ধোয়া গলিত কাঞ্চনে,
কার তরে
বল, কেবা জানে!
অথবা জলধিবক্ষে প্রলয়ের জীমূত গর্জ্জনে
নিষ্ফল আক্রোশে কেন
আপনার বুকে জালি হোম-শিখা বাড়ব-অনল
দহ আপনারে
তীব্র আস্ফালনে?
শ্রাবণের বরিষণে ঝলকে ঝলকে, কার তরে
আঁখিনীরে ভাসাও মেদিনী?
মেঘের কাজল পরি বিজলীর চকিত চমকে
চাও কারে
দেখিবার তরে?
অথবা বৈশাখী-রাতে ঝঞ্ঝা সাথে নৃত্য কর তুমি,—
আপনার তপ্তশ্বাসে

চূর্ণিয়া আপন সৃষ্টি,—ধ্বংস মাঝে মহাকালরূপী ;—
একি জানিবারে
শুধু আপনারে ?
স্বয়ং প্রলয়ঙ্কর, শঙ্করের মুখে ঘোষিলে কি বাণী,
আপনার প্রকাশের মাঝে
মায়ার আচল রচি অহরহ বিরহের খেলা,
আপনায়
মিলিতে আপনি।
ঘর্ম্মঝরা কর্ম্মযোগে পুনঃ সাধিছ এ কোন্ খেলা ?
কার তরে কর্ম্ম করা ?
তত্ত্বমসি, পূর্ণ তুমি ; কার তরে কর্ম্মের মেখলা
জড়াতেছ
চৌদিকেতে টানি ?
কার তরে ধেনু লয়ে গোকুলেতে নূপুর সিঞ্জনে,
গোপাঙ্গনাগণে
প্রাণ মন উচাটন করি' দিলে বাঁশরীর গানে !
নীপকুঞ্জে
লুকোচুরি খেলে
কার তরে অবহেলে গোপীদের দুকুল মজালে ?
কালীদহ নীলোৎপলে
কার রূপ দিলে ঢেলে ? বিচ্ছেদ-যাতনা-রসে
যমুনারে
উজান বহালে !
কার তরে প্রকৃতি পুরুষ প্রাণ মরমে মরমে
উঠে ঝঙ্কারিয়া,
ফুকারিয়া উঠে কোন্ মর্ম্মন্তুদ বিরহ বেদনে
শতকাজে
রহিয়া রহিয়া !
প্রাণপণে পেতে চায় ভুলে যাওয়া গানের রাগিণী !
বর্ণে গন্ধে রূপে গানে
একি খেলা খেল তুমি মিলনের মাঝে
অহরহ
বিচ্ছেদ রচিয়া !

উড়ো খবর।

[শ্রীমান্ ঘূর্ণীবায়ু]

বেতার খবর—

বিলাতে সরকারী বেতার খবর এতদিন লিফিল্ড হইতে পাঠান হইত। কয়েকদিন হইল রাগবিতে বেতার খবরের সাজ-সরঞ্জাম ও মাল-মসল্লা স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। পৃথিবীর মধ্যে রাগবির যন্ত্রপাতির বেতার-বিদ্যুৎ উৎপাদনের শক্তি সবচেয়ে বেশী, এইরূপ বিলাতী কাগজ বলিয়াছেন। নিজের গাছের ফল সবচেয়ে মিষ্টি হয়; তাঁহাদের ধারণাও সেইরূপ কি না জানি না। এদেশীয় খবরের কাগজগুলি বেতার-ধরা যন্ত্রপাতি যদি নিজ নিজ আফিসে বসান, তাহা হইলে বিলাতের সংবাদ জানিতে cablegramএর পিছনে তাঁহারা বৎসর বৎসর যে অজস্র টাকা ঢালিতেছেন তাহা বাঁচিয়া যাইবে—সন্দেহ নাই। প্রথমটা যন্ত্রপাতি বসাইতে খরচা একটু জমকালো রকমের হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ঘাব্‌রাইবার কোন কারণ নাই।

ট্রেণে বেতার টেলিফোন—

আজকাল প্রতীচ্য জগতে বেতার সম্পর্কীয় সর্ববিষয়ই 'জলবৎ তরলং' হইয়াছে। এই সেদিন জার্ম্মানীতে ট্রেণে ট্রেণে বেতার টেলিফোনের এরূপ সুবন্দোবস্ত ও উন্নতি করা হইয়াছে যে ঘণ্টায় ৬০ মাইল চলা গাড়ীতেও যাত্রীগণ বেতার খবর স্পষ্ট শুনিতে পান। পূর্ব্বে যন্ত্রপাতির শক্তি ও গুণ কম থাকাতে এতদিন বেতার টেলিফোন বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই।

এই প্রসঙ্গে বলিতে হয় আমাদের দেশ এতদ্‌বিষয়ে অন্যান্য সভ্যজাতির অনেক পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই এবং আরও হয়ত দুই এক জায়গায় বেতার সঙ্গীত ও খবর পাঠানের যন্ত্র বসান হইয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এদেশেও 'বেতার' সম্যক্ সমাদর লাভ করিবে। সুখের বিষয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতার-খবর-ধরা যন্ত্র বসান হইয়াছে এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের ছাত্রগণ বেতার সম্বন্ধে বই-পড়া ও হাতে-কলমের শিক্ষা উভয়ই পাইতেছেন। আধুনিকতম অন্যান্য উচ্চ বিষয়েও তাঁহারা মনোযোগ দিতেছেন।

টেলিগ্রামের বাহার—

বিগত চত্বারিংশৎ ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের দিনে (২৬শে ডিসেম্বর তারিখে) কাণপুর টেলিগ্রাম আফিস ৬০,০০০ হাজার শব্দ তারে পাঠাইয়াছে, ২৩শে হইতে ২৯শে পর্য্যন্ত অনুমান ২,৬৩,০০০ শব্দ শুধু কংগ্রেসের খবরের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। টেলিগ্রামের এরূপ হাট লাগিবে বুঝিয়া গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই আলাদা আফিস ও লোকজনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের এই অনুকম্পার জন্য কংগ্রেস হইতে গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জানান হইয়াছে।

স্কুল-ছেলেদের শিক্ষা—

৫।১০ বৎসর পূর্ব্বেও যদি কেহ বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া পদ্ধতির বিরুদ্ধে এতটুকু সন্দেহ দেখাইতেন তাহা হইলে দেশশুদ্ধ লোক তাহাকে মধ্যম-নারায়ণ তৈল মাখিতে কিম্বা বহরমপুরে পাঠানের বন্দোবস্ত করিতেন। কিন্তু এই প্রচণ্ড ভুলটী আজ আমাদের চোখের সামনে এরূপ সহজভাবে দেখা দিয়াছে যে এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্বেকার ধারণা ভাবিতে গেলে নিজেদিগকে লজ্জিত হইতে হয়। কোন জাতিই স্বীয় ভাব ও ভাষার সম্পদ জগতের সাহিত্য-ভাণ্ডারে পরকীয় ভাষার মুখোসের ভিতর দিয়া দান করিতে পারেনা, এই মর্ম্মে সেদিন (ওস্‌মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌন্সিল সদস্য) ডাঃ হায়দারী বক্তৃতা দিয়াছেন। বিগত বড়দিনের ছুটীতে সমগ্র বঙ্গের রাজকীয় স্কুল শিক্ষকদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি-মহাশয় তাঁহার রিপোর্টে উক্ত কথা পুনরাবৃত্তি করিয়া আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির অন্যান্য দোষের মধ্যে তিনটী দোষই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন,—প্রথমে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি কোনপ্রকার নজর দেওয়া হয় না, দ্বিতীয়তঃ করে-খাওয়া কিম্বা কোনপ্রকার কার্য্যকরী শিক্ষা নাই এবং শেষে বিদেশী ভাষায় শিক্ষা দান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার গ্রীভস্ সাহেব সভাপতির আসন হইতে এই সব বিষয়ে সহানুভূতি দেখাইয়া বলিয়াছেন, বাংলা গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে কলিকাতায় Intermediate Board সংস্থাপন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় একটা খসরা প্রস্তুত করিয়াছেন। Board হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রকার আয়ের লাঘব হইতে পারিবেনা, পূর্ব্বের ন্যায় ইহা Matriculation পরীক্ষা পরিচালনা করিবে; Board সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে এবং মাতৃভাষার মধ্য দিয়াই শিক্ষাদান করিতে হইবে;—এইরূপ আরও কয়েকটী সর্ত্ত ঐ খসরায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ৺আশুতোষের বর্ণিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'tradition' (of liberty and independence) আজ পর্য্যন্ত অটুট রাখিয়া Greaves সাহেব সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বাংলাতে প্রাথমিক শিক্ষা—

বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন ও বিস্তারের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটী বিল প্রস্তুত করিয়াছেন। এরূপ শিক্ষা কালবিলম্ব না করিয়াই প্রচলন করা উচিত,—বিশেষতঃ যে দেশে লেখা-পড়া জানা লোকের সংখ্যা খুব কম। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াইয়াছে টাকার ব্যাপারে; গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা, education cess কিম্বা ঐ রকমের একটা ট্যাক্স বসাইয়া দরকারী টাকার কিয়দংশ উঠান এবং বাদবাকীটা গবর্ণমেণ্ট পূরণ করেন। সেদিন হাবড়া টাউন হলে এই প্রসঙ্গে একটা সভা বসিয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত শাস্‌মল মহাশয় বক্তৃতা কালে বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি সর্ত্ত পালন করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবে; শিক্ষার বোর্ড দেশের লোকের দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন এবং অন্যান্য বিষয়ে পরিচালনার ভার সেই বোর্ডের উপর ন্যস্ত হইবে এবং শিক্ষা ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের নাম-গন্ধও কোন কিছুতে থাকিবেনা,—এক‌য়েকটী শাস্‌মল মহাশয়ের সর্ত্তগুলির মধ্যে প্রধান। এ সব ভাবিবার কথা।

পৃথিবীতে লেখা-পড়া-জানা লোকের হিসাব—

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	
১। হল্যাণ্ড	৮১	৮৬	৯৪.৫	১০০.০	শতকরা।
২। নরওয়ে	৮২	৮৭	৯৫.০	১০০.০	„
৩। জার্ম্মানি	৮৩	৮৮	৯৬.০	১০০.০	„
৪। ফরাসী	৮৪	৮৮	৯২.০	৯৪.০	„
৫। মার্কিণ	৮৫	৮৬	৯৯.০	৯৫.৪	„
৬। ইংলণ্ড	৮১	৮৬	৯৭.০	৯৩.৫	„
৭। জাপান	৬৫	৮০	৯৫.০	৯৭.৮	„
৮। ফিলিপাইন	২৯	৪৭	৫৭.০	৭০.৫	„
৯। বৃঃ ভারত	৩	৩.৪	৪.৫	৫.২	„

[দ্রষ্টব্য :—বঙ্গদেশে বৎসরে প্রতি মাথা হিসাবে শিক্ষার জন্য ১ টাকারও কম ব্যয়িত হয়]

ডাঃ রমণের রুশিয়া ভ্রমণ—

রুশিয়ায় বিজ্ঞানের 'মেলাতে' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রমণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। ভ্রমণকালে তাঁহার মনে রুশিয়া সম্বন্ধে যে ছাপ পড়িয়াছে তাহাই তিনি সেদিন University Institute এ ব্যক্ত করিয়াছেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক বলিয়া তিনি সর্ব্বত্রই রাজসমারোহে আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। জগতের চোখে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান এত উচ্চে বলিয়া প্রত্যেক ভারতবাসী নিজেকে গর্ব্বিত মনে করিতে পারেন। রুশিয়ায় শ্রীযুক্ত রমণ দুইটী জিনিস বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহাদের সহৃদয়তা ও আতিথ্য এবিষয়ে প্রাচ্যজগতের মৌরসি পাট্টা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ স্নেহপরবশা ভগিনী সাম্রাজ্য কয়টী বলশেভিক ও সভিয়েট রুশিয়ার যেরূপ বিভীষিকার মূর্ত্তি সমগ্রজগতকে দেখাইয়াছেন সেরূপ মূর্ত্তি রুশিয়া-জীবনের যথার্থ প্রতিকৃতি হইয়াছে কিনা সন্দেহ। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, লেখাপড়া, গানবাজনা, কৃষি-বাণিজ্য কোনটাতেই তিনি রুশিয়াকে খাটো দেখেন নাই।

পঞ্জাবে মেয়েদের কথা—

মেয়েরাও সদস্য নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন,—পঞ্জাব কৌন্সিলের এই প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টও অল্প কয়েকদিন হইল সায় দিয়াছেন; সুতরাং আগামীবারে নির্ব্বাচন কালে মেয়ে মহলেও রাজনৈতিক বিষয়ে ঝড় না বহিলেও মৃদুমন্দ সমীরণ যে খেলিয়া যাইবে তাহা বেশ অনুমান করা চলে। কেবল মাত্র স্ত্রী-পুরুষ ভেদে উভয়ের মধ্যে প্রায় সব ব্যাপারে যে অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তোলা হয় তাহা অযৌক্তিক ও সম্পূর্ণ অসমর্থনীয়। ভগবানের সৃষ্টি-রাজ্যে স্ত্রী পুরুষের প্রকৃত সমন্বয় না হইলে মানুষের পূর্ণবিকাশ হইতে

পারে না ; সুতরাং স্ত্রীজাতিকে পুরুষেরা যতই দূরে ফেলিয়া রাখিবে, ততই তাহারা নিজেদের মঙ্গল ও উন্নতির ধারাতে বাঁধা দিবে।

বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজও এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু কার্য্যতঃ এ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের সায়-সাপেক্ষ হইলে দেশের লোকের এবিষয় একটা 'এস্‌পার ওস্‌পার' করিয়া ফেলাই উচিত। শুধু নির্ব্বাচনে ভোট দিবার ক্ষমতা কেন, মেয়েদিগের সদস্য হইবারও আইন করা যুক্তিসঙ্গত।

বিলাতে সম্প্রতি পুরুষ ভোটার হইতে মেয়ে ভোটারের সংখ্যাই বেশী।

বিলাতে শীত—

বিলাতে এবার ভয়ানক শীত পড়িয়াছে। তুষারপাতে সমস্ত পথঘাট বরফের সমুদ্র হইয়া গিয়াছে, সকল রকমের চলাচল কয়েক দিন প্রায় বন্ধ ছিল। বরফ কাটিবার বড় বড় যন্ত্রদিয়া বরফ কাটিয়া রেল লাইন পরিষ্কার করা হইয়াছিল। বিলাতের উত্তাপ বরফ-জমা উত্তাপেরও নীচে নামিয়াছিল। ইহাও কিছু ভাল। ইউরোপের অন্যান্য দেশের উত্তাপ কিন্তু বিলাতের চেয়েও কম ছিল। সে সব দেশে অনেক সময় এত বরফ জমিয়া যায় যে, যন্ত্র দিয়া কাটিয়াও কুল পাওয়া যায় না। কাজেই রেলগাড়ীও কতকদিন বন্ধ থাকে। তখন বরফের উপর দিয়া চলে এইরূপ কুকুরবাহী গাড়ীর সাহায্যে ডাক সরবরাহ করা হয়।

রাস্তায় প্রথম গ্যাসের আলো—

একশত বৎসর পূর্ব্বে সেক্‌সার্ণ প্রদেশে ফ্রায়েবার্গে যখন প্রথম গ্যাসের আলো রাস্তায় রাস্তায় বসান হয় তখন জার্ম্মানীর খবরের কাগজগুলি এমন সব অদ্ভুত ধরণের কথা বলিয়াছিলেন যে সে সব মনে পড়িলে আমাদের এখন শুধু হাসিই পায়। …প্রকৃতির নৈশ অন্ধকার বিদূরিত করিলে দৈব নিয়মের উল্লঙ্ঘন ও অধর্ম্ম করা হইবে ; মানুষের স্বাস্থ্য ও নৈতিক জীবনের অনিষ্ট হইবে, প্রণয়িগণ অধিক রাত্রি বাহিরে কাটাইবেন, তাঁহাদের সর্দ্দিকাশি হইবে ; ঘোড়াগুলি আলো দেখিয়া চমকাইয়া উঠিবে। চোর ডাকাতের সুবিধা হইবে। আর রাত্রিকালে ঘুমাইয়া কাটাইবার সময় মিছামিছি বাতি জ্বালিয়া পয়সা খরচ করায় একটা মহাপাপও হইবে ইত্যাদি।

বেতার দুর্ঘটনা—

একদিন রাত্রে ডেভেণ্ট্রি বেতার ষ্টেশনে তাড়িৎ সঙ্কোচ করিবার যন্ত্রে একটি ছোট ইঁদুর পড়িয়া গিয়াছিল ; ফলে বিলাতের সব জায়গা হইতে যাঁহারা বেতার খবর ধরিতেছিলেন, তাঁহারা ১২ মিনিটকাল 'নিঃশব্দ' (Silence) শুনিতে পাইয়াছিলেন।

যন্ত্রের বাহার—

জগতে বেতারে সব চাইতে বড় করিয়া কথা বলিবার যন্ত্র (loud speaker) জার্ম্মানীতে তৈয়ারী

হইতেছে। সিকি মাইলের মধ্যে লোকজন ইহার কথা শুনিতে পাইবে। যন্ত্রটির তিনটি মুখোস থাকিবে। আর প্রত্যেক মুখোসের 'হা' চল্লিশ ফিট (২৬½ হাত) এবং যন্ত্রটি উচ্চতায় ১১০ ফিট (৭৩⅓ হাত) হইবে। প্রেরিত খবর ঐ যন্ত্র দুইশত গুণ বড় করিয়া বলিবে।

টেলিফোনে চিকিৎসা—

আমেরিকার তারটেলিফোনে ১০০০ মাইল দূর হইতে একজন রোগীর নাড়ীর স্পন্দন ও তাহার অবস্থা ও উপসর্গ ১৫০০ ডাক্তার শুনিতে পাইয়াছিলেন। আজকাল পাশ্চাত্য-জগতে গ্রামের সাধারণ লোকদিগকে তাহাদের রোগের ব্যবস্থার জন্য অর্থনষ্ট (ও মনঃকষ্ট) করিয়া মহানগরীতে যাইতে হয় না। গ্রামের ডাক্তার সহরের পারদর্শী ডাক্তারের নিকট রোগীর অবস্থা জানাইয়া ব্যবস্থা লইতেছেন এই তার-টেলিফোনের ভিতর দিয়া।

বৈজ্ঞানিক আইন্‌ষ্টিন্—

জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টিন্ (Einstein) দশ বার বৎসর পূর্ব্বে যেইদিন তাঁহার নূতন তত্ত্ব (relativity) প্রচার করিয়াছিলেন সেইদিন হইতে বিজ্ঞান-জগতে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে। তত্ত্ব সমস্যাপ্রকৃতিক—সত্য হইতেও পারে, না-ও পারে। কিন্তু উহা যে একেবারে আজগুবি কিম্বা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় তার প্রমাণ এই যে,—পরবর্ত্তী সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত জগতের খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিক ঐ তত্ত্বের আনুকূল্যে পরীক্ষা-ঘটিত (হাতে-কলমে) অনেক ফল পাইয়াছেন, আর চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাদের চিন্তার ধারা আজ হঠাৎ বিশ্লেষণ করিতে বসিয়াছেন। ছেলে-বেলা হইতে পার্থিব বস্তুর বল-বিজ্ঞান (mechanics), নিউটনের আইন-কানুন এবং ইউক্লিডের জ্যামিতি শিখিয়া আসিতেছি, আর (পরীক্ষার খাতিরে) ধ্রুব সত্য বলিয়াই জানিয়াছি। কিন্তু এ-সব তলাইয়া দেখিলে মনে খটকা লাগিয়া যায়, কেন না ঐ সব শাস্ত্র কতকগুলি assumptionএর উপর দাঁড় করান হইয়াছে, এবং ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ, সরল-রেখা, বিন্দু, আয়তন ইত্যাদির সংজ্ঞাও ভাল ছেলের ন্যায় মানিয়া নেওয়া হইয়াছে। স্থুল-কথা, আমাদের চিন্তা ও জ্ঞান বস্তুজগতের যে ছাঁচে ঢালা সে-সব সত্য না-ও হইতে পারে। কেমন করে আরও সুস্পষ্ট ও সুন্দর যুক্তি দ্বারা ঐ সব চিন্তা করা চলে, Einsteinএর তত্ত্ব তাহাই ইঙ্গিত করিতেছে।

* * *

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতির্বিবদ পণ্ডিতগণ সূর্য্যগ্রহণের সময় আকাশের ফটো লইয়াছিলেন। ফটো হইতে অনেক কিছু তত্ত্বই তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের আবিষ্কারের প্রধান জিনিসই হইল, আলোর সরল-গতি বাধিয়া যায়—মাধ্যাকর্ষণীর 'টানে'। সূর্য্যের তীক্ষ্ণ আলোকের জন্য কতকগুলি সন্নিকটবর্ত্তী তারা বৎসরের কোন সময়ই চোখে পড়ে না। গ্রহণের সময় তাহাদিগকে দেখা যায় বটে কিন্তু তাহাদের আলো সূর্য্যকে ঘেসিয়া আসিতে বাঁকিয়া যায়। কাজেই তাহারা আকাশের

গায়ে খানিকটা সরিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। Einstein এর তত্ত্বে এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী লেখা ছিল। এই তত্ত্ব এখনও সময়ের বিচার-সাপেক্ষ; যদি টিকিয়া যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে স্কুলের ছেলেদের জন্য জ্যামিতি ও বস্তু-পদার্থের বিজ্ঞানশাস্ত্র নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। * *

সূর্য্যগ্রহণ—

সেদিনকার সূর্য্যগ্রহণে জগতের সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র হইতে জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণকে পাঠান হইয়াছিল সেই সব জায়গায়, যে-সব জায়গা হইতে গ্রহণ অনেকক্ষণ ও সবচাইতে ভাল দেখিতে পাওয়া যাইবে। বেশীর ভাগ পণ্ডিতই কিন্তু সুমাত্রা উপদ্বীপে তাঁহাদের আড্ডা ঠিক করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র-পাতির দ্বারা যে সব ফটো তুলিয়াছেন ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহাতে জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারে অনেক কিছুই দিতে পারিবেন। শোনা যায় সূর্য্যের চারিদিকে যে জিনিস (?) আছে তাহার প্রকৃত স্বভাব, অবস্থা, উত্তাপ প্রভৃতি জানা যাইবে। আর solar spectrum এর অসম্পূর্ণ ও বাকী জায়গাটাও সম্পূর্ণ ও ভর্ত্তি হইয়া উঠিবে।

সুখের বিষয় এবার গ্রহণের সময় আকাশ পরিষ্কার ও শীতল ছিল এবং বৈজ্ঞানিকদের ফটো তুলিতে বা অন্য কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু এমনও ঘটিয়াছে, সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া এবং বৎসরের পর বৎসর কত কষ্ট ও পরিশ্রমের ফলে যন্ত্র-পাতি তৈরী করিয়াও বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহণের সময় ফটো নিতে পারেন নাই; তাঁহাদের সকল কষ্ট, চিন্তা ও উদ্বেগ শান্ত ও স্তব্ধ করিয়া দিয়া গেল শুভ-মুহূর্ত্তে একখানা মেঘ,—সূর্য্যকে ঢাকিয়া দিয়া। * * *

অদ্ভুত দূরবীক্ষণ—

শুধু চোখে বড়জোর ৫০০০ তারা পাওয়া যায়; কিন্তু ইংরেজদের সব চাইতে বড় দূরবীক্ষণের সাহায্যে ৩০০,০০০,০০০ তারা দেখা যায়। এই দূরবীক্ষণের টিউব এত বড় যে একখানা সাধারণ মোটরগাড়ী ইহার ভিতর দিয়া অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে। ইহার ওজন ১৫৪০/০ মণ হইলেও যন্ত্রটী এমনিভাবে তৈরী হইয়াছে যে উপরের দিক হইতে ২৫।২৬ সের ওজনের চাপ দিলেই উহা চালান যাইতে পারে। প্রত্যেক দূরবীক্ষণেরই এক একটা Concave lens থাকে। এই দূরবীক্ষণের lensটির ওজনই ৫৬/০ মণ—ব্যাস চারিহাত এবং ইহা ১২ ইঞ্চি পুরু। বৃঃ কোলাম্বিয়া ভিক্টোরিয়া নগরে এই যন্ত্রটী স্থাপিত হইয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় দূরবীক্ষণ কালিফোর্ণিয়ায় Mount William Observatoryতে আছে, তাহার lensএর ওজন ১২৬/০ মণ আর যন্ত্রটীর মোট ওজন ২৮০০/০ মণ, শুধু lens খানা তৈয়ার করিতেই দশ বৎসর লাগিয়াছিল।

চিঠির বাহার—

বড় লোকের কাছে রোজ কতখানা চিঠি আসিতে পারে, সেই ধারণা বোধ হয় আমাদের অনেকেরই নাই। পৃথিবীর বিখ্যাত ধনী হেন্‌রি ফোর্ড (যাঁহার নাম Ford carএর সঙ্গে

এমন ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট) একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তিনি নাকি দৈনিক ১৫০০ চিঠি পান। তাঁহার জন্য একটি আলাদা পোষ্টাফিস আছে এবং বিভিন্ন স্থান হইতে "Ford mail" নামধারী আলাদা সব ব্যাগে তাঁহার চিঠিপত্র ঐ পোষ্টাফিসে আসিয়া থাকে। এতগুলি চিঠি একজন লোকের পক্ষে পড়িয়া তাহার উত্তর লেখা যে কতখানি অসম্ভব তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু বড়লোকের কাছে সাধারণতঃ যেই জিনিসটা সচরাচর পাওয়া যায় না সেই সৌজন্যটুকু হেন্‌রি ফোর্ডের নিকট হইতে সকলেই পাইয়া থাকেন; তাঁহার নিযুক্ত কেরাণীগণ প্রায় সকল চিঠিরই উত্তর লিখিয়া দেন। Important lettersগুলি ফোর্ডসাহেব নিজে পড়িয়া তবে তাহার জবাব দেন। এতগুলি চিঠির মধ্যে অধিকাংশই নাকি begging letters অর্থাৎ কেহ লিখিতেছেন "বন্ধু বান্ধবেরা বলেন আমি একজন বড় genius, আমাকে কিছু টাকা সাহায্য করিলে আমি ইউরোপে গিয়া আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া আসিতে পারি।" কেহ লিখিতেছেন "আমি মোটরে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে ইচ্ছা করি, আমাকে যদি একখানা car দেন........." কেহ লিখিতেছেন "আমি একখানা বই লিখিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া ছাপবার খরচটা আপনি যদি আমাকে দিয়া দেন,........." আবার কেহ লিখিতেছেন "আমার স্ত্রী organ বাজায় খুব ভাল কিন্তু organ অভাবে তাহার বিদ্যাটা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। আপনার ত টাকার কোন অভাব নাই। যদি দয়া পরবশ হইয়া সামান্য কয়েকটা টাকা...... ইত্যাদি"।

ফোর্ডসাহেব লিখিয়াছেন, পৃথিবীর সব জায়গা হইতেই তিনি এইরূপ আবেদন পত্র পাইয়াছেন, বাদে ভারতবর্ষ। ধন্য ভারতবর্ষ! আজ এই দুর্দ্দিনেও তোমার মান নিয়া তুমি বাঁচিয়া আছ।

ঘরের কথা।

ঢাকা হল ইউনিয়ন কাউন্সিল।

নূতন নিয়মানুসারে এই বৎসর আমাদের ইউনিয়নকাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচন জুলাই মাসের শেষ ভাগেই হইয়াছিল। এবারের নির্ব্বাচনেও ছাত্রগণের মধ্যে বিষম চাঞ্চল্য ও বিভিন্ন পদপ্রার্থিগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা লক্ষিত হয়। এই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বের সময় ভোটের লড়াই দেখিয়া আমাদের কিন্তু অনেক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনের কথাই মনে পড়ে এবং ভবিষ্যতে এই কাউন্সিল-অর্জ্জিত ও কার্য্যকুশলতাও যে আমাদের বিশেষ উপকারে আসিতে পারে এইরূপ কোন উপসংহারে পৌঁছিতেও বিলম্ব হয় না।

এবারকার নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন —

ভাইস্‌প্রেসিডেন্ট—শ্রীকিরণচন্দ্র দাস।
খেলার সেক্রেটারী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাস।
কমনরুম সেক্রেটারী—শ্রীশচীন্দ্রমোহন গুহঠাকুরতা।
সমাজসেবা সেক্রেটারী—শ্রীঅবনীরঞ্জন ঘোষ।
নাট্য সেক্রেটারী—শ্রীহরিশ্চন্দ্র দাশ গুপ্ত বি, এ।
লাইব্রেরীয়ান—শ্রীখগেন্দ্র ভূষণ চন্দ বি, এস্‌ সি।
এডিটার, (হলম্যাগাজিন)—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র কর এম, এ।

সাধারণ সদস্যগণ—শ্রীঅবণীভূষণ রুদ্র, শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীধীরাজকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপরেশচন্দ্র নন্দী, শ্রীসন্তোষকুমার দাস ও শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।

নির্ব্বাচনের কয়েকদিন পরেই কার্জ্জন হলে তদানীন্তন প্রোভোষ্ট মিঃ জেঙ্কিন্সে্র সভাপতিত্বে ইউনিয়নের এক বিশেষ অধিবেশনে নবনির্ব্বাচিত সদস্যগণের অভিষেক উৎসব সুসম্পন্ন হয়। পুরাতনের বিদায়গ্রহণ এবং নূতনের বরণ বরাবরের মতই সকলের প্রীতিকর হইয়াছিল।

কয়েক দিন পরে নরেনবাবু বি, সি, এস, পরীক্ষা দিয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহার পদত্যাগ করিলে পুনর্নির্ব্বাচনে সম্পাদকের পদে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহ নির্ব্বাচিত হন।

আবার জানুয়ারী মাসে খগেনবাবু সবরেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়া তাঁহার লাইব্রেরীয়ানের পদ ত্যাগ করিলে ঐ পদে পুনর্নির্ব্বাচনে শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায় নির্ব্বাচিত হন।

আমরা নরেনবাবু ও খগেনবাবুর ভবিষ্যত উন্নতি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ঢাকা হল ইউনিয়নের যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা ও পর্য্যালোচনার ভার কাউন্সিলের উপরই ন্যস্ত। কাউন্সিলের কাজের পরিমাণ দেখিয়া ইউনিয়নের সফলতার বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে যে এবারে আমাদের ইউনিয়ন তার উদ্দেশ্য সাধনে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত আমাদের কাউন্সিলের বারটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে; অন্যান্য বারে সারা বছরে ৬৭টির বেশী হইত না। এই বারটি অধিবেশনে বাজেট তৈরী করা প্রভৃতি সাধারণ কাজগুলি ছাড়া হলের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকর অনেক প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছে। এবং কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট (প্রোভোষ্ট তাহার অধিকাংশই কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সভাসমূহও আমাদের অনেক প্রস্তাবে যথোচিত মনোযোগ দিয়াছেন। আমাদের কাউন্সিলের বিশেষত্ব এই যে কাউন্সিলের সভাপতি স্বয়ং প্রোভোষ্ট হলের সব মঙ্গলামঙ্গল বাধাবিধি সম্বন্ধে কাউন্সিলে আলোচনা করেন, কাউন্সিলের স্বাধীন মত প্রকাশে ও স্থাপনে সুযোগ দেন এবং সেই মতের সম্মানও রক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং সাধারণতন্ত্রের হিসাবে আমাদের কাউন্সিল আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং হলের দেহীস্বরূপ ইউনিয়নের প্রাণ হইয়া আছে।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রোভোষ্ট মিঃ ল্যাঙ্লী সুদীর্ঘ অবকাশের পর গত জুলাই মাসে ইউনিভার্সিটির কার্য্যে যোগদান করিয়া কয়েকদিন অস্থায়ীভাবে Vice-Chancellorএর কার্য্য করেন। পরে ডাঃ হার্টগ তাঁহার ছুটী ফুরাইলে গত নভেম্বর মাসে পুনঃ Vice-Chancellorএর কার্য্যভার গ্রহণ করিলে পর মিঃ ল্যাঙ্লী তদানীন্তন অস্থায়ী প্রোভোষ্ট ডাঃ জেঙ্কিন্সের নিকট হইতে ঢাকাহলের প্রোভোষ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। কিন্তু দুই মাস যাইতে না যাইতেই আবার জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে পুনর্নির্ব্বাচনের ফলে আমরা রসায়ণশাস্ত্রাধ্যাপক স্বনামখ্যাত ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে আমাদের প্রোভোষ্টরূপে পাইয়াছি। ইনিই ঢাকাহলের প্রথম হিন্দু প্রোভোষ্ট হইলেন। ইতিমধ্যেই আমরা তাঁহাকে আমাদের হলের যাবতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠভাবে পাইয়াছি যে সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি লাভ করিয়া এবং মহা-প্রাণতার পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। আমরা আশা করি তাঁহার সভাপতিত্বে আমাদের ইউনিয়নের খ্যাতি ও গৌরব চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিবে এবং ভবিষ্যতে এই ইউনিয়নের সফলতা অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইবে।

এক হিসাবে এইবারের কাউন্সিলের বড় সৌভাগ্য এই যে কাউন্সিল এবছর সাত আট মাসের মধ্যে পর পর তিনজন বিচক্ষণ সভাপতির সভাপতিত্ব লাভ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রথম দুইজনের মধ্যে কাহারও নায়কত্ব দীর্ঘকাল উপভোগ করিতে পারে নাই। ইহাতে আমাদের ক্ষোভের কোনই কারণ নাই। বরং গর্ব্ব করিবার মত আমাদের এই আছে যে আমাদেরই ভূতপূর্ব্ব প্রোভোষ্ট ও প্রেসিডেণ্ট বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor নিযুক্ত হইয়াছেন। ঢাকা-হল ইউনিয়নের গৌরব ও সফলতার জন্য আমরা ভূতপূর্ব্ব অস্থায়ী প্রোভোষ্ট ডাঃ জেঙ্কিন্স ও স্থায়ী প্রোভোষ্ট মিঃ ল্যাঙ্লীর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। ইউনিয়নের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এবার ইউনিয়নে সাহিত্য-সম্মেলন নামে একটি নূতন শাখার সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং এই সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্যোগেই এবারকার অনেক সভাসমিতি আহ্বান করা হইয়াছে। আমরা উক্ত শাখার সেক্রেটারী শ্রীঅবনীভূষণ রুদ্রকে উঁহার সাফল্যের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

সাহিত্য-সম্মেলনের সভা ছাড়া এবার তিনটি তর্কসভা (debate meeting) ও দুইটি বিশেষ সভারও অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আমাদের তর্কসভাগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক ও অন্যান্য হলের অনেকছাত্র বিশেষ উৎসাহ সহকারে যোগদান করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

প্রথম তর্কসভায় প্রস্তাবের বিষয় ছিল "বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা বাঞ্ছনীয়।" স্থানীয় ব্যারিষ্টার ও বিশ্ববিদ্যালয়-কোর্টের সদস্য মিঃ আর, কে, দাস বিশেষ ওজস্বিতা ও যুক্তির সহিত প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেন। রেভারেণ্ড ব্রিজেস্ দুর্জ্জয় প্রমাণের সহিত ইহার প্রতিবাদ করেন। ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়। দ্বিতীয় সভায় প্রস্তাব ছিল "একুশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল জীবিকা ও শিক্ষার উপযোগী ভিন্ন, নিজের অনার্জ্জিত অন্য কোন প্রকারের আর্থিক সাহায্য অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করা যে কোন ব্যক্তির পক্ষে বে-আইনী হওয়া উচিত যদি সে শারীরিক বা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া

উপার্জ্জনাক্ষম না হয়।" বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা বাগ্মী ডাঃ জেঙ্কিন্স তাঁহার স্বাভাবিক যুক্তি-চাতুর্য্য ও ভাষা-নৈপুণ্যের সহিত এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া সভাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ প্রাঞ্জল ভাষায় অখণ্ডনীয় যুক্তি দ্বারা ইহার প্রতিবাদ করেন। ভোটে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। তৃতীয় দিন তর্কের বিষয় ছিল "ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্যদেশীয় জীবনযাপন-ধারা অবলম্বন করা দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির সহায়ক।" বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রাধ্যাপক মিঃ জে, সি, সিংহ অনেকগুলি যুক্তির সাহায্যে প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বাগ্মী মিঃ এইচ্, ডি, ভট্টাচার্য্য, তাঁহার প্রত্যেকটি যুক্তিকে খণ্ডন করিয়া এরূপভাবে উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন যে ভোটে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হয়। এই তিন সভাতেই স্কুলের ছাত্রেরা অদম্য উৎসাহে আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

এবারকার বছরে অন্য যে দুইটী বিশেষ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। একসভায় ঢাকা সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্, সি, ঘটক তদানীন্তন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ ড্রামণ্ডের সভাপতিত্বে পল্লীস্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধে একটি মূল্যবান বক্তৃতা দেন। অন্য সভাতে শ্রীনিকেতনাগত জগন্নাথ-হল সমাজসেবা-প্রদর্শনীর বিশিষ্ট অতিথি মিঃ সি, এল্, লাল ও শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ প্রাঞ্জল ভাষায় সমাজসেবা সম্বন্ধে আবশ্যকীয় দুইটী বক্তৃতা দিয়া আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন।

আমাদের হিতৈষী যে সমস্ত সাহিত্যামোদী সুধী ও বিশেষজ্ঞগণ অনুগ্রহ করিয়া বাহির হইতে আসিয়া বক্তৃতাদির সাহায্যে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন ও আমাদের প্রতি তাঁহাদের গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে ঢাকা-হল ইউনিয়নের পক্ষ হইতে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এবারে হলের সামাজিক সম্মিলনের (Social gathering) শোভা নানা কারণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। এই দিনই ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ হার্টগের (বর্ত্তমানে স্যার ফিলিপ হার্টগ) বিদায় উপলক্ষে তাঁহার প্রতি ঢাকা-হলের ছাত্রগণের শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার আয়োজন করা হইয়াছিল। হলের সম্মুখস্থ বিস্তৃত আয়তনে অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে টেবিল চেয়ার সাজাইয়া ছাত্রশিক্ষকের অবাধ মিলামিশার মধ্য দিয়া যে প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা সত্যই হল-জীবনের একটা বিশেষ স্মরণীয় গৌরবের বস্তু সন্দেহ নাই।

Social gathering উপলক্ষে হলের নাট্যামোদী ছাত্রগণ কর্ত্তৃক একটি ছোট প্রহসন "বিরিঞ্চি বাবা" অভিনীত হয়। এই "বিরিঞ্চি বাবার" সঙ্গে হয়ত বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণ সকলেই পরিচিত। "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হাস্যরসের অবতার শ্রীপরশুরাম বিরচিত "বিরিঞ্চি বাবা" আমাদের অন্যতম ছাত্রবন্ধু শ্রীসুবোধচন্দ্র সেন অভিনয়োপযোগী করিয়া লিখিয়া বিশেষ উৎসাহ ও যত্নসহকারে আমাদের নাট্যামোদী বন্ধুগণের সাহায্যে অত্যল্পকালের মধ্যে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন যে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সেই অভিনয় দেখিয়া বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা আমাদের নাট্যরসিক সুবোধবাবু ও অন্যান্য নাট্যামোদী বন্ধুগণকে "বিরিঞ্চি বাবার" সাফল্যের জন্য

বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আর এই সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে সুপরিচিত শ্রীপরশুরামকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। সত্যসত্যই এই প্রহসনটি যে কত সুন্দর ও চমৎকারভাবে অভিনীত হইয়াছিল তাহা যাঁহারা উপভোগ করিয়াছেন তাঁহাদের ভিন্ন আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার নয়। মোটের উপর সবটায় মিলিয়া Social gathering এর দিনটা আমাদের হলকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিল। এই দিনের সাফল্যের জন্য আমাদের অক্লান্তকর্ম্মী ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট্ মিঃ কিরণচন্দ্র দাসকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সর্ব্বশেষে এবারের কাউন্সিলের সদস্যগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।
জেনারেল সেক্রেটারী।

ঢাকা হল সাহিত্য-সম্মেলন।

বহুদিন যাবত ঢাকা হল ইউনিয়নে একটী সাহিত্য-শাখার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছিল। এতদিন হলের সাহিত্য-চর্চ্চা শুধু হল-ম্যাগাজিনেই নিবদ্ধ ছিল। তাহা বৎসরে একবার মাত্র প্রকাশিত হয়। হলের ছাত্রবৃন্দ যাহাতে সম্যক-প্রকারে সাহিত্য অনুশীলন ও আলোচনা করিবার একটী বৃহৎ ক্ষেত্র ও উৎকৃষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য গত ১২ই আগষ্ট তারিখে হল কাউন্সিলের এক অধিবেশনে একটী স্বতন্ত্র সাহিত্য-শাখা প্রতিষ্ঠিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাহিত্য-সম্মেলনের কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত;—(১) রচনা ও প্রবন্ধাদি পাঠ, (২) নিমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞগণদ্বারা নানাবিষয়ে বক্তৃতা প্রদান, (৩) আবৃত্তি, (৪) বার্ষিক উৎসব।

এই নূতন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনার জন্য আমাদের কোন tradition নাই। এই দুর্ব্বল শিশু প্রতিষ্ঠানের কলেবর-পরিপুষ্টি, ইহার কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি ও কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর বিস্তৃতির জন্য আমাদের সহপাঠীগণের সহৃদয় সাহায্য, অধ্যাপক-মণ্ডলীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও শিক্ষিত জনসাধারণের কৃপাদৃষ্টি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এপর্য্যন্ত যে কয়েকটী অধিবেশন হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম অধিবেশন—৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫। সভাপতি—মিঃ জি, এইস্, ল্যাঙলী, আই, ই, এস্।

একটী সুমধুর সঙ্গীতদ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। আমাদের ভূতপূর্ব্ব Vice-Chancellor Dr. (এখন Sir) P. J. Hartog C. I. E. এই নবগঠিত সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলে পর ঢাকার সবডিভিশনাল অফিসার প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘটক এম্, এ মহাশয়—"প্রাচ্যের রহস্য-পূর্ণ গীতিকথা—বৈষ্ণব-কাব্য" (The Mystic Song of the East-Vaisnavic Poetry) শীর্ষক একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

প্রথমতঃ তিনি বিষয়টীর একটী সাধারণ আভাস প্রদান করেন। তৎপর তিনি বলেন. বৈষ্ণব-কাব্যভাব একটী দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব ও বিশ্বপ্রেম দ্বারা ইহা সঞ্জীবিত। এই তত্ত্ব মানব-হৃদয়বীণায় সমস্ত যুগেই একটী মধুর রাগিণী বাজাইয়াছে। আবহমানকাল হইতে মানবের মনোরাজ্যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় জগৎ লইয়া চিরন্তন দ্বন্দ্ব—ইহার মীমাংসার দিকে বৈষ্ণব-কাব্যের ইঙ্গিত—বৈষ্ণব-কাব্যে ভাব ও চিন্তার ক্রমবিকাশের কথা ইত্যাদি বিষয় তিনি সুন্দরভাবে বিবৃত করেন। তৎপর সফীধর্ম্মের সহিত তুলনা-মূলক সমালোচনায় তিনি বলেন—সফীধর্ম্মে যেমন (১) ধ্যান, (২) পুলক ও উচ্ছ্বাস, (৩) পরাজ্ঞান, (৪) ভগবৎ-প্রেম, (৫) সাধক-জনোচিত অদ্ভুত ভাবের অবস্থা, (৬) নিত্যানন্দের কথা প্রভৃতি পর পর অবস্থার উল্লেখ আছে—বৈষ্ণব-সাহিত্যেও সেই সেই অবস্থা বর্ত্তমান রহিয়াছে। পরিশেষে প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির শ্রুতি-মধুর কাব্যাংশ সমূহ উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতাটি সরস ও সুমধুর করিয়া তোলেন। * * বক্তৃতা-শেষে আমাদের হলের অন্যতম ছাত্র শ্রীসুধীরচন্দ্র দাশগুপ্ত বি, এস্ সি, একটী হাস্যরসোদ্দীপক ইংরেজী গল্প সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিয়া উপস্থিত সকলের মনোরঞ্জন করেন।

২য় অধিবেশন—২০শে নবেম্বর, ১৯২৫। সভাপতি—মিঃ জি, এইচ্, ল্যাঙলী, আই, ই, এস্।

এই সভায় ডাঃ সুধেন্দু কুমার দাস, এম্, এ, পি, এইচ্, ডি (লণ্ডন) মহাশয় "Prof. Flint on Hindu Pantheism" বেদান্ত বা সর্ব্বব্রহ্মবাদ (প্রতিবাদমূলক সমালোচনা) শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। অধ্যাপক ফ্লিণ্ট কর্ত্তৃক লিখিত "Anti-Theistic Theories" নামক গ্রন্থের অন্তর্গত "Hindu Pantheism" অধ্যায়ের প্রতিবাদচ্ছলে প্রবন্ধলেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে শাঙ্কর বেদান্তকে 'Pantheism বা সর্ব্বব্রহ্মবাদ বলিলে এই মতের উপর অযথা দোষারোপ করা হয়। উক্ত অধ্যাপকের যুক্তির খণ্ডন-মুখে লেখক ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বেদান্তের ব্রহ্ম, অনুভূতির অতিরিক্ত অন্তঃসার শূন্য কেবল একটী "একত্ব" (Unity) নয়। এই একত্ব-স্বরূপ ব্রহ্মকে নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের ভিতর দিয়া অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিলে দেখা যায় যে তিনি আনন্দ-স্বরূপ ও অখণ্ডৈকরস চৈতন্যমাত্র। এই একত্ব-স্বরূপ ব্রহ্ম জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়রূপে প্রকাশিত সাধারণ জ্ঞানের উর্দ্ধে অবস্থিত ইত্যাদি। লেখক পঞ্চদশী, চিৎসুখী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কতকগুলি বাছা বাছা যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপকের যুক্তির খণ্ডন ও বেদান্তের "সাক্ষি-তত্ত্ব" এবং "নির্ব্বিকল্প-প্রত্যক্ষ" এই দুইটী মূল বিষয় পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। Prof. Flintএর গ্রন্থখানি কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ-শ্রেণীর পাঠ্য-তালিকার অন্তর্গত। এই প্রকার গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন-শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের বিশেষ অপকার সাধিত হইতেছে। এই রকম পাশ্চাত্য-সমালোচকদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জিজ্ঞাসু ছাত্র-মণ্ডলী মূলগ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও বিচার করিয়া বেদান্তের প্রকৃত তথ্য জানিতে চেষ্টা করেন ইহাই প্রবন্ধ লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য।

তৃতীয় অধিবেশন—১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ কার্জ্জন হলে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

এই সভায় ঢাকার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস, জমিদার মহোদয় "ভারতীয় সঙ্গীত" সম্বন্ধে একটী বিশেষ গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রথমতঃ তিনি অন্যান্য বিদ্যা-শিক্ষার ন্যায় সঙ্গীত আলোচনার দিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রাচীন-ভারতের নাগরিক জীবনে সঙ্গীত-কলা কি প্রকার উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিল তাহা তিনি বাৎস্যায়নের "কাম-সূত্র" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি সভ্যতার মাপকাঠি নয়। দৈহিক-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার অতীত মানসিক বৃত্তির যথার্থ উন্মেষই হইতেছে সভ্যতার উচ্চ আদর্শ এবং বাস্তবিক ইহাই মানুষকে আনন্দ-রাজ্যের অধিকারী করে। প্রাচীন ভারত, সভ্যতার মাপকাঠি স্বরূপ সঙ্গীত-কলাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। লেখক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বৈচিত্র্য-ময় ভারতীয় সঙ্গীতের একটী বৈশিষ্ট্য হইতেছে বিশ্বরসের উদ্বোধন—অল্পকে ছাড়িয়া ভূমাকে গ্রহণ করা ইত্যাদি। উপসংহারে তিনি ঢাকার অতীত এবং বর্ত্তমান সঙ্গীত-চর্চ্চা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য তথ্যকথা বলিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করেন।

অতঃপর ঢাকার প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণ কর্ত্তৃক যন্ত্রযোগে অতি সুমধুর ও হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীতালাপ হইয়াছিল।

৪র্থ অধিবেশন—২৩শে জানুয়ারী ১৯২৬। সভাপতি ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ডি, এস্ সি।

আমাদের হলের অন্যতম ছাত্র শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ মহাশয় "সাহিত্যের কথা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। [৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

পরিশেষে, যাঁহাদের সহানুভূতি ও সাহচর্য্যে আমাদের এই নবীন সাহিত্য-সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাঁহাদিগকে আমি ঢাকা হল ইউনিয়নের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীঅবনীভূষণ রুদ্র।
সম্পাদক,
ঢাকা হল সাহিত্য-সম্মেলন।

ঢাকা-হল লাইব্রেরী।

লাইব্রেরী আমাদের হলের একটি প্রধান বিশেষত্ব। ইহার প্রথম জীবন আরম্ভ হয় ঢাকা কলেজ হোষ্টেলের কতকগুলি বই লইয়া। তারপর ক্রমাগত চেষ্টায় ইহাকে এত বড় করিয়া তোলা হইয়াছে। এ বৎসর ইহার জীবনের গতির অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে।—

প্রথমতঃ ইহা স্থানান্তরিত হইয়াছে "লিটন হলে।" কতকগুলি আসবাবপত্রও ইউনিভার্সিটির নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এবার লাইব্রেরী অনেকটা ইউনিভার্সিটির আয়ত্তের মধ্যে গিয়াছে। এ বৎসর আরও নূতন বই ক্রয় করায় ইহার আকার ও অঙ্গসৌষ্ঠব উভয়ই আরও সুন্দর

হইয়াছে। গত বৎসর পর্য্যন্ত মোট বইএর সংখ্যা ছিল ২২০০, এবারও প্রায় ২০০ বই ক্রয় করা হইয়াছে। এবার লাইব্রেরীর জন্য ৩০০৲ মঞ্জুর হইয়াছিল; তদ্দ্বারা ইংরাজী, বাংলা, সর্ব্বপ্রকার পুস্তকই কিছু কিছু ক্রয় করা হইয়াছে। পাঠ্যপুস্তক ফেরৎ পাইতে প্রায়ই দেরী হয় বলিয়া এবার পাঠ্যপুস্তক বেশী আনান হয় নাই।

হলের ছেলেরাই লাইব্রেরীর বই ব্যবহার করিতে পায়। হলবাসী (Resident) ছাত্রগণ প্রত্যহই বই পাইয়া থাকেন এবং যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত ব্যাপারে হলের অধীন, অথচ সহরে অভিভাবকদের অধীনে বাস করেন, তাঁহাদিগকে সপ্তাহে ৪ দিন বই দেওয়া হয়। বরাবরই বই দেওয়া এবং ফেরৎ লওয়ার সময়ে বিশৃঙ্খলা হয় বলিয়া এবার এক নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। ছেলেরা কাগজে বই ও নিজের নাম লিখিয়া কাগজটি একটি বাক্সের মধ্যে দিয়া গেলে 'লাইব্রেরীয়ান' ঐ কাগজ দেখিয়া বই বাহির করিয়া রাখেন এবং পরে ছেলেরা আসিয়া যার যার বই লইয়া যায়। ইহাতে সুবিধাও প্রচুর, সময়ও লাগে কম। সাধারণতঃ প্রত্যেককে ২ খানার বেশী বই দেওয়া হয় না। গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৩০ জন ছেলে লাইব্রেরী হইতে বই নিয়া থাকে এবং প্রতিদিন গড়ে ৭২ খানা বই ছেলেদের ব্যবহারে থাকে। ইহাতেই বুঝা যায় যে লাইব্রেরীর ব্যবহার ছেলেদের মধ্যে খুব ব্যাপক।

ইংরাজী অপেক্ষা বাংলা বইএর চাহিদা বেশী, অথচ বাংলা বইএর সংখ্যা তুলনায় খুব কম। ইংরাজী বইএর চাহিদা কম হইবার কারণ বোধ হয় ইতঃপূর্ব্বে ক্রয় করিবার সময় পুস্তক ঠিকমত নির্ব্বাচন করা হয় নাই। কারণ এমন অনেক বই আছে যাহা কেউ কখনও খুলিয়াও দেখে নাই।

লাইব্রেরীর প্রায় ৩০০।৩৫০ বই ফেরৎ পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই প্রোভোষ্ট এবার একটু কড়াকড়ি করিয়া বইগুলি replace করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমরা আশা করি, হল লাইব্রেরীর বইগুলি যাহাতে সংরক্ষিত হয়, সকল ছাত্রই তাহাতে একটু মনোযোগ দিবেন।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায়।
লাইব্রেরীয়ান।

ঢাকাহল নাট্য-সম্মিলন।

বরাবর যেমন হয় এবারও তেমনি পূজার ছুটীর পূর্ব্বেই আমাদের নাট্যাভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয় দুইরাত্রিই হইয়াছিল—প্রথমরাত্রি পুরুষদের জন্য, আর দ্বিতীয়রাত্রি শুধু মেয়েদের জন্য।

এবারের অভিনয়ে ঢাকাহল বেশ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" এবারকার অভিনয়ের বিষয় ছিল। যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিপুল উৎসাহে প্রতি বৎসর ঢাকাহলের নাট্যাভিনয় সুসম্পন্ন হইয়া থাকে আমাদের সেই নাট্যামোদী শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মাহশয় এবার "নগেন্দ্রে"র ভূমিকায় নামিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনয়-নৈপুণ্যে উপস্থিত সকলেই

বিশেষ আনন্দিত ও প্রীত হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্র, সূর্য্যমুখী, কুন্দ এবং হীরার ভূমিকায় যাঁহারা নামিয়াছিলেন তাঁহাদের অভিনয়ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কমলমণি ও শ্রীশের অভিনয়ও ফুটিয়াছিল ভাল। মোটের উপর এবারের অভিনয় সত্য সত্যই খুব সুন্দর এবং সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় প্রতিবৎসর যেরূপ উৎসাহ ও যত্ন সহকারে আমাদিগকে অভিনয়-শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহাতে বলিতে হয় ঢাকাহলের অভিনয়ের সফলতা একমাত্র তাঁহারই অনুগ্রহের দান। আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ছাত্রজীবনে খেলাধূলার মত অভিনয় শিক্ষা করাও যে আর্টের হিসাবে খুবই দরকারী এবং পুঁথি পুস্তকের বাইরে এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদেরও যে একটা যথার্থ সার্থকতা আছে ইউনিভার্সিটির কর্ত্তৃপক্ষ এতদিনে যেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। নূতন দৃশ্যাবলী (Scenes) ক্রয় করিবার জন্য এবার কর্ত্তৃপক্ষ ঢাকা ও জগন্নাথ হলকে ১০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। হলের আর্থিক অবস্থা তত সুবিধাজনক নয় বলিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের ব্যবস্থা করা এতদিন বড়ই দুঃসাধ্য ছিল। এখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মঞ্জুরী টাকায় দৃশ্যাবলী কিনিয়া লইতে পারিলে উহা দ্বারা ভবিষ্যতে অভিনয়ের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনের অনেক সহায়তা হইবে।

এবার Social gathering উপলক্ষে আমাদের নাট্যসম্মিলন যেরূপ সুন্দরভাবে পরশুরাম বিরচিত "বিরিঞ্চিবাবা" অভিনয় করিয়াছিল, তাহাতে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন এবং অনেকে উচ্চ প্রশংসাও করিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা সুবোধবাবু প্রমুখ হলের নাট্যামোদী বন্ধুদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্তগুপ্ত।
সেক্রেটারী।

ঢাকা-হল কমন্ রুম্।

কমন্ রুমের কথা কিছু বলিতে হইলেই সর্ব্বপ্রথম আমাদের অস্থায়ী প্রোভোষ্ট ডাঃ জেঙ্কিন্স্‌কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে হয়। ইউনিভার্সিটির প্রারম্ভ হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত কমন্ রুমের স্থানাভাবে ঢাকাহলের ছাত্রগণকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ডাঃ জেঙ্কিন্সের বিপুল উৎসাহ ও চেষ্টার ফলে গত বৎসর ঢাকা-হলের কমন্ রুম, লাইব্রেরী ও প্রোভোষ্ট অফিসের জন্য সুন্দর একখানা দালান তৈরী হইয়াছে এবং বর্ত্তমান সেসনের প্রারম্ভেই কমন্ রুম প্রভৃতি উক্ত দালানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, আলমারী প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক আলো বাতাস এবং অন্যান্য ছোট

সুখ সুবিধায় বর্ত্তমান কমন্ রুম ঢাকা-হলের একটা গৌরবের বস্তু হইয়াছে সন্দেহ নাই। হলের ছোট সভা সমিতি ও তর্ক-সভাগুলির অধিবেশনের জন্যও এখন কমন্ রুমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কমন্ রুমে গত বৎসর যে সব দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি রাখা হইত তাহার প্রায় সবগুলিই এবৎসরও রাখা হয়। মাঝে মাঝে দুই একখানার পরিবর্ত্তে অন্য নূতন পত্রিকাও রাখা হইয়া থাকে। মোটের উপর আমাদের দেশের বাংলা, ইংরেজী প্রায় সবগুলি প্রসিদ্ধ পত্রিকাই বর্ত্তমানে আমাদের কমন্ রুমে আছে।

পিংপং, কেরম, দাবা ইত্যাদি indoor games আগের মতই চলিতেছে।

আমাদের কমন্ রুম প্রত্যহ বেলা ১১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এবং উহার প্রায় সব সময়ই ছাত্রগণ কমন্ রুম ব্যবহার করে। ঢাকা-হলের প্রায় সকল ছাত্রই দৈনন্দিন অন্যান্য কাজের মত প্রত্যহই একবার কমন্ রুমে যাইয়া পড়াশুনা বা ক্রীড়াদি করিয়া থাকে। ইহা ঢাকা-হলের প্রত্যেক ছাত্রেরই একটা বিশেষত্ব। কাজেই গড়ে প্রায় ২০ হইতে ৩০ জন ছাত্র সব সময়ই কমন্ রুমে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা নূতন ছবি প্রভৃতি দ্বারা বর্ত্তমান রুচি অনুযায়ী কমন্ রুমটিকে আরও সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিবার জন্য আমাদের বর্ত্তমান প্রোভোষ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

শ্রীশচীন্দ্রমোহন গুহঠাকুরতা।
সেক্রেটারী।

ঢাকা-হল সমাজসেবা সমিতি।

ঢাকাহল সমাজসেবা সমিতি তার ৫ম বর্ষে পদার্পণ করলো। একান্ত নীরব কর্ম্মীর উন্মাদনা নিয়ে তার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২১ সালে। যে কয়টী মহৎ প্রাণ তখন এর অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, তাঁরা আজ তাঁদের মহত্তর কর্ত্তব্য নিয়ে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। পরবর্ত্তী কর্ম্মীগণ একে কতটুকু পরিপুষ্টি দিতে পেরেছে একবছরে—আজ তাই একটু আলোচনা করা যাক্—খুব সংক্ষেপে।

নৈশ বিদ্যালয়—

প্রথমতঃ নৈশ বিদ্যালয়। দুস্থ বালকদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ হ'তে মোটেই করা হচ্ছেনা আমাদের দেশে,—কিন্তু মনে হয় এর প্রয়োজনীয়তা কোন বিশেষ কিছু থেকে বড় কম নয়। এই সমিতির প্রারম্ভে ছয়টী বালককে নিয়ে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। আজ ছাত্র পঞ্চাশ জন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের মধ্যে যারা একটু লেখাপড়ায় ভাল হয়েছে তাদের উচ্চ ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি সাতটী ছাত্র নবকুমার স্কুলে পড়্ছে। স্কুলের বেতন, পুস্তকের দাম ইত্যাদি সমস্তই আমাদের ফণ্ড হ'তে দেওয়া হয়ে থাকে।

ছাত্রদের চরিত্র-গঠন ও শারীরিক উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন নেয়া হচ্ছে। ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলার সরঞ্জামও ওদের দেয়া গেছে। বৎসরের শেষে বার্ষিক পুরস্কার দেবারও ব্যবস্থা আছে।

সেবা-শুশ্রূষা—

জানিনা জগতে রোগ শোক কেন হয়। এ যদি ঈশ্বরের বিধান হয়ে থাকে, তবে কারও যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ মাত্র। কিন্তু ঢাকাহলের ছেলেরা এ কাজে ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণকেই ধর্ম্ম ব'লে মেনে নিয়েছে। ছোট বড়, ইতর ভদ্র যে কেহ আজ যদি তাদের ডাকে—তারা অমনি তাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যটুকু নিয়ে হাজির হয়। কলেরা, নিউমোনিয়া, প্লুড়িসিস্ ইত্যাদি বিবিধ রোগের শুশ্রূষা তারা সর্ব্বদাই করে আসছে। এ কাজের সাহায্যের জন্য থার্ম্মোমিটার, বেডপেন, আইস্‌ব্যাগ, হট্‌ওয়াটার-বট্‌ল্, ইউরিনেল ইত্যাদি সমিতির নিজস্বই আছে। প্রয়োজন মত দরিদ্র রোগীদের সিক্‌রুমে রাখার বন্দোবস্ত আছে। ঔষধাদির ব্যবস্থাও আছে। এ বিষয়ে ইউনিভারসিটির ডাক্তারবাবু আমাদের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন; এর জন্য সমিতি তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ।

ট্রেনিং ক্লাশ—

হোম্-নার্সিং, ফার্ষ্ট এইড্ ইত্যাদি বিষয়ে কর্ম্মীদের কিছু কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। এ উদ্দেশ্যে ক্লাশ করার ব্যবস্থা প্রতিবারই করা হয়। এবারও ডাক্তার দাশগুপ্ত সপ্তাহে একদিন বক্তৃতা দিতেন। কোন কারণে সম্প্রতি ক্লাশ বন্ধ হয়ে আছে।

বক্তৃতা—

দেশের ও দশের উন্নতিবিধায়ক বক্তৃতা সর্ব্বসাধারণের ও কর্ম্মীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পারদর্শী, বিজ্ঞ সুধীবৃন্দ মাঝে মাঝে এই সমস্ত বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া থাকেন। ম্যাজিক লেণ্টার্ণের সাহায্যেও কখন কখন বক্তৃতার আয়োজন হয়ে থাকে।

স্বেচ্ছাসেবক-সঙ্ঘ—

স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে, বোধ হয়, বলবার বিশেষ প্রয়োজন নেই। লাঙ্গলবন্ধ-স্নান উপলক্ষে ঢাকা ও নানাস্থান থেকে অনেক স্বেচ্ছাসেবকই সেখানে গিয়ে থাকেন, এখান থেকেও পাঠান হয়। গত বৎসর এখান থেকে ৫০ জন কর্ম্মী সেখানে গিয়ে তাহাদের যথাসাধ্য শক্তি সেই বিপুল জনসমাগমের মঙ্গলার্থে নিয়োগ করেছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই সারাদিন মাথার উপর সূর্য্য আর পায়ের নীচে কাদা নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছিলেন। আবার অনেককে ভোর হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জলে দাঁড়িয়েও থাকতে হয়েছিল।

ঢাকার জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা উপলক্ষে লোকসমাগম হয় বিপুল। কিন্তু কোন বছরই ছাত্রপক্ষ হতে তাদের সাহায্যের কোন ব্যবস্থা করা হোত না। মুষ্টিমেয় পুলিশের পক্ষে তখন শান্তিরক্ষা করা অসম্ভব, ফলে কোন বছরই দুর্ঘটনার অভাব হোত না! এবারই প্রথম ঢাকাহল থেকে ১০৭

জন স্বেচ্ছাসেবক সেখানে যান। ঢাকাস্থ অন্যান্য ছাত্র-বন্ধুগণও এ কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ফলতঃ উভয় দিনের কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছিল। ঢাকেশ্বরীর বাড়ী ও ছোট বড় সমস্ত কাজেই প্রয়োজন হলে স্বেচ্ছাসেবক পাঠান হয়।

ভিক্ষাদান—

আমাদের এ "সোণার বাংলা" আজ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জ্জরিত। ভিক্ষাদানে এদেশের লোককে মৃত্যুর হাত হ'তে বাঁচানো পাগলের পাগলামো বই কিছুই নয় সত্য। পরন্তু আমাদের দেশে যে ভিক্ষা-বৃত্তি এমন অনেকে অবলম্বন করেছে—যাদের খাটবার শক্তি আছে, সেও মিথ্যে নয়; কিন্তু তা'বলে আমাদের যতটুকু শক্তি সেইটুকু যে আমরা কেন সাধারণের হিতে নিয়োগ কোরবো না তাও বোঝা যায় না। তবে এটুকু দেখা দরকার যে ভিক্ষুক সত্যই ভিক্ষার উপযুক্ত পাত্র কিনা, তাহলেই যথেষ্ট। আমাদের ফাণ্ডের এক তৃতীয়াংশ শুধু ভিক্ষাদানেই ব্যয়িত হয়ে থাকে। কত অন্ধ আতুর আজ ঘরে ঘরে হাহাকার করছে, শুধু এক মুষ্টি অন্নের জন্য—আর সে তুলনায় আমাদের সাহায্যের ক্ষমতা কত ক্ষুদ্র! ঢাকাহল সমাজসেবা-সমিতির এই টুকুই একটু ক্ষুদ্র ইতিহাস—যদিও সংক্ষেপে। আমাদের আশা আছে এর কাজ ক্রমে ক্রমে বৎসরের পর বৎসর প্রসারতা লাভ করবে।

শ্রীঅবনীরঞ্জন ঘোষ।
সম্পাদক।

বাৎসরিক খেলাধূলা।

ঢাকাহলের খেলাধূলার কথা কিছু বলিতে হইলেই পুরাতন ঢাকা কলেজের খেলার খ্যাতি ও কীর্ত্তির কথা মনে পড়ে। আমাদের কিন্তু মনে হয় ঢাকা কলেজের সেই গৌরব ঢাকা হলই অক্ষুণ্ণ রাখিতেছে।

ফুটবল। নিত্যকার মামুলী খেলা যেমন বরাবর হইয়া থাকে, এবারও তেমনই হইয়াছে। নিয়মিত খেলোয়াড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস পায় নাই। শঙ্খনিধির নামের সঙ্গে সম্পৃক্ত Shieldটীর জন্য আমরা শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়াছিলাম; কিন্তু অল্পের জন্য উহা আমাদের ভাগ্যে জুটিল না।

এবার দুইটী ভিন্ন জায়গার খেলোয়াড়গণ এখানে ফুটবল খেলিতে আসিয়াছিলেন। বহরমপুর কলেজের সঙ্গে আমাদের আপন মাঠেই আমাদের দুই বাজি ফুটবল খেলা হয়। একদিন ওঁরা হারিয়া যান; আর একদিন হারজিত কিছু হয় নাই।

প্রেসিডেন্সী কলেজও ঢাকায় খেলিতে আসিয়াছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদেরও একটা খেলা হয়—হারজিত কারোই হয় নাই।

এই দুই কলেজকেই আমরা তাঁদের অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অনেকে আবার 'এ'টীম্ 'বী'টীম্ করিয়া খেলোয়াড়দিগকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া থাকেন; আমাদের তা করিবার দরকার হয় নাই। অথচ, মোটের উপর প্রায় ত্রিশজন খেলোয়াড় নিয়মিতভাবে ফুটবল খেলিয়া আসিয়াছেন। এবং খেলা আমাদের একটুও খারাপ হয় নাই।

এবার ক্রিকেটে আমরা প্রায় দশ এগারটী ম্যাচ্ খেলিয়াছি এবং একটী ছাড়া সব কয়টীতেই জিতিয়াছি। আর স্বরাজ লাভের প্রথম সোপান-স্বরূপ ঢাকার European Clubএর সাহেব খেলোয়াড়-দিগকেও ক্রিকেটে হারাইয়া দিয়াছি। সকলেই জানেন ক্রিকেটটা সাহেবদেরই খেলা; অথচ, সেই খেলায় আমরা যে সাহেবদিকেই হারাইয়া দিলাম, এটা কি কম গৌরবের কথা?

ক্রিকেট।

তবে, এখানে একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রয়োজন যে, আমাদের তদানীন্তন প্রোভোষ্ট মিঃ ডব্লিউ, এ, জেঙ্কিন্স্ আমাদের হইয়া সাহেবদের বিরুদ্ধে খেলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনিও ঢাকা ক্লাবের একজন মেম্বর।

ক্রিকেট খেলিয়া এবার আমরা ন্যাথান কাপ্‌টি (Nathan Cup) পাইয়াছি,—সে কথা কিন্তু ভুলিতে পারি না।

টেনিস্, ব্যাডমিণ্টন্ এবং ভলি বল—বরাবর যেমন চলিতেছে, তেমনই চলিয়াছে।

এই বিপুল জীবনসংগ্রামের দিনেও যে আমরা খেলার আনন্দটুকু হারাইয়া বসি নাই, এটাও একটা গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

আমাদের হলের ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা অযুগ্ম হইয়া টেনিস্ খেলিতে পারেন, তাঁদের মধ্যে যিনি সকলের সেরা তাঁকে প্রোভোষ্ট বরাবরই একটী পুরস্কার দিয়া থাকেন। এবারও আমাদের গেলবারের বিজয়ীবীর (Champion) শ্রীপ্রমথ নাথ সেনগুপ্তই ঐ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

তিন হলের ছাত্রদের নিয়া ইউনিভার্সিটীতে যে বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রদর্শনী হয়, তাতে আমাদের সাফল্য বাস্তবিকই গর্ব্ব করিবার মত জিনিস। এবার সব শুদ্ধ ২০ রকমের খেলা দেখানো হয়; তার মধ্যে ১৪টাতেই আমরা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি। সব শুদ্ধ ৭৬ জন এই খেলার প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন; কিন্তু তার মধ্যে ৪০ জনই আমাদের আপন লোক। আরও আছে। আমাদের খেলা বিভাগের অধিনায়ক সত্যেন্দ্র নাথ স্বয়ং সমস্ত প্রতিযোগীদের মধ্যে সকলের উপরে হইয়াছেন; তার মানে আজ তিনি সমস্ত ইউনিভার্সিটীর Champion বা প্রথম খেলোয়াড়। সকলে জানেন কিনা, বলা কঠিন, যে এই সব খেলারও নম্বর আছে।

বাৎসরিক ক্রীড়া প্রদর্শনী (Annual Sports)

সত্যেন্দ্রনাথ

(১) সুদীর্ঘ লম্ফপ্রদানে প্রথম হইয়াছেন ; তার নম্বর হইল— ৫

(২) ১০০ গজ দৌড়ানোতেও ১ম হইয়াছেন ; তারও নম্বর— ৫

(৩) ২২০ গজ দৌড়ানোতেও তাই ; তারও নম্বর— ৫

(৪) ৪৪০ গজ দৌড়—তাতেও তাই, নম্বর— ৫

(৫) আর একটা বিশিষ্ট রকমের বাধা ডিঙ্গাইয়াও তিনি দৌড়াইয়াছেন—যার নাম Hurdle race ;—তাতে তিনি দ্বিতীয় হইয়াছেন, এবং নম্বর পাইয়াছেন, ৩। একুনে তিনি ২৩ নম্বর পাইয়া সকলের উপরে হইয়াছেন। এবং এই Champion হওয়ার জন্য তিনি একটা বিশেষ পুরস্কারও পাইয়াছেন। তা ছাড়া, প্রত্যেকটী পৃথক্ খেলায় প্রথম দ্বিতীয় হওয়ার জন্য আলাদা পুরস্কারও পাইয়াছেন।

খেলায় যিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় হইয়াছেন, বলা দরকার যে, তিনিও আমাদের হলেরই—জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি এক মাইল এবং আধ মাইল দৌড়ে প্রথম হইয়াছেন ;—আর, Cross Country অর্থাৎ 'দিগ্‌দেশ ভ্রমণ' দৌড়ে দ্বিতীয় হইয়াছেন। তা ছাড়া নিশান-চালানো দৌড় (Relay race) আছে একরকম ; তাতে এই ইউনিভার্সিটীর জন্ম হইতেই আমরা প্রথম হইয়া আসিতেছি—এবারও হইয়াছি।

তিন হলের আপেক্ষিক তুলনায়ও আবার ঢাকা-হলই প্রথম হইয়াছে। ঢাকা-হল সব শুদ্ধ ৯৪ নম্বর পাইয়াছে মোস্লেম হল ৩৬ এবং জগন্নাথ হল ২৮ নম্বর পাইয়াছে।

তিন হলের মধ্যে যে হল প্রথম হয়, সেই হলকেও আবার একটা পুরস্কার দেওয়া হয়—তার নাম "Vice-Chancellor's Cup"। সেটী গত পাঁচ বৎসর যাবতই আমরা পাইয়া আসিতেছি। এটী প্রথম ভাইস্-চ্যান্সেলার স্যার ফিলিপ হার্টগ্ দান করিয়াছিলেন ; তিনি এবার অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, অতঃপর আর এই 'পেয়ালাটী' নিয়া খেলা হওয়া উচিত নয়। পাঁচ বৎসর যে হল ওটী পাইয়াছে, সেটী তারই হওয়া উচিত। আমাদের নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলার মিঃ জি, এইচ, ল্যাঙ্গলী যদি ঐরূপ একটী পেয়ালা দান করেন, তবেই সব গোলযোগ মিটিয়া যায়।

Champion prize অর্থাৎ সব-সেরা পুরস্কারটী একটী অতি সুন্দর পেয়ালা। এবার,—যেন ঢাকা-হলের জয় হইবে জানিয়াই—এই পেয়ালাটী বিগত কয়েক বৎসরের চেয়ে বড় করিয়া বানানো হইয়াছিল। এজন্য খেলা কমিটির অধ্যক্ষ এবং আমাদের ভূতপূর্ব্ব প্রোভোষ্ট মিঃ জেঙ্কিন্সকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আর সাধারণভাবেও এই ক্রীড়া-প্রদর্শনীর নির্ব্বিঘ্ন সমাপ্তির জন্য আমরা তাঁর সুবন্দোবস্তের কাছে ঋণী।

ভবিষ্যতের জন্য আমরা এই একটু নিবেদন করিতে চাই যে, প্রথম পুরস্কার সবগুলিই যদি Cup বা পেয়ালা হয়, তবেই যেন ভাল দেখায়। এজিনিসগুলি দেখিতেও ভাল, রক্ষা করাও চলে ; এবং এই জন্যে সকলেরই মনোরঞ্জন হয়।

আমাদের একজন নামকরা খেলোয়াড় সরোজপ্রসন্ন গুপ্ত এবার সব্-রেজিষ্ট্রার হইয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাঁকে খেলার মাঠে আর দেখিতে পাইবনা। সে জন্য আমরা দুঃখিত।

তবে ভরসার কথা এই যে এবার কয়েকজন নূতন খেলোয়াড়ও আমরা পাইয়াছি। সরোজবাবুর মত কোনও একটা পদ লাভ না করা পর্য্যন্ত, আশা করি, তাঁরা আমাদের মায়া আর কাটাইতে পারিবেন না।

ইউনিভার্সিটিতে এবারমাত্র প্রথম Aquatic sports আরম্ভ হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় "স্থলেও যেমন, জলেও তেমন"—ঢাকা-হলই অধিক সংখ্যক পুরস্কার লাভ করিয়াছে। আবার তার মধ্যে প্রায় সব জলের খেলা। গুলিই প্রথম পুরস্কার। প্রতিযোগিতাকারীদের মধ্যে শ্রীসুধীরচন্দ্র গুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সর্ব্বশেষে যে সব খেলোয়াড়ের উৎসাহ ও চেষ্টায় এবার ঢাকাহলের খেলার গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাঁহাদিগকে ঢাকাহল ইউনিয়নের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাস।
সেক্রেটারী।

ক্লাবের কথা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় আগমনোপলক্ষে স্থানীয় ছোট বড় সব প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যেই একটা বিশেষ চাঞ্চল্য ও নবজীবনের নবীন উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিশ্বের বরেণ্য কবিকে আপনার ঘরে সাদরে বরিয়া লইতে যাহার যতটুকু শক্তি ছিল, যাহার যতটুকু সামর্থ্য ছিল গভীর আন্তরিকতার সহিত সেই সবটুকু শক্তিসামর্থ্য নিঃশেষ করিয়া দিতে কেহ কোন কার্পণ্য করে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় কবি-বরণ ত সকলের ভাগ্যে ঘটিল না! কবির আকস্মিক অসুস্থতা ক্ষুদ্রবৃহৎ কত প্রতিষ্ঠানের কত আয়োজনকে পণ্ড করিয়া দিল।

অনেকদিন আগে আমাদের হলের কয়েকজন বিশিষ্ট উদ্যোগী ছাত্রবন্ধু মিলিয়া লালেগ্রো ক্লাব ("L'allegro Club) নামে একটী ক্লাব গঠন করেন। পরস্পর খোলাখোলি ভাবে মেলামেশার মধ্যদিয়া সমসাময়িক দেশের যাবতীয় সমস্যামূলক বিষয়গুলির যথোচিত আলোচনা করিবার জন্য এবং পরস্পরের মধ্যে একটা প্রীতির বন্ধন ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এই ক্লাব প্রথমতঃ গড়িয়া উঠে। সপ্তাহের প্রত্যেক শনিবার রাত্রিভোজনের পর ক্লাবে debate meeting এর অধিবেশন হয়। এক একদিন এক একটি প্রস্তাবিত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা হইয়া ভোটে উহা গৃহীত বা প্রত্যাখ্যাত হয়। ইহা ছাড়া ক্লাবে মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি পাঠ ও সাহিত্যালোচনাও হইয়া থাকে।

লালেগ্রো ক্লাবের মেম্বরগণও রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় আগমনে মাতিয়া উঠিয়াছিল। কাজও করিয়াছে তাহারা ঢের। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে সব বিদেশীয় খ্যাতনামা প্রফেসারগণ আসিয়াছিলেন, ঐ ক্লাব তাঁহাদের বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে এবং কার্জ্জনহলে তাঁহাদের তিনটি বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়া সহরের শিক্ষিত সাধারণের পক্ষে বিদেশীয় বিশেষজ্ঞগণের বক্তৃতা শুনিবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের যে যে বিষয়ের বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল তাহার নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

Prof. Formichi—"The Upanisadas."
Prof. Tucci—"The Indian and the Italian Epics".
Prof. Lim—"The Present-day China."

সঙ্গে সঙ্গে দীনেন্দ্রবাবুর গানও উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। লালেগ্রো ক্লাবের দুর্ভাগ্য, কবিবর তাহাদের কবি-সম্বর্দ্ধনার ক্ষুদ্র আয়োজনকে ব্যর্থ করিবেন না কথা দিয়াও আকস্মিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাহাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই! কিন্তু মহা-প্রাণ বিশ্বকবি ঐ ক্লাবকে একেবারে ভুলিয়া যান নাই। ঢাকা ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহারই বিশেষ অনুগ্রহে ঐ ক্লাবের সমস্ত মেম্বরগণ, কবিবর ও ইতালীয় প্রফেসারগণ, ভাইস্‌চ্যান্সেলার এবং ঢাকা ও জগন্নাথ হলের প্রভোষ্ট দুইজনকে লইয়া কার্জ্জন হলের সম্মুখে একখানা Group Photograph তুলিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

লালেগ্রো ক্লাবের মত ঢাকাহলে এবার আরও একটি ক্লাব গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার নাম ইউনিয়ন ক্লাব। এই ক্লাবের উদ্যোগে কার্জ্জন হলে Prof. Limএর আরও একটি বক্তৃতা হয়। এই বক্তৃতার বিষয় ছিল Sun-yet-Sen, এই দিনও দীনেন্দ্রবাবুর গান হইয়াছিল।

মোটের উপর এই দুইটী ক্লাবের উদ্যোগে যে সব বক্তৃতাদি হইয়াছে তাহাতে যেমন ঢাকাহলের লাভ হইয়াছে যথেষ্ট, তেমনি স্থানীয় শিক্ষিত সমাজও লাভবান হইয়াছেন অনেকখানি।

সম্পাদকের শেষ কথা।

এবার বছরের প্রথমে যিনি "শতদলের" সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, তিনি গত ডিসেম্বর মাসে পদত্যাগ করায় সম্পাদকের পুনর্নির্ব্বাচন হয় ; এবং তাহারই ফলে পত্র-সম্পাদনের গুরুভার বর্ত্তমান সম্পাদকের স্কন্ধে পতিত হয়। এদিকে মার্চ্চমাসের প্রথম সপ্তাহে বি, এ পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়া গেলেই, হলের যে সকল ছাত্র এবার বি, এ পরীক্ষা দিবেন, তাঁহারা হল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন বলিয়া মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহেই "শতদল" প্রকাশিত করিতে হইবে, স্থির করা হয়। কিন্তু মাত্র দুই মাস সময়ের মধ্যে এরূপ একখানা বার্ষিক পত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া বাহির করা বড়ই কষ্টসাধ্য। কাজেই বাধ্য হইয়া তাড়াতাড়ি করিতে যাইয়া সব জায়গায় ছাপার ভুলগুলি সংশোধন করা হইয়া উঠে নাই। আশা করি সুধী পাঠকবৃন্দ সময়ের অত্যল্পতা বিবেচনা করিয়া সম্পাদকের এইসব ত্রুটী বিচ্যুতি ধরিবেন না।

আমাদের হলের যে সকল শিক্ষক এবং ছাত্রের আগ্রহ ও উৎসাহে এ বছরের "শতদল" প্রকাশিত হইল, তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটাও বলিয়া রাখা ভাল যে যাঁহাদের লেখা আমরা "শতদলে" প্রকাশিত করিতে পারি নাই, তাঁহারা যেন "নিউইয়র্কের" সেই সপ্তদশ-বর্ষীয়া যুবতীর মত ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা বাহির না-হওয়ার দুঃখে জীবনে নিরাশ হইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ না করেন। আমাদের মধ্যে ঐরূপ নিরাশ কবির সন্ধান পাইলে আমরা তাহার লেখা নিশ্চয়ই বাহির করিবার চেষ্টা করিতাম।

শুদ্ধি-পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	২০	বিভন্ন	বিভিন্ন
৫	২	অবমানিত	অবনমিত
২৩	১৯	বধু	বধূ
৪৫	৫	দন্ত-পংতির	দন্ত-পংক্তির
৪৬	১১	হাঠাৎই	হঠাৎই
৪৮	৩	ছিমিয়ে	ঝিমিয়ে
৪৯	১২	ছাড়্‌ছেনা	ছাড়্‌তেনা
৫১	১৪	ভভিষ্যতে	ভবিষ্যতে
৫৮	১০	মাংশপেশী	মাংসপেশী
৬৪	১৬	ছিকিয়ে	ছিলিয়ে
৭১	৮	পুনদশনের	পুনর্দর্শনের
৭৬	১৬	শীকারের	শিকারের
৯৫	২২	বাঁশীর	বাণীর
১১২	৬	শ্রীহরিশ্চন্দ্র দাশ গুপ্ত	…দত্তগুপ্ত